আগামী প্রভাত

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড্
১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রকাশক: শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য তিন টাকা

*

* *

প্রথম সংস্করণ

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের
মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস এম-এ কর্তৃক মুদ্রিত

বইখানি পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়ের করকমলে সমর্পণ করিলাম।

গ্রন্থকার

সূচী

চিত্র

আগামী প্রভাত

হার্ডিঞ্জ পার্ক। পাটনা।

সূর্যাস্ত হইতেছে। আজ খণ্ড খণ্ড মেঘ ছিল সমস্ত দিন, অস্তরশ্মি পড়িয়া রঙের বিচিত্র এক সুষমা সৃষ্টি করিয়াছে। অন্য কখনও হয় তো এ দৃশ্য অন্যভাবে দেখিয়াছি, আজ মনে হইতেছে এ সূর্যাস্ত যেন একখানি যুগের অবসান। স্থবির শীতের অন্ত্যেষ্টি সূচনা করিয়া এ যেন ফাল্গুনের হোলি খেলা।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে, একটা রাত্রির অন্তরাল, তার পরই আসিবে নব প্রভাত। সহ্য করিব এ রাত্রিকে আমি; হয় তো অনুভবই করিব না। আমার মন যে চলিয়াই গিয়াছে পূর্ব দিগন্তে, আগামী দিনের প্রভাতকে সম্বর্ধনা করিয়া লইতে।

কি আনিবে সে প্রভাত? কোন নবীন পুষ্পদলকে প্রাণ দিয়া জাগাইয়া তুলিবে?

* * *

সামনে পার্কের রেডিওটা বাজিতেছে। কি বিশ্রী!—যেমন কদর্য রেডিও; তেমনি কদর্যভাবে অবহেলা ভরে রাখা,—একটা কোথা হইতে ধার করা টুলের ওপর। তাও সহ্য হয়; কিন্তু সহ্য হয় না ওর সঙ্গীত। একটা বাঁশী গেল—পূরবীতে; এখন একটা গলাবাজি চলিয়াছে গজলে—লয়লা-মজনু—ইশ্‌ক্! হে ভগবান, আর কতদিন অসহায়ভাবে এই পূরবীর কাঁদুনি আর প্রেমের ভ্যান্‌ভ্যানানি শুনিতে হইবে? ঝুলি ঝাড়িয়া দেখ, নূতন কিছু শোনাও এ-জাতটাকে।

রাস্তা দিয়া কয়েকখানা মিলিটারি লরি সহরের দিকে চলিয়া গেল ; অত্যুগ্র বেগে। পিচের রাস্তার উপর তাহাদের মসৃণ গতি করাতের মত একটা একটানা শব্দের জের টানিয়া চলিয়া গেল,—মনে হইল, বাতাসে যে লয়লা-মজনুর প্রেম-সঙ্গীতটা জমিয়া উঠিতেছিল, সেটাকে যেন দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিয়া গেল। খুশি হইলাম—এই ছিল ওর প্রাপ্য সাজা।

বুঝিতেছি মনটা একটু অন্যায় রকম বেশি তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে আজ এই সন্ধ্যায়। সভ্যতা অন্তরের দরদ দিয়া যাহা গড়িয়া তুলিয়াছে তাহার উপর এতটা আক্রোশ শোভা পায় না। এ যেন কতকটা যাহারা সেণ্ট পলের উপর বোমা ফেলিয়া যুগ যুগের শিল্পসাধনার নিদর্শন-টাকে নষ্ট করিতে চায় তাহাদের মনোবৃত্তি। স্বীকার করি, এক দিক দিয়া আমার আজিকার মনোভাবের সঙ্গে মিল আছে, তবুও মনে হইতেছে যাহারা এতদিন ধরিয়া শুধু পূরবী আর গজলই গাহিয়া আসিয়াছে তাহারা একটু সরিয়া দাঁড়াক—যাহারা নবযুগের নূতন সঙ্গীত গাহিবে তাহাদের আসরটা ছাড়িয়া দিক, অন্তত কিছুটা দিনের জন্য।

পিছনে একটা কিসের চেঁচামেচি হইতেছে। ফিরিয়া দেখি মদীয় বন্ধু শ্রীমান্ অরুণচন্দ্রের শিশু পুত্রটির সহিত তাহার চাকরের কি লইয়া মনোমালিন্য ঘটিয়াছে। কাছে ডাকিলাম। প্রশ্ন করিলাম, "ব্যাপার কি ?"

চাকর বলিল, "বাবু, ও গাড়িতে থাক্‌বে না, নেমে লাফালাফি করবে।"

একখানি পেরাম্বুলেটার—এক দিকে অরুণের ছেলে, এক দিকে একটি মেয়ে,—সেদিন দেখিয়াছিলাম অরুণের বাড়িতে, ওর এক বন্ধু আসিয়াছে কলিকাতা থেকে, তাহারই কন্যা। মেয়েটি ছোট, কিন্তু ছেলেটির বয়স হইয়াছে ; সে-বয়সে এক বাঙালীর ছেলেকেই পেরাম্-বুলেটারে চড়িতে দেখিলাম। মনে মনে হাসিলাম—নকল যে! আসলকে একটু ছাড়াইয়া যাইবেই।

চাকরকে বলিলাম—"তা ছেড়ে দে না, বাগানের মধ্যে গাড়িতে চড়ে থাকবার দরকারই বা কি ?"

"জামা নষ্ট করে বাবু, গায়ে ধূলো লাগায়, পাউডার নষ্ট হয়ে যায়। দুষ্ট, আছে, রাস্তায়ও ছুটে চলে যায়।"

বলিলাম—"তা যাক্, নামিয়ে দে, আমি বাবুকে বলে দেব, বকবে না তোকে!"

খোকা নামিয়া গালের মধ্যে দুইটা আঙ্গুল পুরিয়া দিয়া মুখটা গোঁজ করিয়া দাঁড়াইল—আমার পানে একটু আড়ে চাহিয়া।

কৌতুক বোধ হইতেছিল, প্রশ্ন করিলাম,—"কি ?"

"খুকু যাবে।"

আদামের ভাবটা তো বোঝা গেল, ঈভ্ কি বলেন জানিবার জন্য প্রশ্ন করিলাম—

"কি খুকু ?"

"আমি যাবো।"

বেশ, উভয়েরই তাহা হইলে নিরাপদ পেরাম্বুলেটারে বৈরাগ্য আসিয়াছে। যুগ-লক্ষণ ভালো। চাকরটাকে বলিলাম, "দে নামিয়ে ওকেও।"

এত বড় অভাবনীয় ব্যাপার খুকুর জীবনে বোধ হয় কখনও হয় নাই। নামিয়া মুক্তিদাতার মুখের পানে একটু বিস্মিত ভাবে চাহিয়া রহিল। খোকা ডাকিল—"এসো খুকু।"

হাত-পা'কে পূর্ণ মুক্তি দিয়া দুইজনে যেন প্রজাপতির মতোই সামনের হরিৎ ক্ষেত্রটুকুতে ছড়াইয়া পড়িল।

* * *

হার্ডিঞ্জ পার্কের রেডিওতে হঠাৎ একটা মিলিটারি ব্যাণ্ডের মূর্ছনা

উঠিল। অভাবনীয় ব্যাপার একটা, এর আগে কখনও শুনি নাই। আমার কেমন একটা ধারণা হইয়া গিয়াছিল,—কাঁদুনি গাহিয়া গাহিয়া সেট্‌টা নারীত্ব পাইয়া গেছে, ওর গলায় আর ধ্রুপদের উদাত্ত মন্দ্র উঠিতেই পারে না।

অরুণের ছেলে হঠাৎ খেলার মাঝে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। সঙ্গিনীকে ডাকিয়া বলিল—"খুকু, এদিকে এসো, সুন্দর বাজনা বাজছে। ....এমনি করে দাঁড়াও, আর এমনি করে চলতে হয়।"

ঘাস ছাড়িয়া দুজনে হাত ধরাধরি করিয়া কাঁকরের রাস্তায় নামিয়া গেল, এবং বাজনার তালে তালে পা ফেলিবার প্রয়াসের সঙ্গে খস্ খস্ করিয়া অগ্রসর হইয়া গেল।

* * *

আবার হাসি পাইল—একেবারে মেয়ে পুরুষে উভয়ে মিলিয়া? মনের কোথায় উত্তর পাইলাম—'নবযুগের এই তো গতি; যে কোন দিকে আজ চাহিয়া দেখো না।'

—কিন্তু আসিল কোথা হইতে এ খেয়াল, এ আদর্শ?

মনই উত্তর দিল—'নবযুগের হাওয়াতেই আছে বোধ হয়।'

* * *

নূতন হইয়া জন্ম লইবার জন্য সূর্যদেব আঁধারের গর্ভে আশ্রয় করিলেন।

মোহিনী রূপ

সুকুমার আসিয়া মলিনার সামনে দাঁড়াইল, মুখের উপর চোখ রাখিয়া প্রশ্ন করিল—"হঠাৎ এ অসময়ে ডেকে পাঠিয়েছ যে ?"

অসময়—যেহেতু সন্ধ্যা, জায়গাটাও নিভৃত, একটা বকুল গাছের ঘনপল্লবিত-শাখা ছাতের এ-কোণটা আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। সুকুমারের প্রশ্নটা ভুল হয় নাই।

মলিনা একটু চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর একটু যেন হাসিয়াই বলিল—"আজ আমায় দেখতে আসছে, শুনেছ বোধ হয় ?"

সুকুমারের মুখে একটা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের হাসি ফুটিয়া উঠিল, উত্তর করিল—"না শুনলেও তোমার মুখ দেখে বোঝা শক্ত হ'ত না।"

মলিনা এবারে স্পষ্টই হাসিয়া ফেলিল, বলিল—"বাঃ আমার বিয়ের সূচনা হচ্ছে, হাসি আসবে না মুখে ? যাদের বিয়ে নয় তারা মুখ চুন করে বেড়াক।"

বোধ হয় সুকুমারের মুখের ভাবটা কেমন হয় সেটা লক্ষ্য করিবার জন্যই অল্প একটু বিরতি দিল, তাহার পর সত্যই বিপন্নভাবে বলিল—"না ঠাট্টার কথা নয় ; বড্ড একটা বিপদে পড়ে তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি, একটা ব্যবস্থা করতে হবে।"

সুকুমার একটু স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, তাহার পর কহিল—"বিয়ে হবে—এর মধ্যে বিপদটা কোথায় ? নিজের মুখেই তো এই বললে যে...."

"আছে ঃ শুনছি তারা পাঁচজন মিলে আসছে...."

একটু ব্যঙ্গের স্বরেই উত্তর হইল—"তাতে বিপদটা কিসের ? পঞ্চ-পাণ্ডব তো নয় যে...."

মলিনা এবার রাগিল, বলিল—"ঠাট্টা রাখো, ঠাট্টা করবার জন্যে ডাকা হয়নি তোমায়।...আমি অত লোকের সামনে বেরুতে পারব না, কনের মত সেজেগুজে। তা' ভিন্ন পাঁচজনে যখন পাঁচ দিক থেকে প্রশ্ন করতে থাকবে...."

সুকুমারও প্রগল্‌ভতার ভাবটা ছাড়িয়া বলিল—"শোন মলিনা, ঠাট্টা ছেড়ে দিলে আমায় একটা কথা সিরিয়াস্‌লিই জিগ্যেস করতে হয়,—তুমি রাজি হয়েছ—তাই না তোমায় দেখাবার এই ব্যবস্থা? কাকা-খুড়িমা তো এ বিষয়ে তোমার মত না নিয়ে...."

মলিনার রাগটা রহিলই, তবে এবারে বোধ হয় কৃত্রিম; বলিল,—"বাঃ, এ হিংসের কথা আমি বুঝি না; পাঁচ জায়গা থেকে দেখতে আসবে না,—একটু হৈ-চৈ হবে না,—আমিও পাঁচরকম দেখব না, চুপি চুপি গিয়ে বিয়ের পিঁড়েতে বসব...."

আবার হাসিয়া ফেলিল।

সুকুমার বলিল—"বেশ তো, তুমি বাড়িতে জানিয়ে দিলেই তো পার যে বেশি লোক দেখতে আসে এটা তোমার পছন্দ নয়; আমায় আর এর মধ্যে কেন...."

মলিনা আবার রাগিল, বলিল—"তোমার মাথা খারাপ হয়েছে,—তার মানে কি এই হয় না যে শুধু পাত্র আর তার মাত্র একটি অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকে, যাতে দেখতে আর কথাবার্তা কইতে সুবিধে হয় আমার?....কি বলে বল্‌লে তুমি কথাটা তাই ভেবে সারা হচ্ছি!"

সুকুমার কি ভাবিতেছিল, কিছু একটা উত্তর দিবার পূর্বেই মলিনা তাহার ডান হাতটা চাপিয়া ধরিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল—"না, লক্ষ্মীটি, একটা ব্যবস্থা করতেই হবে তোমায়। মোটে আর বোধ হয় আড়াইটি ঘণ্টা সময়, সাতটা বেজে গেছে, সাড়ে ন'টার সময় তাদের এসে পৌছুবার

কথা। কতটুকুই বা দূর বিডন্ ষ্ট্রীট থেকে বল?....তা ভিন্ন আমিই বা কতকক্ষণ এইভাবে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি?....শীগ্‌গির বল কি ব্যবস্থা হতে পারে...."

বেশ একটু চুপ-চাপ গেল, একজন চিন্তা করিতেছে, একজন মুখের পানে ব্যগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। মলিনা তাগাদা দিল—"করলে কিছু একটা ঠিক?

দৃষ্টিটা একটু অন্যমনস্কভাবেই তাহার পানে ফিরাইয়া সুকুমার বলিল—"একটা পৌরাণিক গল্পের কথা মনে পড়ে গেল, তা'হলে কিন্তু একজন মেয়েছেলে থাকা দরকার।"

মলিনা চমকিয়া উঠিল—"মেয়েছেলে!"

"সুন্দরী এবং তরুণী। দু'ঘণ্টার মধ্যে একটা সাজান জিনিস পণ্ড করতে মেয়েছেলে ভিন্ন কারুর সাধ্যি আছে বলে আমার জানা নেই।"

মলিনা একটু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল—"ধন্যবাদ মেয়েদের সম্বন্ধে মশাইয়ের অভিমতের জন্যে; কিন্তু মেয়েছেলে আমি কোথায় পাব?"

"ওকথা আমি জিগ্যেস করতে পারি; তুমি যখন নিজেই মেয়েছেলে, তখন তোমার আর পাবার দরকার কি?

"কী বলছ তুমি?....তোমার মাথার ঠিক আছে?...."

"বরং আরও পরিষ্কার হয়ে আসছে।"

মলিনা জ্বালাতন হইয়া অসংলগ্নভাবে বলিল—"কী গেরো!—একেবারে সময় নেই!—মেয়েছেলে—অমন মেয়েছেলে আমি পাই কোথায় এখন?—আগে বললেও না হয় হোস্টেলে গিয়ে সুনুর সঙ্গে পরামর্শ করে....কি উদ্দেশ্য তাও তো বলছ না....না, তোমার তামাসা বোধ হচ্ছে....আর এর মধ্যে মেয়েছেলের কি দরকার হতে পারে মাথায় আসছে না আমার....কি করতে হবে তাকে শুনি?"

"শুধু তাদের সঙ্গে আসতে হবে।"

"আমি তাদের সঙ্গে আসব !! সত্যি তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।"

"বরাবর আসতে হবে না, মাঝখানে কোথাও নেমে অন্যপথে চলে আসবে।"

"পাগলের মতন কথা জেনেও জিগ্যেস করছি—ধর এলাম, কিন্তু আবার এসে তারা সেই-আমাকে এখানে দেখবে তো?"

"অন্য বেশে। পথে থাকবে অতি আধুনিকা, স্বাধীনতাপন্থী তরুণী, এখানে...."

মলিনা আর একবার রাগিল, এবারকার রাগের সঙ্গে এমন একটা অসহায়তার ভাব যে প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া উঠিয়া বলিল—"তোমার ভালো লাগবে না জেনেও একটা কথা না বলে আমি পারলাম না, আমাদের এই শেষ দেখা বুঝে তুমি বাজে কথা বলে আটকে রাখছ আমায়; অথচ আমার মনের অবস্থা যে...."

গলা বেশ স্পষ্টই ধরিয়া আসিল, চোখ দুটোও ছল ছল করিয়া উঠিল। এবার সুকুমার তাহার একটি হাত ধরিল, একটু দ্রবকণ্ঠেই বলিল—"আমি একটিও বাজে কথা বলছি না লিনা, অবশ্য আমার বুদ্ধিতে যেটুকু এসেছে সে হিসেবে বলছি—তুমিই যাও বা অপর কেউ যায়—সেকথা আলাদা। তা'হলে তোমায় খুলে বলি—একবার আমি একটা ভারি মজার ব্যাপার দেখেছিলাম লিনা, ট্রামে একটা মেয়ের উপকার করবার জন্যে কয়েকজন ছোকরার মধ্যে...."

একটা হাসি ঠেলিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু এই সময় নিচের তলায় বাড়ির অন্য প্রান্ত থেকে খুড়িমার গলার আওয়াজ শোনা গেল—"মলু, তোর হোল গা-ধোওয়া?"

সুকুমার খুব তাড়াতাড়ি গল্পটা বলিয়া সমস্ত প্ল্যানটা বুঝাইয়া দিল,

তাহার পর এদিককার সিঁড়ি দিয়া বাগানের পথে বাহির হইয়া গেল। নামিবার মুখে একবার ঘুরিয়া বলিল—"তোয়ের থাকবে, আমি ঠিক দশ মিনিট পরে আবার আস্‌ছি।"

মলিনা যখন ভিতরের সিঁড়ির মাঝামাঝি, তখনও তাহার মুখে একটা হাল্কা হাসি লাগিয়া, পাছে বিয়ের আনন্দ বলিয়া লোকে মনে করে—সেই জন্য তাড়াতাড়ি সেটা মিলাইয়া লইল।

[২]

রাস্তাটা অনেকটা ঘুরিয়া ফিরিয়া বিডন্ ষ্ট্রীটে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার পরও অনেকটা যাইতে হয়, তাহার পর চিৎপুর রোডের ট্রাম। এই রাস্তায় সাঁয়ত্রিশ নম্বর বাড়ি হইতে চারিটি যুবক লঘু হাস্যপরিহাসের সঙ্গে বাহির হইয়া ফুটপাথে দাঁড়াইল। একজন পকেট থেকে একটি সিগারেট-কেস বাহির করিয়া ডালা খুলিয়া একে একে তিন জনের সামনে ধরিল; তাহারা তুলিয়া লইলে নিজের ঠোঁটে একটি চাপিয়া ধরিয়া সবগুলিতে কায়দামাফিক অগ্নিসংযোগ করিল। তাহার পর একটা টান দিয়া দরজার দিকে চাহিয়া হাঁক দিল—"কৈ হে রমেন, বেশ তো আসছিলে, আবার কি হ'ল?"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আর একটি যুবক বাহির হইয়া আসিল, হাসিয়া বলিল—"বাবাঃ, তোদের আর তর সয় না।"

একজন তাহার বাহুটা একটু থামচাইয়া চাপা গলায় বলিল—

"বলি কত আর সাজতে হবে? কেল্লা তো ফতে হয়েই আছে।"

"সাজছিলাম, না হাতী,—ভয় হ'ল ভুলে বুঝি বাক্সটা খোলাই রেখে এসেছি, তাই...."

"ভুলকে আর ভয় করলে চলবে? এই তো আরম্ভ, এবার থেকে তো পদে পদেই ভুলের পালা।"

পাঁচ জনেই একটু হাসিয়া উঠিল। রমেন বলিল—"ইয়ারকি থাক্, ওদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে; নাও, এগোও।"

রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা, ব্ল্যাক্‌আউট। ঘরের কড়া আলোকের ভিতর থেকে বাহির হইয়া কয়েক পা একটু বুঝিয়া চলিতে হইল, সে ভাবটা কাটিয়া গিয়া দৃষ্টি যেই একটু স্বচ্ছ হইয়াছে হঠাৎ একটি দৃশ্যে পাঁচ জনেই বিস্মিত হইয়া প্রায় দাঁড়াইয়া পড়িল।—

খানিকটা দূরে, গলির মোড়ে—, ব্ল্যাকআউটের পরিমিত আলোক-বৃত্তের প্রায় মাঝখানে দাঁড়াইয়া একটি মেয়ে যেন বিপন্নভাবে সামনে, পিছনে, এক একবার আবার দুই পাশের বাড়িগুলোর পানে চঞ্চল দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতেছে। কম বয়স—অস্পষ্ট আলোয় মনে হয় আঠার, ঊনিশ—এইরকম। একেবারে আধুনিক প্রথায় সজ্জিত,—পায়ে হিল-তোলা জুতা, পরনে নূতন ছাপ-পাড়ের একটা শাদা শাড়ি, বাঁ হাতে একটা ভ্যানিটি ব্যাগ, ডান হাতে একটা মেয়েলি ছাতা, ঘাড়ের দুইদিক থেকে দুইটি সুপুষ্ট বেণী কোমরের নিচে নামিয়া গেছে।

পাঁচজনে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিল, রমেন বলিল—"যেন কেমন-কেমন বোধ হচ্ছে না? রতু না হয় একবার জিগ্যেস করবে?"

যে যুবকটি সিগারেট বিলি করিয়াছিল, তাহারই নাম রতু—বোধ হয় রতিকান্তের সংক্ষিপ্তসার;—উত্তর করিল—"করা দরকার যেন মনে হচ্ছে।....তোমাদের পাড়ার মেয়ে নয়?"

আবার ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছে, রমেন চাপা গলায় বলিল—"সব চিনে রেখেছি?"

ততক্ষণে মেয়েটিও যেন ইহাদের দেখিয়াই সামনে একটু আগাইয়া আসিয়াছে—চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত ; সে-ই প্রথমে কথা কহিল, বলিল—"একটু দয়া করে দাঁড়াবেন কি ?"

সকলে দাঁড়াইয়া উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, রতুই প্রশ্ন করিল—"কি ব্যাপার বলুন তো ? কোন রকম...."

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন হইল—"এটা কোন্ জায়গা বলতে পারেন ?"

বলিবার জন্য হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল, পাঁচজনেই একসঙ্গে উত্তর করিল,—কেহ পাড়ার নাম বলিল, কেহ গলিটার নাম বলিল, অতুল নামে একটি রোগা গোছের যুবক পিছনে দাঁড়াইয়াছিল, রমেন আর রতুর মাঝখান দিয়া—একটু ঠেলিয়াই সামনে আসিয়া পাড়ার নাম, গলির নাম—দুইটাই বলিয়া প্রশ্ন করিল—"আপনার বাড়ি কি এদিকপানে নয় ? এত রাত্তিরে—এই অজানা জায়গায় !...."

রমেন একটু লাজুক নিরীহ প্রকৃতির ; দ্বিতীয় যুবক যে ঠেলা খাইয়া পিছনে পড়িল তাহার ডাক-নাম মোটা বঙ্কু—বোধ হয় পাড়ায় আরও একটা রোগা বা মামুলি কাঠামোর বঙ্কিম আছে,—একে বুদ্ধি করিয়া বেশি কথা বলিতে পারিল না ; তায় একটা ঠেলা খাইয়া আড়ালে পড়িল,—আধ-অন্ধকারে বেশ একটু বিরক্তভাবেই অতুলের মাথার উপর একটা বক্র দৃষ্টি হানিল।

অতুলের কথার উত্তরে যুবতী যেন আরও ভীত হইয়া উঠিল, চারিদিকে একবার আতঙ্কের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—"না, আমার বাড়ি শ্যামবাজার ; তা'হলে তো আমি ভয়ানক বিপদে পড়েছিলাম দেখছি....কি করি আমি ?...."

"কি হয়েছে ?....বিপদটা কি ?....আমাদের দ্বারা কি হতে পারে ?"—বলিয়া সকলে ভদ্রতা রক্ষা করিয়া যতটা সম্ভব আরও ঘেঁষিয়া

দাঁড়াইল। অতুল রোগা হাতটা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বলিল—"আপনার কোন ভয় নেই; আমরা রয়েছি।"—

"এটা কোন জায়গা বলতে পারেন?"

মোটা বন্ধু মুখের এবং ডান চোখের কোণ দুইটা কুঁচকাইয়া, অতুলের মাথার উপর দিয়া একবার রতুর পানে চাহিল, জিহ্বা এবং তালুর

সাহায্যে 'চ্যাক্' করিয়া একটা মৃদু শব্দও করিল; অতুল অবশ্য গ্রাহ্য করিল না।

সবচেয়ে পিছনে ছিল নিখিল, কলেজে রমেনের সহপাঠী। একটু কবি প্রকৃতির, এদের মতো আতঙ্কে অভিভূত না হইয়া নিভৃত হইতে স্থির দৃষ্টিতে মেয়েটির পানে চাহিয়াছিল, বলিল—"উনি না হয় আলোর নিচে দাঁড়িয়ে বলুন না ব্যাপারটা কি, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকাটা আমার কেমন নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে না।"

তাহার পানে একবার চাহিয়া লইয়া যুবতী বলিল—"সত্যি, উনি ঠিক বলেছেন, আমার এখানে দাঁড়িয়ে কেমন গা ছম-ছম করছে।"

"সেই ভালো ···আলোতেই চলুন····হ্যাঁ, চলুন দয়া করে····" সমর্থনের একটা আগ্রহপূর্ণ গুঞ্জন উঠিল।

যুবতী দুই পা পিছাইয়া গিয়া আবার আলোর মাঝখানটিতে দাড়াইল। আলোটা অনুজ্জ্বল হইলেও সবাই একবার ভাল করিয়া দেখিল এবার। যুবতী বেশ সুন্দরী; বয়স প্রথমে সতের-আঠার মনে হইয়াছিল, এখন নিকট হইতে এবং স্পষ্টতর আলোকে মনে হইল আরও একটু বেশি হইবে, কুড়ি-একুশ হওয়া আশ্চর্য নয়। বেশ সুগঠিত দেহ, আপাতত আতঙ্কে একটু নিষ্প্রভ বোধ হইলেও মুখটিতে বেশ একটি সপ্রতিভভাব আর শিক্ষার দীপ্তি আছে। সজ্জা একেবারে আধুনিক,—মুখে একটু রুজ-পাউডারেরও হালকা স্পর্শ আছে। সবার মুখের পানে একবার ভীত দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া কহিল—"আমি তা হলে তো সত্যিই বড় বিপদে পড়েছিলাম দেখছি!—রিকশা করে এক বন্ধুর বাড়ি থেকে আসছিলাম····"

নিখিল কাতর উদ্বেগের সহিত একটু অনুযোগের স্বরেই বলিল—"একলা কেন আসছিলেন? রাত্তির বেলা, তায়—অজানা জায়গা!····"

চারজনেই তাহার দিকে ফিরিয়া তাকাইল—কম-বেশ করিয়া সবার দৃষ্টিতেই বিরক্তি মাখান। বঙ্কু ধৈর্য হারাইতেছিল, বলিল—"ওঁকে বলতেই দিন না।....হ্যাঁ, বন্ধুর বাড়ি থেকে আসছিলেন...."

যুবতীর চক্ষু সেইরূপভাবেই চারিদিক হইতে মাঝে মাঝে ঘুরিয়া আসিতেছে ; নিখিলের দিকে যেন একটু কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতেই চাহিয়া ব্যাকুল-ভাবে বলিল—"জানা পথ, আমি যে প্রায়ই আসি একলা ; আমার কলেজ-ফ্রেণ্ডের বাড়ি। আজ হঠাৎ যেন মনে হ'ল রিকশাওয়ালাটা আমায় অন্য পথ দিয়ে নিয়ে আসছে। বার দুয়েক টুকলাম লোকটাকে —বললে ঠিক যাচ্ছে। আমি অন্ধকারে বুঝতে পারছি না। ষণ্ডাগুণ্ডা চেহারা, আমার কেমন ভয় হ'ল, শেষে এই পর্যন্ত এসে বললাম—তুই নামা, নইলে আমি এবার চেঁচাব, তখন নামিয়ে...."

নিখিল বেশি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল, "উস!"—করিয়া শব্দ করিতে যাইবে, রতু তাহাকে সন্তর্পণে অথচ ক্ষিপ্রতার সহিত টানিয়া লইল, বলিল—"ঘাড়ে পড়বেন নাকি?"

অতুল ঘুষি বাগাইয়া শুনিতেছিল, বলিল—"তাকে ফলো করা দরকার তো!"

মোটা বঙ্কু একটু হাসিয়া বলিল—"তুমি করবে নাকি ফলো?"

অনেকক্ষণ হইতে ইসারা-টিপ্পনী চলিতেছে, এবার শরীর এবং শক্তি লইয়া যুবতীর সামনে স্পষ্ট বিদ্রূপ, অতুল চটিয়া গেল, বলিল— "না, উনি ষণ্ডা-গুণ্ডার কথা বলছেন, তার পেছনে ষণ্ডা-গুণ্ডা গোছেরই একজনকে পাঠান দরকার।"

যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেই যুবতীর দৃষ্টি একবার মোটা বঙ্কুর উপর গিয়া পড়িল, বঙ্কুর কান দুইটা হঠাৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার অতুলের পানে আড়ে চাহিল, কিন্তু কিছু বলিবার বা করিবার পূর্বেই

যুবতী মিনতির স্বরে অতুলকে বলিল—"না তাকে ধরবার চেষ্টা করে আর চেঁচামেচি করবেন না ; একটা গোলমাল হয় এটা আমার ইচ্ছে নয়, পুলিস-কেস হলে আরও খারাপ।....আপনারা যাবেন কোন্ দিকে? অন্তত ট্রাম-ষ্টপ পর্যন্ত যদি আমায় পৌছে দেন...."

রতু বলিল—"আপনি কোথায় যাবেন তাই বলুন...."

ওর মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া নিখিল সেটাকে সম্পূর্ণ করিল—"আমরা কোথায় যাই সে তো পরের কথা, আগে আপনাকে পৌছে দিয়ে...."

যুবতী অতুলকেই বলিতেছিল, উত্তরটা অতুলেরই দিবার কথা ; ইহারা ওপর-পড়া হইয়া দিয়া ফেলায় নিখিলের পানে চাহিয়া বেশ একটু তিক্ত কণ্ঠেই বলিল—"ট্রাম-ষ্টপ পর্যন্ত পৌছেই সটকান দেবেন?—বাঃ দিব্যি!...."

নিখিল একটু উগ্রভাবেই প্রশ্ন করিল—"তাই বললাম?"

মোটা-বন্ধুও সুযোগটা ছাড়িল না, অতুলের পানে ভ্রূকুটি করিয়া বলিল—"তাই বললেন উনি?—পারেন কখনও বলতে?—এই বুদ্ধি নিয়ে...."

রতু বলিল—"থামো তোমরা, উনি বিপদে পড়েছেন, আর এই সময় বুদ্ধি নিয়ে...."

যুবতীকে প্রশ্ন করিল—"হ্যাঁ, আপনি কোথায় যাবেন তাই বলুন, ট্রাম-ষ্টপ কেন, আগে আপনাকে বাড়ি পৌছে দিয়ে তবে আমাদের নিজেদের গন্তব্যের কথা ভাবব।"

রমেন একটু গলাখাঁকারি দিল, মেয়ে দেখায় দেরি হইয়া যাওয়ার কথা বলিবে বুঝিয়া—রতু তাহাকে বাঁ-হাতে একটু টিপিয়া মানা করিয়া দিল। যুবতী বলিল—"আমি যাব তিয়াত্তর নম্বর হরু বোসের গলিতে, গ্রে ষ্ট্রীটের ট্রাম থেকে নেমে...."

"হরু বোসের গলি !!"—সকলে উল্লসিত হইয়া উঠিল। রতু বলিল—"হরু বোসের গলি? বাঃ, আমরাও তো ঐ দিকেই যাচ্ছি....আমাদের নম্বরটা কত হে রমেন?"

রমেন, নিখিল এবং অতুল এক সঙ্গে উত্তর করিল—"তেরো।"

"বাঃ, তবে তো কোন কথাই নেই; আপনাকে পৌঁছে দিয়ে...."

বঙ্কু প্রশ্ন করিল—"আগে তিয়াত্তরটা পড়বে কি আগে তেরোটা?—যদি তিয়াত্তরটা পড়ে তো...."

অতুল বুদ্ধির সম্বন্ধে খোঁচা খাইয়া—মুখাইয়া ছিল, অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়াই বলিয়া উঠিল—"না, তিয়াত্তর তো চিরকালই তেরোর আগে, ধারাপাতে মুখস্থ করেন নি?...."

বঙ্কু উত্তর দিবার আগেই যুবতী বলিল—"না, উনি মীন্ করছেন, এটা যদি গলির উল্টো দিক হয়তো বেশি নম্বরগুলোই আগে পড়বে কিনা। আর ব্যাপারও তাই, এই দিকটাই শেষ দিক গলির।"

অতুল কথাটা বলিয়াই নিজের ভুলটা বুঝিতে পারিয়াছিল, একটা ঢোক গিলিয়া তাড়াতাড়ি বলিল—"তা'হলে চল রতু, আর এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিছে গুলতান করা কেন?"

যুবতীকে মাঝে রাখিয়া এবং একেবারেই পাশে থাকিবার জন্য এক-রকম ঠেলাঠেলি করিতে করিতেই সকলে অগ্রসর হইল।

[৩]

বঙ্কু বলিল—"একটা রিকশা ধরে নিয়ে আসব না হয়?"

"সে আর জিগ্যেস করতে আছে?....দু'মিনিট—এক্ষুনি নিয়ে আসছি, এই মোড় থেকে"—বলিয়া নিখিল তাড়াতাড়ি পা বাড়াইতেই যুবতী ব্যস্ত

ভাবে বলিয়া উঠিল—"না, না, এটুকু যেতে আমার কোন কষ্টই হবে না, অব্যেস আছে হাঁটা...."

এক রমেনের মাথায়ই উপকারের নেশা ঢোকে নাই, বরং সমস্ত ব্যাপারটি সে একটা দৈব উপদ্রব বলিয়া ধরিয়া লইয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল, বলিল—"তা ভিন্ন ওঁর দেরিও তো হয়ে যাচ্ছে? রিকশা আনতে-করতে...."

রতুর দিকে চাহিয়া আরম্ভ করিল—"ওদিকে আমাদেরও...."

রতু চোখের ইসারা করিয়া তাহাকে থামাইয়া দিল।

নিখিল বলিল—"ওঁকে কিন্তু ভালো করে প্রোটেক্ট করে নিয়ে যাওয়া দরকার, কে জানে কার কি রকম অভিসন্ধি আছে। আসেপাশে কেউ ওৎ পেতে আছে কিনা...."

আগলানোর মধ্যে কোন খুঁত ছিলই না তাহার উপর আরও ভালো করিয়া আগলাইবার জন্য যে একটু ঠেলাঠেলি হইল তাহাতে কতকটা ভারসাম্য হারাইয়া অতুল যুবতীর প্রায় ঘাড়ে পড়িবার দাখিল হইয়াছিল, মোটাবন্ধু বেশ কড়া হাতে তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া পিছনে টানিয়া লইল, ছাড়ার সময় ইচ্ছাকৃতই হোক বা যাই হোক, একটা ঝাঁকানি লাগিল অতুলের। ওরা তিনজনে একটু আগাইয়া পড়িল।

অতুল রুখিয়া দাঁড়াইয়া চাপা গলায় বলিল—"এর মানে?"

বন্ধু বলিল—"ঘাড়ে পড়বে নাকি ভদ্রমহিলার?"

টের না পাইয়া উহারা আরও একটু আগাইয়া গেছে। অতুল সেইরূপ উগ্রভাবেই বলিল—"আলবৎ পড়ব, তোমার কি?—হোয়াট ইজ দ্যাট টু ইউ?"

এত রোগা লোকের মুখে এতটা বেপরোয়া উত্তর বন্ধু আশা করে নাই, একটু থতমত খাইয়াই মুখের পানে চাহিয়া কি উত্তর দিবে

"আলবৎ পড়ব, তোমার কি ?—হোয়াট ইজ দ্যাট টু ইউ ?"

ভাবিতেছে, রমেন ঘাড় ফিরাইয়া বলিল—"ওকি, তোমরা দাঁড়িয়ে পড়লে, দেরি হয়ে যায় যে !"

যুবতী, নিখিল এবং রত্নুও ফিরিয়া তাকাইল, যুবতী দাঁড়াইয়া পড়িয়া ভীতভাবে ব'লল—"কি হল, দাঁড়িয়ে পড়লেন যে ?"

অতুল বঙ্কুর পানে একটা কটাক্ষ হানিয়া সহজ কণ্ঠে বলিল—"না, বঙ্কুর চোখে একটা কি পোকা পড়ল, তাই...."

বঙ্কু দাঁতে দাঁত পিষিয়া চাপা গলায় বলিল—"যে বলে তার চোখেই পোকা পড়ুক।"

তাড়াতাড়ি আসিয়া যখন নিজের নিজের জায়গা লইল চাপা আক্রোশে তখন দুই জনেরই ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়িতেছে।

গলি বহিয়া সকলে বিডন ষ্ট্রীটে আসিয়া পড়িল। রমেনের মনটা অন্য দিকে, বাকি সবাইয়ের মধ্যে একটু উপকার করিবার জন্য, একটু কথা কহিবার জন্য, একটা কথার একটু উত্তর দিবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেছে। বিদ্রূপগুলা ক্রমেই বেশ স্পষ্ট এবং তীব্র হইয়া উঠিতেছে, চাহনি আরও উৎকট। বিশেষ করিয়া নিখিল, অতুল আর মোটা বঙ্কুর মধ্যে। রত্নু অনেকটা সংযত, একটু কাণ্ডজ্ঞানও আছে; যখন খুব বাড়াবাড়ি হইয়া পড়িবার মতো হইতেছে, দু'একটি কথা বলিয়া ঠাণ্ডা করিয়া দিতেছে।... কেমন হাসিতে হাসিতে সবাই একসঙ্গে বাহির হইয়াছিল, এখন কিন্তু পরস্পরের সম্বন্ধটা ক্রমেই বিষাক্ত হইয়া উঠিতেছে। যুবতী একবার এর সঙ্গে একটু কথা কহিয়া, কি ওর দিকে একটু মিষ্ট, লজ্জিত দৃষ্টিপাত করিয়া, কি তাকে একটু সমর্থন করিয়া বিষটাকে যেন মাঝে মাঝে আরও তীব্র করিয়া তুলিতেছে।

শুধু উপকার আর কথা কওয়া লইয়াই নয়; যাহার যাহা লইয়া পরিচয় সে সেইটাকেই বড় করিয়া আলোচনা করিতে যাওয়াতেও গোলমাল, কথাকাটাকাটির সৃষ্টি হইতেছে।....নিখিল কলেজের কথা তুলিবার চেষ্টা করিল কয়েকবার, কলেজ ম্যাগাজিনে একটা পদ্য দিবার,

জন্য এডিটার অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছে—সে-কথাটাও। মোটা-বন্ধু কলেজ বা কবিতার ধার ধারে না বিশেষ, রমেনের বাল্যবন্ধু, পাড়ার থিয়েটার, জিমনেসিয়ামের পাণ্ডা, সেই হিসাবে চলিয়াছে, কবিতার কথায় বলিল—"ওসব রাবিশ কবিতা-টবিতা এখন ধামাচাপা দিন মশাই, এখন দেশ চায় সোলজার—নার্ভ্—সিনিউজ্—মাস্‌ল্…"

নিজের দক্ষিণ হাতটা মুঠা করিয়া বাঁকাইয়া ধরিল।

কথাবার্তায় যুবতীর একটু পরিচয়ও পাওয়া গেছে, প্রশ্ন করিল—"মিস্ সেন কি বলেন?"

মিস্ সেন একটু মিষ্ট হাসিয়া বলিল—"আমি যে অবস্থায় পড়েছি তাতে আমায় জিগ্যেস করাই বাহুল্য নয় কি?"

বিশেষ এমন হাসির কথা না হইলেও সবাই হাসিয়া উঠিল,—অবশ্য নিখিল ছাড়া।

অভ্যাসবশেই ডান হাতটা একটু শক্ত করিয়া বাঁকাইয়া বন্ধু বলিল,—"একদিন আসুন না আমাদের জিমনেসিয়ামে আমাদের কাপ, মেডেল সব আপনাকে দেখাই। সেদিন ডক্টর মুখার্জি এসেছিলেন, সব দেখে-শুনে…"

অতুল হিংসায় একেবারে জ্বলিয়া খিচাইয়া বলিল—"আরে রেখে দাও তোমার জিমনেসিয়াম,—গুণ্ডামির আড্ডা একটা, সেবারে হাতীবাগানের অগ্নিকাণ্ডের পর থেকে আমার ও জিনিসটার ওপরই বিতেষ্টা ধরে গেছে…"

বন্ধু দাঁড়াইয়া পড়িল, চোখ দুইটা বড় করিয়া গলাটা বাড়াইয়া বলিল—"তোমার বিতেষ্টা ধরে গেছে!—এতবড় একজন এ্যাথলেট মিষ্টার পাম লীফ সিপয়?—আমি কালই গিয়ে তুলে দোব জিম্‌নেসিয়ামটা…"

অতুল আর বন্ধুকে কিছু বলিল না, রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে রমেনের

পানে চাহিয়া বলিল—"রমেন, আমি এখান থেকেই ফিরলাম ভাই, দুঃখ করো না, এমন একজন অভদ্র যে কম্পানিতে...."

বঙ্কু বাঁকিয়া দাঁড়াইল, গর্জন করিয়াই বলিল—"অভদ্র !!"

রতু দুইজনের মাঝে দাঁড়াইয়া এ-ঝোঁকটাও সামলাইয়া লইল। আর ঢাকিবার চেষ্টা বৃথা জানিয়া সহজ কণ্ঠেই বলিল—"মিস সেন কতটা দুঃখিত হচ্ছেন ভাবো দিকিন!"

[৪]

দুঃখিতই হইয়াছে মিস সেন, একটু নিরাশও; একটা সুযোগ নষ্ট হইলে কে না হয়?—তবে সে-ভাবটা চাপিয়া একটু হাসিয়া বলিল—"না, না, এতে আর দুঃখের কি আছে? নিজের নিজের ব্যক্তিগত অভিমত...."

বঙ্কু আবার দাঁড়াইয়া পড়িল, শরীরটাকে শক্ত করিয়া লইয়া বলিল—"ব্যক্তিগত অভিমত! অভদ্র বললে সমস্ত কম্পানিটাকেই অভদ্র বলা হোল না? অথচ আপনি—একজন ভদ্রমহিলা সেই কম্পানিতে...."

অতুল আবার রুখিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"খবরদার ওঁকে এর মধ্যে টানবে না বঙ্কু, লেডিদের আমি কতটা সম্ভ্রম করি তুমি জান না...."

রতু আবার অগ্রসর হইয়া আসিল, দুইজনকে দুইদিকে সরাইয়া দিয়া বলিল—"আঃ, থামো না ভাই; বেশ তো, সম্ভ্রম করো তো অমন করে আস্তিন গুটোচ্ছ কেন?"

রমেনের বিলম্ব হইয়া যাইতেছে; বিরক্ত এবং অধীরভাবে নাকটা কুঁচকাইয়া দাঁড়াইয়াছিল, বলিল—"তার চেয়ে আমি বলি, অতুল যেমন যেতে চাইছিল ওকে যেতেই দাও না...."

অতুলের ভাব একেবারে বদলাইয়া গেল,—অভিমানে মুখটা গম্ভীর করিয়া রমেনের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল, প্রশ্ন করিল—"তুমি এই কথা বললে রমেন ?—তুমি—ইউ !"

রমেন থতমত খাইয়া অপ্রতিভভাবে বলিল—"না, না, তুমি নিজে বললে, তাই...."

"বললে তো এই কথা ?—নিজে ইনভাইট্ করে ?"

"না না ; মানে এদিকে এঁর দেরি হয়ে যাচ্ছে...."

"মনে রেখো, আমার আর দোষ রহিল না,—নিজেই ডেকে নিজেই তাড়ালে...."

"না, না, আমায় ভুল বুঝনা অতুল, এঁরও দেরি হয়ে যাচ্ছে, সেখানেও একজন মেয়েছেলে কনসারণ্ড্—তাই...."

"মাইণ্ড্, তোমার কাজেই যাচ্ছিলাম.... গুড্ বাই...."

মনে হইল যেন গলাটাও একটু ধরিয়া গেছে। ঘুরিয়া মাথার উপর হাতটা তুলিয়া আবার দুইবার "গুড্ বাই, গুড্ বাই" বলিয়া উল্টা দিকে পা বাড়াইতেই রতু ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—"কি ছেলেমানষী হচ্ছে অতুল—মিস সেনের সামনে ?...."

যেমন হয়, অভিমানটা বাড়িয়াই গেল। "তবে তুমি অতুল মিত্তিরকে চেন না ভাই।"—বলিয়া একটা ঝাঁকুনি দিয়াই হাতটা ছাড়াইয়া অতুল অন্ধকারের মধ্যে মিশাইয়া গেল।

সকলে একটু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। তারপর রতু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল—"আমাদের মার্জ্জনা করবেন, মিস সেন !"

এবারেও মিস সেন একটু মিষ্ট হাসিয়াই বলিল,—"সে কি ! এতে মার্জ্জনার কি আছে ? নিজের নিজের অভিরুচি...."

দলটা আবার অগ্রসর হইল।

গলি অপেক্ষা সদর রাস্তায় লোক চলাচল বেশি, অন্ধকার তো আছেই ; এদিকে চারজনেরই এমন করিয়া আগলাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা যাহাতে মিস্ সেনের গায়ে অন্য কাহারও গাটি না লাগে। ব্ল্যাক আউটের রাস্তায় লোকে একটু ব্যস্ত বিব্রত হইয়াই চলে, কয়েকজনের সঙ্গে ছোটখাট একটু সংঘর্ষও হইয়া গেল। বেশি নয়, কথা কাটাকাটি পর্যন্তই, কেননা মোটা বন্ধু সবক্ষেত্রেই আগাইয়া দাঁড়াইতেছিল বলিয়া ব্যাপারটা বেশি অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না। তবু বিলম্ব হইতে লাগিল।

হয়ত নিখিলই শুরু করিল—"চোখ নেই মশাই? দেখছেন একজন মেয়েছেলে যাচ্ছেন...."

"যান না উনি, আমি তো তফাতে আছি।"

"যান না উনি মানে? আমি এগিয়ে না এলে আপনি তো ঘাড়ে পড়ছিলেন ওঁর।"

"ঘাড়ে পড়ব—পাগল না খ্যাপা?"

"উলটে আমাকেই পাগল না খ্যাপা বলছেন?...."

"কি অন্যায়টা বলেছি? নাহক যেমন গায়ে প'ড়ে ঝগড়ার জোগাড়...."

নিজের দর বাড়াইবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই মোটা বন্ধু অন্ধকারে একটু আড়ালে থাকে, এই রকম মোক্ষম সময়টিতে আসিয়া সামনে দাঁড়ায়। নিজের শরীরটাকে যথাসম্ভব স্পষ্ট করিয়া ধরিয়া বলিল—

"কি ঝগড়ার জোগাড়ের কথা হচ্ছে যেন? আমি একটু শুনতে পাই?"

লোকটা আপাদমস্তক একবার দেখিয়া লইল। বলিল, "না, বলছিলাম—সন্দে রাতে যদি এতটা বেহুঁস হই যে একজন ভদ্রমহিলার

ঘাড়ে পড়ি তো পাগল ভিন্ন কি বলবে লোকে আমায় ?....এই কথাই বলছিলাম ওঁকে।"

একটু হাসিবার চেষ্টাও করায় আর গোলমাল বাড়িল না।

কিন্তু অন্যদিকে গোলমালের সৃষ্টি হইতেছে। নিখিল ভিতরে ভিতরে উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে। একবার সামান্য উপলক্ষেই ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল উত্তাপটা। নিখিল বলিল—"আঃ, এবার আপনিই যে ঘাড়ে এসে পড়বেন মশাই !"

বঙ্কু প্রশ্ন করিল, "কার ?"

"আমার, আবার কার ?"

"সরে দাঁড়ান আপনি, একটু গায়ে গা ঠেকলেই যদি মনে করেন ঘাড়ে পড়ছি তো ...."

"সরে দাঁড়ান মানে ? সবাইকে কি অতুলবাবু পেয়েছেন নাকি ? আমার ঘাড়ে একটা কর্তব্যের বোঝা আছে, যতক্ষণ না সে বোঝা নামছে ততক্ষণ নিখিল গাঙ্গুলী নিজের পোষ্ট ছাড়বে না জানবেন। এই তার প্রিন্সিপল—এর জন্যে সে আত্মবলি দিতেও প্রস্তুত, আমি অতুলবাবুর মতন...."

বঙ্কু ঠোঁট কুঁচকাইয়া শ্লেষের দৃষ্টিতে শুনিতেছিল, বলিল "শুধু ফাঁকা ভাবায় জোরে যদি এ-সব ডিউটি সারা যেত ..."

নিখিল দাঁড়াইয়া পড়িল, অল্প পরিসর বুকটা চিতাইয়া বলিল—"অন্য রকম শক্তিরও অভাব নেই, যদি মনে করেন গুণ্ডাদের মতন আখড়ার মাটি মাখলেই...."

বঙ্কু একেবারে ঘুসি বাগাইয়া দাঁড়াইল, হুঙ্কার করিয়াই বলিল—"আর একবার বলুন তো ও-কথাটা...."

রতু, রমেন দুই জনেই মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল। লোকের চলাচল

বেশি, বেশ কয়েকজন ঘিরিয়া দাঁড়াইল ; জিজ্ঞাসাবাদ, মন্তব্য, সালিশী ;—বেশ খানিকটা গোলমালের পর যখন সবাই সরিয়া গেল, দেখা গেল অতুল আবার কখন আসিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া আছে। উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করিল—"আমায় ডাকছিলে তোমরা কেউ ?"

সকলেই অন্ধকারে যেন ভূত দেখিয়াছে এইভাবে একটু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। রমেন, রত্ন, নিখিল একসঙ্গে প্রশ্ন করিয়া উঠিল—"তুমি ! চলে গিয়েছিলে যে, আবার····"

অতুল একটু অপ্রতিভভাবে বলিল—"না, ইয়ে—যাচ্ছিলাম—যাচ্ছিলাম হঠাৎ মনে হল কে যেন দুবার 'অতুল, অতুল', বলে ডাকলে—থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে একটু ভাবলাম, তারপর কোন বিপদ হয়েছে মনে করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছি····"

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসার মত হাঁপাইতেছে না মনে পড়িয়া যাওয়ায় তখনই সেটা আরম্ভ করিয়া দিল। মিস সেন একটু সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল—মনে হইল যেন "খুক্-খুক্" করিয়া দুইবার চাপা হাসির শব্দ হইল—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই জোর কাশির শব্দ আরম্ভ হওয়ায় কাহারও সে সন্দেহটা আর বাড়িবার অবসর রহিল না।

কিন্তু গোলমালটা আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। একে নিখিলই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহার পর অতুল গিয়া আবার ফিরিয়া আসিল—চাপা রাগে মোটা বঙ্কু ফোঁস ফোঁস করিতেছিল, মনের ভাবটা আর চাপিতে পারিল না, বলিল—"বঙ্কার একটু গোঁয়ার-গোবিন্দ বলে বদনাম আছেই—পেটের কথা চেপে রাখতে পারে না,—তুমি যদি সত্যিই চলে যেতে অতুল তো এতক্ষণ বোধ হয় মাইল খানেক তফাতে থাকতে—নিখিলবাবু বার দুয়েক তোমার নাম করেছেন কি না করেছেন অতদূরে তার আওয়াজটা····"

অতুল গর্জন করিয়া আগাইয়া আসিল—"যাই নি তো আমি চলে—গোঁয়ার-গোবিন্দের হাতে ভদ্রমহিলাকে ছেড়ে...."

মাথায় যে আগুনটা ধোঁয়াইতেছিল, একেবারে দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল,—বঙ্কু হুঙ্কার করিয়া উঠিল—"জিব টেনে বের করে নোব!"

একেবারে মাথার উপর ঘুসি তুলিয়া ধরিল। এবারে আর রতু, রমেন আসিয়া পড়িতে পারিল না; তাহার আগেই "কি করছেন, কি করছেন, ছিঃ!"—বলিয়া বারণ করিবার অছিলাতেই নিখিল মাঝখানে পড়িয়া বঙ্কুর বুকে এমন একটা ধাক্কা দিল যে, সে প্রায় পড়-পড় হইয়াই নেহাৎ জিমন্যাস্টিকের জোরে কোন মতে সামলাইয়া লইল। তাহার পরই সামনে একটা লম্ফ দিয়া দুইজনকে এক সাপটে তাহার চুয়াল্লিশ ইঞ্চি বুকের মধ্যে মরণ-বাঁধনে জড়াইয়া ধরিল।

হাত পা চালানর সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের ভয়টা লাগিয়া থাকে বলিয়া কলিকাতার রাস্তায় মারামারি স্থায়ী হয় না। তবে অল্প সময়ের মধ্যেই যে যার কাজ ভালভাবেই সারিয়া লয়।....ওইটুকুর মধ্যেই জায়গাটায় ভিড় জমিয়া উঠিয়া সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কারও হইয়া গেল। রহিল মাত্র দুইজন, তাহার মধ্যে একজন রমেন। তাহার সঙ্গী বসিয়া পড়িয়া দু' হাতে মুখটা চাপিয়া গোঁ গোঁ করিয়া শব্দ করিতেছিল, রমেন বলিল—"ওঠ্, পুলিশ এসে পড়বে এক্ষুনি—ওদিকেও দেরি হয়ে গেল।—তুই কে?—অতুল, না, নিখিল?—সে ছুঁড়িটাকেও তো দেখতে পাচ্ছি না; কোথা থেকে কালসাপিনী এসে জুটল এক, যেন ছত্রভঙ্গ ক'রে দিয়ে গেল।"

*   *   *   *

পরদিন সন্ধ্যার পর সেই বকুল শাখার আড়ালে আবার দুইজনের সাক্ষাৎ হইল। মলিনার হাতে একটা কাগজের মোড়ক দিয়া সুকুমার

বলিল—"এই নাও তোমার শাড়ি, ব্লাউস আর ভ্যানিটি ব্যাগ; আর এই ছাতা....ক'জন এসেছিল দেখতে?"

মলিনা চাপা গলায় খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "এবার যেদিন থিয়েটারে ফিমেল পার্ট করবে তোমায় মেডেল দোব আমি।.... এসেছিল দু'জন; আহা সে যদি অবস্থা দেখতে! একজন লজ্জায় তো মুখ তুলতেই পারলে না; অতদূর থেকে এসে দুটি প্রশ্ন—'কি নাম, আর কি পড়'; যেন কোন রকমে পালাতে পারলে বাঁচে; আর একজন বাঁ হাতে গালটা চেপে মাঝে মাঝে শুধু গ্যাঙিয়েই কাটিয়ে দিলে। হ্যাঁগা, মার খাওয়ালে কি করে? আহা...."

হাসি চাপিবার জন্য মুখে কাপড় গুঁজিয়া দিল।

সুকুমার বলিল—"ঐতেই হেসে সারা হচ্ছ, সব ইতিহাসটা শুনলে তো পাড়ার লোক জড় করে ফেলবে।"

মলিনা জিদ ধরিয়া বসিল—"না, শুনতে হবেই আমায়।"

একটু কি ভাবিয়া বলিল—"এক কাজ করো; খুড়িমা-টুড়িমা সবার সামনেই কর গল্পটা, তুমিই যে মেয়ে সেজেছিলে আর আমায় দেখার কথা বাদ দিয়ে....হ্যাঁ, তাই করো...."

"পাগল হয়েছ? এত তাড়াতাড়ি করা চলে এ গল্প? একজন আবার এসে গ্যাঙাচ্ছিল বলছ....তবে বলব'খন একদিন—শাগিগরই ....শুধু খুড়িমা থাকবেন না...."

"কবে?"

সুকুমার স্মিত-দৃষ্টিতে একটু চাহিয়া রহিল মলিনার পানে, বলিল— "বিয়ে হয়ে গেলে একদিন।"

মলিনা একটি চটুল হাসিতে ঠোঁট দুইটি কুঞ্চিত করিয়া লইয়া বলিল —"তবে তো খুবই শাগিগর!—বসে থাক সে আশায়—অন্ততঃ দশটা

জায়গা থেকে দেখে না গেলে আমি রাজিই হব না, দেখো ; খান দশেক নমুনা আমি দেখব এখনও… মিলিয়ে নিয়ো….”

হাসি চাপিবার জন্য আবার আঁচল মুখে গুজিয়া দিল।

নিচে বাড়ির ও-কোণ হইতে খুড়িমার গলা শোনা গেল—“মলু, সাবান, তোয়ালে এখানে ফেলে রেখেই যে গা ধুতে চলে গেলি? কি ভুলো মন বাপু মেয়ের !….”

গান

ছোট একটি জংশন স্টেশন। রাত সাড়ে এগারটার সময় সদর লাইনের গাড়ি ছাড়িয়া ওয়েটিং রুমে প্রবেশ করিলাম। দুই রাত আর দুইদিন গাড়িতে কাটিয়াছে, আজকালকার ট্রেণযাত্রা—একেবারে চক্ষু বুজিতে পারি নাই বলিলেই চলে।—কাল সকাল আটটায় আবার গাড়ি। কুলিকে প্রশ্ন করিয়া জানিলাম স্টেশনে খাবার আজকাল একেবারেই পাওয়া যায় না, ময়দা, ঘি, চিনির দেখা সাক্ষাৎ নাই।……শরীর এতই অবসন্ন যে ঐ যে বিশ-পঁচিশ মিনিট আহারে ব্যয়িত হইত সেটাও নিদ্রায় দিতে পারিব জানিয়া কতকটা প্রসন্ন চিত্তেই ওয়েটিং রুমের দিকে অগ্রসর হইলাম।

ভিতরে পা দিয়াই চক্ষুস্থির!

একটা বেঞ্চের সমস্তটা জুড়িয়া এক কাবুলী ঝড়ের মতো নাক ডাকাইয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। আসবাবের মধ্যে বেঞ্চের অতিরিক্ত একটি আরাম কেদারা আর ঘরের মাঝখানে একটি গোল টেবিল। টেবিলটির উপর একটা টিনের সুটকেস আর একটা বড়

কাপড়ের গাটরি। তুইটিতেই ছোট টেবিলটি প্রায় ভরিয়া গিয়াছে। টিনের মধ্যে হইতে যেভাবে হিঙের গন্ধ নির্গত হইতেছে বুঝিলাম এ তুটি কাবুলীর সম্পদ। আরাম কেদারায় একটা বড় মিলিটারি ওভারকোট আর একটা হ্যাপস্যাক নানারকম টুকিটাকিতে ভর্তি; পাশে চামড়ার পটিতে ঝোলান একটা জলাধারও রহিয়াছে। কিন্তু কোন লোক নাই।

কি উপায় করিব ভাবিতেছি এমন সময় পাশের বাথরুমে হঠাৎ একটা উৎকট শব্দ উঠিল। প্রথমটা মনে হইল কেহ যেন তীক্ষ্ণ যন্ত্রের দ্বারা আহত হইয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল। সেদিকে পা বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু নিজের ভুলটা বুঝিতে পারিলাম—খুন নয়, কণ্ঠ-সংগীত, একটা গোরা বাথরুমে গান ধরিয়াছে। ক্লাইভের কপাল জোরে সেরকম সুর কিছু কিছু শুনিতে হইয়াছে, কিন্তু সেরকম কণ্ঠস্বর কখনও কানে আসে নাই। এ পর্যন্ত যে-সব সাহেবী গান শুনিয়াছি, মনে হইল সে-সবের গায়কদের গলা ভারতীয় আবহাওয়ায় অনেকটা মোলায়েম হইয়া গেছে, এ যেন সদ্য জাহাজ থেকে নামিয়া সরাসরি এই জংশন স্টেশনে আসিয়া গলা ছাড়িয়া দিয়াছে।

এদিকে কাবুলীর সেই নাসিকাগর্জন। মুখের উপর গোলাপী রঙের রুমালটা ফেলিয়া রাখিয়াছে—নিঃশ্বাস ফেলার সঙ্গে হাওয়ায় ফুলিয়া সেটার মাঝখানটা কয়েক ইঞ্চি উঠিয়া পড়িতেছে আবার নিঃশ্বাস টানার সঙ্গে সেটা নাকের উপর সাঁটিয়া যাইতেছে। নাক ডাকার যে আমাদের দেশী শব্দ-বৈচিত্র্য আছে সে সব তো রহিয়াছেই, তাহার অতিরিক্তও একটা শব্দ মাঝে মাঝে উঠিতেছে যাহা সম্পূর্ণ অপরিচিত—কেমন একটা ড—ড়—ল—ঘ—ঙ মেশান অদ্ভুত ধ্বনি—সঙ্গে একটা কাবুলী নাকীসুর।

অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করিতেছি, নাক ডাকাটা হঠাৎ একটু কমিয়া গেল

এবং কাবুলী বেঞ্চে দুইটা লঘু চাপড় দিয়া জড়িত কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিল—"চুপ রও, চুপ রও।"

বুঝিলাম গানটা ঘুমে ব্যাঘাত দিতেছে; তবে এখনও সম্পূর্ণ জাগাইতে পারে নাই, কাবুলী ঘুমের ঘোরেই কাল্পনিক গায়ককে ভালো কথায় নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিতেছে। আমি ডাকিলাম—"আগা সাহেব!"

কাবুলী মুখের রুমালটা সরাইয়া উঠিয়া বসিল, ক্লান্ত এবং বিরক্তভাবে মিষ্টি করিয়া বলিল—"গাও মৎ বাবু সাব।"

জানাইলাম আমি তো গাহিতেছি না, গাহিবার কোন অভিসন্ধিও নাই; আগা সাহেব যদি বেঞ্চের আধখানা ছাড়িয়া দেয় তো আমিও একটু আরাম করি।

ঘুমের ঘোরটা গিয়া কাবুলী ততক্ষণে আমি যে গায়ক নয় এটা টের পাইয়াছে। একবার বাথরুমের পানে চাহিল, একবার আরাম কেদারায় রাখা স্যাপ-স্যাক্ প্রভৃতির পানে চাহিল, তাহার পর মুখটা কুঞ্চিত করিয়া আবার রুমালে মুখ ঢাকিয়া সেইরূপ লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল। বুঝিলাম আমি বা আমার কথা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

কিন্তু সে আরাম করিয়া নাক ডাকার পালা ক্ষান্ত হইল। গান আরও জমিয়া উঠিয়াছে, কয়েকবার দারুণ বিরক্তিতে উঁঃ—উঁঃ শব্দ করিয়া কাবুলী মুখের রুমালটা সরাইয়া ফেলিল, আমি হোল্ড-অলটা খুলিয়া নিচেই বিছানাটা খুলিবার চেষ্টা করিতেছি, আমার পানে চাহিয়া বলিল—"বাবু সাব, উস্ বা কো মানা করো।"

আনন্দই হইল একটু—যখন দেখিতেছি আমাকেও ঘুমাইতে দিবে না। হিন্দিতেই বলিলাম—"ও আমার মানা শুনবে কেন সায়েব? তুমি নিজেই করনা গে।"

শরীরের যে রকম বহর দেখিতেছি এবং মেজাজের যেরূপ অবস্থা,

কথা বাড়াইতে যাওয়াই ভুল হইবে। হোল্ড-অল্'টা খুলিয়া নিচেই বেঞ্চের কাছে বিছানাটা পাতিয়া ফেলিলাম। নিদ্রা যা হইবে বুঝিতেই পারিতেছি,—গোরার গান, কাবুলীর নাক-ডাকা, তাহার উপর আবার মশার গুঞ্জনও নিতান্ত অবহেলা করিবার মতো নয়; তবু পাৎলা উড়ানী-চাদরটা ঢাকা দিয়া—চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িলাম।

গান আরও জমিয়া উঠিয়াছে। কাবুলির নাকডাকা আরম্ভ হইতেছে, কিন্তু টিকিতেছে না,—"উঁ—উঁ" করিয়া বার দুয়েক শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে থামিয়া যাইতেছে। একটু আনন্দ যে না হইতেছে এমন নয়—আমার সঙ্গে যে-ভাবে আচরণ করিল। ঘুমের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া—ওদিকে পরিণাম কি হইতে পারে চিন্তা করিতেছি এমন সময় জালের দরজা ঠেলিয়া একজন শীর্ণকায় মাঝবয়সী বাঙালী ভদ্রলোক ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল, হাতে সতরঞ্চি জড়ান একটি ছোট বিছানা! এ-মুখ, খাবলান-খাবলান পাৎলা গোঁফ যেন চেনা-চেনা। উড়ানির মধ্যে হইতেই ঠাওর করিয়া দেখিতে দেখিতে মনে পড়িয়া যাইতেই দেহে একটু যেন পুলক-শিহরণ খেলিয়া গেল।....দীনু রক্ষিত!!

সেবারের সমস্ত ঘটনাটা মনে পড়িয়া গেল। সে যা দেখিয়াছিলাম তাহাতে বিশ্বাস দাঁড়াইয়া গিয়াছিল কাবুলী-চরিত্র সম্বন্ধে এত বড় বিশেষজ্ঞ সারা বাঙলায় বোধ হয় দ্বিতীয়টি নাই। কেমন একটা আশা হইল এইবার একটা সুরাহা হইবেই।

ঘুমান যে অসম্ভব এটা ধরিয়া লইয়াই দীনু রক্ষিত আমায় শুনাইয়া বাঙলায় বলিল—"বাঃ, এযে আনন্দ-মেলা বসে গেছে;....এঁর পাশেই শুয়ে পড়া যাক একটু...."

বিছানা খুলিবে এমন সময় কাবুলী আবার দুইবার—"উঁ-উঁ" করিয়া নাক-ডাকান বন্ধ করিয়া মুখের রুমালটি সরাইয়া ফেলিল; একটু ক্লান্ত

দোরের ছিট্‌কিনি খুলিয়া গোরাটা বাহির হইয়া আসিল

করিতেছে—মনের ভাবটা—বোঝ, একবার কি ব্যাপারটা ঘটাইতে যাইতেছিলাম।

গোরাটা একটু টলিতে টলিতে আসিয়া হ্যাপস্যাকটা নিচে নামাইয়া এবং ওভারকোটটা হাতলের উপর রাখিয়া আরাম কেদারায় গা এলাইয়া দিল। মনে হইল এইবার গানের যেন আরও সুবিধা হইয়াছে, দুইটা হাত নাড়িয়া একবার ছাতের দিকে, একবার এপাশে একবার ওপাশে চাহিয়া যেন কাহাকে সাক্ষী রাখিয়া গলা খুলিয়া দিল।

কাবুলী কিছুক্ষণ সেইভাবে থাকিয়া ললাটে একটা মৃদু করাঘাত করিল, তারপর কি একটু ভাবিয়া লইয়া মিনতির ভঙ্গীতে ডান হাতটা বাড়াইয়া গোরাটাকে হিন্দীতে অনুরোধ করিল—"গুর্-রা সাব, মেহেরবাণী করকে বন্দ করো, শোয়েগা।"

মনে হইতেছিল চরম হইয়াছে, কিন্তু কাবুলীর মিনতির পর আরও যেন এক পর্দা বাড়িয়া গেল।....ঘুম চটিয়া গেছে, এখন ব্যাপারটা কোন্ দিকে গড়ায় সেই ঔৎসুক্যেই চাদরের বাহিরে দৃষ্টি ফেলিয়া রাখিয়াছি; অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সেই সঙ্গে কেমন একটা বিশ্বাস ক্রমেই দৃঢ় হইয়া উঠিতেছে, দীনু রক্ষিত শেষ পর্যন্ত একটা রাস্তা বাহির করিবেই—ওর চোখ মুখ ক্রমেই সয়তানিতে যেন নিটোল হইয়া ভরিয়া আসিতেছে।

উলটা উৎপত্তি হইল দেখিয়া কাবুলী নিরাশ হইয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল, একবার গোরাটার পানে চাহিতেছে, একবার সামনে দেখিতেছে একবার দুইটা কান চাপিয়া বলিতেছে—"ইয়া আল্লা।"....কিছুই যেন ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

তার পর হঠাৎ একবার দীনু রক্ষিতের ডান হাতটা ধরিয়া বলিল—"বাবু সাব, গুর-রা হিন্দী নেই সমজতা, তোম অংরেজীমে বোলো! আচ্ছা হিং দেগা বাবু সাব—কাবুলী হিং...."

দীনু রক্ষিত হাত দুইটা একবার যুক্ত করিয়া তখনই আবার তফাতে সরাইয়া লইয়া বলিল,—"মাফ করো আগা সায়েব, হাম এ ফ্যাসাদমে

নেহি হ্যায়, মাফ করো। একঠো বদ্দা দেগা ওইসে বাপকা কেয়া নাম থা ভুল যায়গা। কাল আদালতমে কেস্ হ্যায়, উকিল পয়লা ওই নামই পুঁছেগা।”

কাবুলী যেন হঠাৎ এক মতলব ঠাহর করিয়াছে এইভাবে বলিল—“বাবুজী, এক বাৎ শুনো।”

দীনু রক্ষিত বলিল—“কহো না আগা সায়েব—আজকে তো শোনবারই পালা বাবা—কান হাট আতুর করে বসে আছি।”

কাবুলী বলিল—“বরদাস্ত নৈ ওতা হ্যায় বাবুজী, তুম মনা করনে কা অংরেজী বোলো—হাম খুদ কয়েগা গুর্-রা কো।”

“মানা করবার ইংরেজী আমায় বলে দিতে হবে?”

চাদরের অভ্যন্তর হইতে দেখিতেছি দীনু রক্ষিতের ঠোঁটের কোণ, নাকের ডগা, চোখের প্রান্ত যেন শান দেওয়া ছুরির মতো তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিতেছে। একবার বলিল—“হামকো ই ফ্যাসাদমে কেঁও ঘিঁচতা হায় আগা সাহেব? গরীব বাঙালী, পাঁচটা কাচ্চাবাচ্চা হায় ঘরমে।”

“নেই বাবু বোলো, হিং দেগা, আচ্ছা হিং, কবুলী হিং।”

মনে হইল দীনু রক্ষিতের যে-চোখটা আমার দিকে ছিল তাহার দৃষ্টিটা যেন খুব সূক্ষ্মভাবে আমার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, এদিক-কার অধরপ্রান্তও ঈষৎ কুঞ্চিত। বলিল—“বেশ বাবা, যথা অভিরুচি, রাম মারণে সে ভি মরেগা, রাবণ মারণে সে ভি মরেগা—য্যায়সা হুকুম আগা সায়েব।” শুনো।”

সংগীত যা চলিয়াছে তাহার পর্দা ভেদ করিয়া কোন আওয়াজই উঠিবার উপায় নাই, তবু দীনু রক্ষিত কাবুলীকে একটু নিজের দিকে টানিয়া লইয়া একটু নিচু গলায়ই বলিল—“বোলো ডোণ্ট সিং, ইউ রাস্কেল।”

কাবুলী কানটা আরও আগাইয়া আনিয়া প্রশ্ন করিল—"কেয়া ?"

"বোলো—ডোণ্ট"

"ডুণ্ট।"

"সিং"

"সিং।"

"ইউ"

"ইউ।"

"ডোণ্ট সিং ইউ।"

"ডুণ্ট সিং ইউ।"

ফিচলেমি বুদ্ধিতে হাসি চাপা দুষ্কর হইয়া উঠায় পাশ ফিরিয়া শুইলাম।

"ডোণ্ট সিং ইউ রাসকেল।"

"ডুণ্ট সিং ইউ রাসকেল।"

আরও দুই তিনবার মক্স করিয়া লইয়া কাবুলী গোরার পানে গলা বাড়াইয়া বলিল—"ডুণ্ট—ডুণ্ট...."

তাহার পরই হঠাৎ গলাটা টানিয়া লইয়া সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করিল—"বাবু সা'ব, রাসকেল মানে কেয়া হ্যায় ?"

আমারও সন্দেহ ছিল অতি লোভে দীনু রক্ষিত একটা বোধ হয় ভুল করিয়া ফেলিতেছে। বোধ হয় আমাকে লক্ষ্য করিয়াই ছোট্ট করিয়া একবার—"এই মজিয়েছে" বলিয়া দীনু রক্ষিত বলিল—"রাসকেল মানে—রাসকেল মানে—মিলিটারী টারম্ হ্যায় আগা সায়েব।"

বুঝিলাম একটা বড় কথায় চাপা দিয়া চিন্তার জন্য সময় লইতেছে। কাবুলী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—"মিল্‌টিরি—মিল্‌টিরি....কেয়া কহা বাবুজী ?"

"মিলিটারী টার্‌ম্‌—ফৌজী লবোজ"

কাবুলী একটু কি ভাবিল। মনে হইল এই সাধারণ ইংরাজী গালাগালটা কোথায় শুনিয়াছে, বোধ হয় ব্যবহারের প্রসঙ্গটার সঙ্গে দীনু রক্ষিতের "ফৌজী লবোজ"-এর একটা অর্থগত সাদৃশ্য দেখিয়া আর কিছু প্রশ্ন করিল না। কিন্তু সন্দেহটা ওর ঘুচিল না। আবার একটু চুপ করিয়া ভাবিল, তাহার পর অল্প একটু হাসিয়া বলিল—"বুল্ গিয়া বাবু সাব, তুম বোলো, তুম বোলো। অচ্ছা, উ বাবু জানতা হ্যায় ?"

না দেখিলেও বুঝিতেছি আমায় লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন। দীনু রক্ষিতই বাঁচাইল, বলিল —"উ বাবু উকিল হ্যায়, কানুন জানতা হ্যায়, জাগানেসে...."

—বোধ হয় তাতে হাতকড়ির ইসারা করিল, কাবুলি তাড়াতাড়ি বলিল, "চোর দেও বাবু, তুম বোলো, আচ্ছা হিং দেগা...."

ওদিকে সেই এক ভাব, গানের না আছে বিরতি, না আছে কিছু।

কাবুলী বোধ হয় হিং বাহির করিবার জন্য উঠিতেছিল, দীনু রক্ষিত তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। ঠিক এই সময় গোরাটাও হঠাৎ গানটা বন্ধ করিল ; একটা যেন অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে, কাবুলী এইভাবে তাহার পানে একটু চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে আবার বেঞ্চে বসিয়া পড়িল, একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"খোদা খয়ের করে।"

গোরাটার গানে বিতৃষ্ণা আসে নাই, অন্য তৃষ্ণা বাড়িয়াছে মাত্র। টলিতে টলিতে উঠিয়া খালি বোতলটা জানালা গলাইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল, এবং তাহার পর হ্যাপস্যাক হইতে একটা নূতন বোতল বাহির করিয়া ছিপিটা খুলিয়া ঘট ঘট করিয়া খানিকটা সুরা ভিতরে চালান করিয়া দিল। বোতলটা বাড়াইয়া একবার দীনু রক্ষিত আর একবার কাবুলীকে কি বলিল, তাহার পর টেবিলের উপর চাপিয়া বসাইয়া দিয়া নূতন উদ্যমে গান ধরিল।

কাবুলী ললাটে করাঘাত হানিয়া বলিল—"ইয়া আল্লা, পিন্ সয়তান সওয়ার উয়া !"

নিতান্ত করুণ এবং অসহায় ভাবে দীনু রক্ষিতকে বলিল—"বাবুজী, মানা করো, খুদা আচ্ছা করেগা !"

দেখিতেছি দীনু রক্ষিতের মুখ-চোখ আবার তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিতেছে। আমারও এদিকে অসহ্য হইয়া উঠিতেছে, মাথাটা ঝিম-ঝিম করিতেছে, কাবুলী না থাকিলে গানের মধ্যেও বোধ হয় অল্প অল্প অভ্যস্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম, এ এক একটা ফ্যাচাং তুলিয়া ঔৎসুক্য বাড়াইয়া যেন আরও বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। দীনু রক্ষিত করুক কিছু একটা, বাঁচি।

কাবুলী আবার তাগাদা দিল—"বাবুজী, মানা করো...."

দীনু রক্ষিত ভালো করিয়া শুনিবার ভঙ্গীতে ডান কানের পিছনে হাতটা দিয়া গোরার পানে একটু গলাটা বাড়াইয়া দিল, তাহার পর হাতটা সরাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিল—"নেই আগা সায়েব, নেই হোগা, গান বদল দিয়া।"

অত্যন্ত কৌতূহল হইল। বোধ হয় খাজা স্কট,—আমি তো তখন থেকে গানের একবর্ণও বুঝিতে পারিলাম না, আর সুরতাণ্ডবও তো সেইরূপই চলিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। তবে দীনু রক্ষিতের জ্ঞান এ বিষয়ে এতই সূক্ষ্ম নাকি—ভাষা, সুর দুই বিষয়েই! আশ্চর্য ব্যাপার, কিন্তু আমার কেমন যেন বিশ্বাস দাঁড়াইয়া গেছে আশ্চর্য হইলেও দীনু রক্ষিতের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

খুব কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলাম গানটা। অনেকক্ষণ শুনিয়া কোন মতে দুইটা কথা উদ্ধার করিতে পারিলাম—এনিমিজ ব্লাড (**enemy's blood**)। একে মদের গলা, তায় ভাষাটাও খুবই সম্ভব পুরোপুরি ইংরাজী নয়,—আর একটা কথাও ধরিতে পারিলাম না।

কাবুলী ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল—"সয়তান কা গীত গাতা হ্যায় বাবু, মানা করো।"

আমার ঢাকা মুখের উপর চকিত দৃষ্টি ফেলিয়া দীনু রক্ষিত কাবুলীর পানে চাহিয়া বলিল—"ও ইস গান নেই থামাবে গা আগা সাহেব, হাজার কহনে সে ভি নেই থামাবে গা, এ উসকা দিল্‌কা গান হ্যায়।"

কাবুলী বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল—"দিল্‌কা ?"

দীনু রক্ষিতের মুখটা একটা কুটিল অথচ সরস হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, মাথাটা নাড়িয়া নিজের বুকের মাঝখানটিতে দুইটা টোকা মারিয়া বলিল—"হঁ্যা, দিল্‌কা—ও আপনা প্রেমিকা-কা গীত গাতা হ্যায় আগা সাহেব, লাক রূপেয়া দেনেসে তোব্বি নেই ছোড়েগা।"

হাসির সঙ্গে চোখটাও একটু নাচাইয়া দিল।

কাবুলী বুক দেখাইয়া এবং বলার ভঙ্গীতে আন্দাজে বোধ হয় একটু একটু বুঝিয়া থাকিবে। মুখটা একটু যেন কিরকম হইয়া গেল, আবার প্রশ্ন করিল—"কিস্‌কা গীত উদু মে বোলো বাবু।"

*আমায় শুনাইবার জন্যই দীনু রক্ষিত বাংলায় বলিল—"স্কচও জানতে হবে, আবার উদু ও জানতে হবে—ভাটপাড়ার শিরোমণি ঠাকুর পেয়েছেন।...."

বুকের মাঝখানটা দেখাইয়াই কাবুলীকে বলিল "প্রেমিকা—দিলকো আওরাৎ যিসকো বোলতা হ্যায়। যিসকো সাদী করনা চাহতা হ্যায়।"

কাবুলীর মুখে একটা পরিবর্তনের ভাব ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। গানের প্রতি সেই যে আতঙ্কের ভাব ছিল, সেটা ধীরে ধীরে অপসারিত হইয়া মুখটা নরম হইয়া আসিতে লাগিল, একটু পরে দেখিলাম গানের উত্তাল তালে একটু একটু শরীর দোলাইতেছে। ব্যাপারটা কি হৃদয়ঙ্গম

করিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় দাড়ি-গোঁফের মধ্যে যেন গুন গুন করিয়া গানের শব্দ উঠিল।

দীনু রক্ষিত বলিল—"ঘুমুচ্ছেন ?—কালোয়াতির লড়াইটা শুনবেন একবার। ওবুধ ধরেছে।"

কাবুলী গলাটা একটু তুলিবার মুখে থামিয়া গিয়া দীনু রক্ষিতকে কহিল—"বাবুজী, হামবি গীত গায়গা।"

দীনু রক্ষিত বলিল—"আপকা মর্জি আগা সা'ব। বহুৎ মিঠা গলা হ্যায়।"

এবার গলা যে আর এক পর্দা উঠিল, তাহাতেই আঁচ পাইয়া বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু গানে বাধা পড়িল। সুরটা কানে যাইতেই গোরা গান থামাইয়া কাবুলীর মুখের পানে চাহিয়া কচ-কচ করিয়া কি খানিকটা বকিয়া গেল, ভাষা না জানিলেও এটুকু আর কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না যে কাবুলীর গানে তাহার প্রবল আপত্তি আছে।....টেবিল হইতে বোতলটা তুলিয়া লইয়া দুই ঘোট পান করিয়া বোতলটা রাখিয়া দিল। তার পর উগ্রভাবে আর একবার কাবুলীটার পানে চাহিয়া লইয়া আবার সংগীতে মনোনিবেশ করিল।

এবার **Enemy's blood** কথা দুটো একটু দ্রুত দ্রুত কানে আসিতে লাগিল।

কাবুলী একটু চুপ করিয়া কি ভাবিল, বোধ হয় বাঙালী বাবুর সামনে গোরার হুমকিতে দমিয়া যাইবার লজ্জায়ই গুন গুন করিয়া এক কলি গাহিল, তাহার পর দীনু রক্ষিতকে বলিল—"বাবুজী, উসকো বি থমনে বোলো।"

দীনু রক্ষিত বলিল—"ভালা বিপদ! ও নেহি থামেগা আগা সাহেব....আপন আওয়াজকো খুব পেয়ার করতা হ্যায়—বোলতা হ্যায় তোমকো বাস্তে জান দেগা।"

কাবুলী গুম হইয়া কিছুক্ষণ কি ভাবিল। তাহার পর একটু গা-ঝাড়া দিয়া বলিল—"হামবি জান দেগা বাবুজী।"

দীনু রক্ষিত বলিল—"দেনা রে বাপু, তাহলে এদিকে আমাদের জান দুটো বাঁচে।....তুম বি অপনা অওরাৎ কো পেয়ার করতা হ্যায় ?"

"বউৎ পেয়ার করতা হ্যায় বাবুজী, বউৎ-বউৎ।"

"তব সুরু করো।....ঠাণ্ডা হয়ে যায় কেন ?"

কাবুলী কিন্তু সুরু না করিয়া আবার চিন্তিতভাবে বসিয়া রহিল, তাহার পর একটু কুণ্ঠিত স্বরে প্রশ্ন করিল—"বাবুজী ইয়ে গানেসে বড়া বাবু বান্ দেগা ?"

সেই আইনের ভয়, বড়বাবু অর্থাৎ ষ্টেশন মাষ্টার হাতে হাত-কড়ি লাগাইয়া দিবে। দীনু রক্ষিত কি একটু ভাবিল, তাহার পর প্রশ্ন করিল—"কোন ক্লাসকা টিকিট হ্যায় ?"

"সিকিন্ গিলাস টিকিট বাবুজী— গাড়িমে বউৎ বিড় হ্যায়।"

—কাবুলী তাহার বড় বটুয়ার ফাঁস খুলিয়া একটা ছোট কৌটা বাহির করিল, এবং তাহার ভিতর হইতে একটা সবুজ রঙের টিকিট বাহির করিয়া দীনু রক্ষিতের হাতে দিল। দীনু উৎসাহিতভাবে বলিল—"বাঃ, ঠিকই তো সিকিন্ কিলাস হ্যায়, যেত্তা খুশি গাও ; নাচেগা ?"

"নেই বাবুজী, খালি গায়েগা।"

"ফাষ্ট কিলাস টিকিট রহনে সে নাচনে বি দেতা : যেত্তা খুশি গাও।.... ঘুমুলেন নাকি ? আর বিশেষ বিলম্ব নাই, আরম্ভ হোল বলে।"

কাবুলী দাড়ির উপর হাত দুইটা কয়েকবার বেশ ভাল করিয়া টানিয়া লইল, তাহার পর একেবারেই যে পর্দায় আরম্ভ করিল, মনে হইল দু'এক লাইন গাহিয়াই বোধ হয় গোরাকে পিছনে ফেলিয়া যাইবে।

"হোয়াজ্যাট্ !" গোছের একটা প্রশ্নের সঙ্গে গোরাটা একেবারে

চেয়ার ছাড়িয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর একতোড়ে কি কতকগুলা বলিয়া গিয়া ঘুসি বাগাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আর ঘুমের ভান করা বৃথা, সতর্ক থাকাও দরকার, কে জানে শ্রাদ্ধ কতদূর গড়াইবে ; বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া মুক্ত দৃষ্টিতে ব্যাপারটা লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। কাবুলীর সান্নিধ্য আর নিরাপদ নয় বুঝিয়া দীনু রক্ষিত গলা খাঁকারি দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল, প্রবেশ করিয়া আর বেঞ্চে না বসিয়া আমার পাশে আসিয়া বলিল—"অনুমতি দেন তো একটু বসি বিছানাটায় ; ওদিকটা আর নিরাপদ নয়।"

বলিলাম "বসুন, কিন্তু মহা এক ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসেছেন।"

"এক্ষুণি মিটে যাবে, দেখুন না দুটোকেই সরাচ্ছি।"

গোরাটা দৃষ্টি উগ্রতর করিয়া কাবুলীর পানে খানিক্ষণ চাহিয়া রহিল, কাবুলী চুপ করিয়াছে, কিন্তু ভয়ের কোন ভাব নাই। গোরাটা একটু পরে আসিয়া নিজের জায়গায় বসিয়া বোতলটাকে আর একটু খালি করিল, বোধ হয় রসভঙ্গ হওয়ার জন্য আরও একটু চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর কাবুলীর পানে একটা রণং-দেহি দৃষ্টি হানিয়া আবার গলায় একটি ঝাঁকানি দিয়া শুরু করিয়া দিল।

কাবুলী কয়েকবার গোরার পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দীনু রক্ষিতকে ডাকিয়া বেঞ্চটা দেখাইয়া বলিল—"বাবুজী, ইঁয়া বেঠো।"

গোরা গাহিয়া চলিয়াছে, ঘরে আর কি হইতেছে না হইতেছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই।

দীনু রক্ষিত ঠোঁট বাঁকাইয়া একটু হাসিয়া আমায় বলিল—"যাই আর একটু তাইয়ে দিয়ে-আসি—ঠিক আইনের কথা ভাবছে, দেখে নেবেন।"

বলিলাম—"আহা, কেন বেচারিকে...."

দীনু রক্ষিত উঠিতে উঠিতেই বলিল—"আপনাকে বসতে দিলে না,

দেখিনি জালের দরজা দিয়ে?—সব সমান মশাই। এখন দায়ে পড়েছে তাই—বাবুজী—বাবুজী।”

পাশে গিয়া বসিতে কাবুলী প্রশ্ন করিল—“বড়বাবু নেই বানেগা—ঠিক জানতা?”

দীনু রক্ষিত আড় চোখে আমার পানে একটু চাহিয়া একটা চোখ কুঞ্চিত করিল, উত্তর করিল,—“ওই বাৎ তো উকিল বাবুকো পুছনে গেয়া, বাবুভি বোলতা বড়াবাবু কুছ নেই কর সকতা। সিকিন কিলাস টিকিট হ্যায়।”

“গুর্-রা কা কিৎনারোজ কা আওরাৎ হ্যায় বাবুজী?”

ধমকে কাবুলীকে ঠাণ্ডা করিয়া গোরা একেবারে চোখ বুজিয়া কণ্ঠস্বরকে মুক্তি দিয়া দিয়াছে। একটু মন দিয়া শুনিবার ভাণ করিয়া দীনু রক্ষিত জানাইল গোরা বলিতেছে—হে প্রিয়তমে তোমায় মাত্র এক মুহূর্তের জন্য দেখিয়াছিলাম, তাহাতেই পাগল হইয়া আছি; আমি চিরদিন তোমার গান গাহিয়া কাটাইব, কোনও দুষমন আমায় থামাইতে পারিবে না। আমি তোমায় অত্যন্ত ভালবাসি।

কাবুলী সবটা শুনিয়া বলিল—“কোই দুষমন নেহি থামা সাকেগা?”

দীনু রক্ষিত জানাইল—“ওই তো কহতা হ্যায় গোরা সায়েব।”

কাবুলী হাতের দুইটা আস্তিন গুটাইল, উগ্রভাবে গোরার পানে একবার চাহিয়া লইয়া জানাইল সেও নিজের আওরাৎকে অত্যন্ত ভালোবাসে, তাহাকেও গান গাওয়া হইতে কোন দুষমন নিরস্ত করিতে পারিবে না। গুর্-রার আওরাৎ তো মাত্র এক মুহূর্তের দেখা, সে তাহার দিলকা আওরাতের সঙ্গে আজ নাগাড়ে তেইত্রিশ বৎসর ঘর করিতেছে—নয় ছেলে, তিন মেয়ে—বড় ছেলের নাম ইউসুফ, মেজর নাম ইসমাইল, তাহার পর সিকন্দর, রসুল, ইব্রাহিম, লতিফ, ইয়ার খাঁ…

বলিতে বলিতে কাবুলী উত্তেজনায় রাঙা হইয়া একসময় ছেলের নামের তালিকা বন্ধ করিয়া সাহেবের পানে চাহিয়া সপ্তমে গলা ছাড়িয়া দিল।

তাহার পরের ইতিহাসটা খুব সংক্ষিপ্ত, ভাব সংক্ষিপ্ত হইলেও সামান্য নয়। কয়েক মিনিটের মধ্যে কয়েকটা দিনের ব্যাপার যেন কে ঠাসিয়া বসাইয়া দিল।....গলা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গোরাটা উগ্র দৃষ্টিতে একবার ফিরিয়া চাহিয়াই—চেয়ারটা লাথি দিয়া ঠেলিয়া একলাফে কাবুলীর ঘাড়ে গিয়া পড়িল, তাহার পর হুঙ্কার, লুটোপুটি, কিল চড়....বেঞ্চ উল্টাইয়া দুইজনে চেয়ারের উপর আসিয়া পড়িল, সেটাকে হাড়গোড় ভাঙ্গা 'দ' করিয়া দিয়া টেবিলটার উপর—সেটার দুইটা পায়া ভাঙ্গিয়া দুই দিকে ছিটকাইয়া পড়িল....আবার বেঞ্চের উপর—আবার টেবিল—কাপড়ের গাঁটরি ছিঁড়িয়া—কাপড় ছত্রাকার হইয়া গেছে, তাহার মধ্যেই এ ওকে জড়াইয়া মারিবার চেষ্টা করিতেছে....আবার ওঠা, আবার পড়া....বম্বে বায়স্কোপের বাহিরে সেরকম দৃশ্য দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। দুই জনে গিয়া এক কোণে জড়ো হইয়াছি। ষ্টেশনে অল্প লোক, কিন্তু সবাই জড়ো হইয়া গিয়াছে—সবাই সবাইকে গিয়া থামাইতে বলিতেছে কিন্তু কেহ এক পা অগ্রসর হইতে সাহস করিতেছে না।

সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা—ওর মধ্যে কাবুলীর গান ঠিক আছে,—একেবারে অভঙ্গ থাকা অবশ্য সম্ভব নয়, তবে যখনই একটু ফাঁক পাইতেছে, কাবুলী এক লাইন আধলাইন, দুটো কথা—যা পারিতেছে তাহার মধ্যেই গজলের সুর ঢালিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে।....সব মিলাইয়া এক অদ্ভুত কাণ্ড।

এসব ব্যাপারে সময়ের আন্দাজ রাখা কঠিন, তবে মনে হইল, যেন মিনিট সাতেক পরে দুইজনে ক্ষান্ত হইল, গোরাটা ভাঙ্গা কেদারার পাশে

মাথা টিপিয়া গোঁ-গোঁ করিতে লাগিল—সর্বাঙ্গে কাটা-ছড়ার দাগ, মাথায় বোধ হয় আরও গুরুতর কিছু ; কাবুলী কাপড়ের গাঁটরির যেটুকু অবশিষ্ট

তারপর হুঙ্কার—লুটোপুটি—কিল চড়…

ছিল তাহার উপরই মাথা চাপিয়া একটা অব্যক্ত আওয়াজ করিতেছে—গানের সুরও আছে কিনা ঠিক বোঝা যাইতেছে না।

এই সময় মেন লাইনের একটা গাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল।

ষ্টেশনের বড়বাবু পর্যন্ত উপস্থিত হইয়াছে ; দীনু রক্ষিত বলিল—"দেখছেন কি মশাই, এই গাড়িতে দুজনকে বড় ষ্টেশনে চালান করে দিন....ফার্ষ্ট এড দরকার...."

বিছানা পাতিতেছি, গাড়ি চলিয়া গেলে দীনু রক্ষিত আসিয়া আমার পাশেই বিছানার দড়ি খুলিতে খুলিতে বলিল—"যাক্, সব ঠাণ্ডা।"

বলিলাম—"বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে গেল কিন্তু।"

দীনু রক্ষিত বিছানা খোলা বন্ধ রাখিয়া বিস্মিতভাবে ঘুরিয়া আমার পানে চাহিল, বলিল—"বাড়াবাড়ি কি মশাই, ওটুকুও হবে না ?—কেউ তো আর পিলেয় ভুগছে না মশাই। ....গাড়ি ছাড়ল,—দেখলাম দুজনে একটু হাসতে হাসতে শেকহ্যাণ্ড করছে,—গোরার ডান চোক ফোলা, আগা সাহেবের বাঁ চোক ; প্ল্যাটফরম ছাড়বার আগেই দুজনে হাতে হাত রেখে গান সুরু করে দিল।....আসুন দুর্গা-শ্রীহরি বলে শুয়ে পড়া যাক।"

নিকটেই ছিল

ই. বি. রেলের নর্দার্ণ সেক্সনে যাঁহাদের গতায়াত আছে, তাঁহারা গাড়ির দেওয়ালে আঁটা একটি এনামেল প্লেটের উপর নিম্নলিখিত সতর্কবাণীটি লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন—

"নিজে টিকেট কেন,—মালের উপর নজর রাখ ; জুয়াচোর চোর ও পকেটমার নিকটেই আছে—"

এই সতর্ক বাণী সম্বন্ধে সতর্ক করাই এই কাহিনীর উদ্দেশ্য। মনে

রাখিতে হইবে, বাণীটি বেদের মন্ত্রের মত অ[illegible]র নয়; সুতরাং এর ভাষার চটকে ঘাবড়াইয়া না গিয়া মন্তব্যগুলি একটু ঢিলা-ঢালি ভাবে লইলে ক্ষতি নাই—না লইলে ক্ষতি আছে কিনা সেই কথাই হইতেছে—

গাড়িখানি পশ্চিমে চলিয়াছে, বাঙ্গালী আর পশ্চিমা মিলিয়া বেশ ভীড়। রাত্রিকাল কার্ত্তিক মাসের শেষাশেষি, অল্প অল্প শীত পড়িয়াছে। যে কামরাটার কথা হইতেছে তাহাতে পশ্চিমাদের সংখ্যাই বেশি। বাড়িমুখো যাত্রা, তাহারা সব স্ফূর্ত্তিতেই চলিয়াছে, ভজন গাহিতে গাহিতে পরস্পরের পরিচয় লইতে লইতে, স্বদেশের গুনকীর্ত্তন এবং বাংলা মুলুকের মুণ্ডপাত করিতে করিতে।

একধারে ঘেঁসিয়া কিছু বাঙ্গালী যাত্রী। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই বেশ বোঝা যায়, তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের ভাবটা বড়ই অপ্রসন্ন আর বড়ই সন্ত্রস্ত,—যেন প্রতি মুহূর্তেই সবাই একটা মারাত্মক রকম বিপদের আশঙ্কা করিতেছে। সন্ত্রস্ত বটে; কিন্তু ত্রাসের ভাবটা মুখ চোখে ফুটিয়াছে মাত্র, তাহা ব্যতীত সবাই স্থির, অসহায়ভাবে স্থির জুতার মধ্যে সযত্নে পা দুটি প্রবেশ করাইয়া দিয়া, কোলের মধ্যে পুঁটুলি সামলাইয়া জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে। যা একটু নড়াচড়া করিতেছে তা গায়ের কাপড়টা একটু গুছাইয়া লওয়া বা নিজের নিজের পকেট কিম্বা ট্যাকটা দেখিয়া লওয়ার জন্য। উপরের বাঙ্কে যাহার ট্রাঙ্ক কি বড় কো[illegible] বোঝা আছে, সে মাঝে মাঝে উঠিয়া একবার হাত বুলাইয়া দেখিয়া লইয়া আবার সামলাইয়া সুমলাইয়া বসিতেছে। কাহারও সহিত কাহারও কথা নাই।

বলা বাহুল্য, ইহারা সকলেই লেখা পড়া জানে এবং এনামেল ফলকের সতর্কবাণীটি পাঠ করিয়াছে—"জুয়াচোর, চোর ও পকেটমার নিকটেই আছে।"

রংপুরে এই কামরায় দুই প্রা[illegible] [illegible]জা দিয়া দুইজন যাত্রী উঠিল। যেদিকে বাঙ্গালীরা ছিল, সেই [illegible] উঠিল একজন পশ্চি[illegible]লি, হলদে কাপড় পরা, গোলাপী গেঞ্জির [illegible] হাঁটু পর্যন্ত কালো[illegible]র পাঞ্জাবী, পায়ে ফুলকাটা নূতন পাম্[illegible]—এখনও আয়ত্ত [illegible]—গোড়ালির পেছনে সাদা কাগজের এক[illegible]নি করিয়া গোঁ[illegible] মাথায় একটা রঙচঙে সস্তা ট্রাঙ্ক, বগলে মাদুর[illegible] মুলুক যা[illegible]।

বাঙ্গালীরা একযোগে খাঁ-খাঁ করিয়া উঠিল। "ইধার কেন আয়া, ওদিকে তো আমাড় জায়গা পড়া হ্যায়"...."যা না বাপু নিজের দলে, এদিকে জ্বালাতে এলি কেন?"...."হিঁয়া ভদ্রলোকের মাথাপর বসেগা?"

"যাতা হ্যায় বাবু, যাতা হ্যায়"—বলিয়া লোকটা সামনের দিকে চলিয়া গেল। যেদিকে পশ্চিমার দল, সেদিকে একজন বাঙ্গালী বৃদ্ধ উঠিলেন। রোগা, লম্বা একমুখ ঘন অবিন্যস্ত দাড়ি;—শীর্ণ মুখখানির সহিত এমন বেমানান যে, মনে হয় যেন পরচুলা। হাতে একটা তালা-আঁটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ।

উঠিয়াই প্ল্যাটফর্মের দিকে গলা বাড়াইয়া বলিলেন—"তাহ'লে আসি বেহাই মশাই, আর বেশিদিন থাকতে পারলাম না বলে দুঃখু করবেন না; আমি গিয়েই সোনাটুকু সেকরাকে দিয়ে দিচ্ছি। বানির টাকাটা তাহ'লে শীগ্‌গির...."

গাড়ি ছাড়িয়া দিল। মুখটা গাড়ির ভিতর টানিয়া লইয়া বিড়বিড় করিয়া বলিলেন—"চামার! তাড়া দিয়ে দিয়ে এত জোরে ছক্করটা—দৌড় করালে যে হাড় কখানা যেন চুর হ'য়ে গেছে। আর একটা দিন না হয় ফেলই করতাম গাড়ি রে বাপু!....আহা, ঘোড়া দুটো....শ্রীকৃষ্ণের জীব!—

আ-মর! একেবারে খোট্টার পালের মধ্যে ঠেলে তুললে? জানি আজ যাত্রা খারাপ!....এই, কোথায় যাবি?....মাথায় তেল চাপড়েছে দেখ না!”

লোকটা মনোযোগ সহকারে একটা পোঁটলার গেরো খুলিতেছিল। খুলিয়া একটা মোটা চাটুর আকারের রুটির গোছা হইতে একখানা তুলিয়া লইল, পাশ থেকে খানিকটা তরকারি লইল, তাহার পর পুঁটুলিটা আবার সযত্নে বাঁধিয়া, সরাইয়া রাখিয়া, খালি জায়গাটুকু হইতে একটা তরকারির টুকরা ঝাড়িয়া দিয়া বলিল—“আঁই, বৈঁঠি বুঢ়া বাবা; আপনি বরাহ্‌মন্‌ দেওতা আছে? পাঁও লাগি।”

“নিপাত যাও, বেটা ম্লেচ্ছ কোথাকার”—অর্ধস্ফুটস্বরে [illegible] আশীর্বাদ করিয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে সরিয়া গেলেন।

চারিদিকেই প্রায় এই অবস্থা।—জল, কাদা, নোংরা পোঁটলাপুঁটলি এবং ততোধিক নোংরা-মানুষ;—ছেলেবুড়া স্ত্রী-পুরুষ সব ধরণের—যেন একরাশ চুন সুরখি খোয়া মাথান মানুষ-কংক্রিটের চাপ।....বেহাইকে গালাগালি দিতে দিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন—“ছি, ছি, এমন চামারের বাড়ি থেকেও মেয়ে আনে! চোখের একটু পরদা নেই। একে তো মুখ ফুটিয়ে বলিয়ে নিলি তবে একখানা টিকিট করে দিলি;—তা’ কোন্ একটা ইণ্টের ক্লাসের টিকিটই’বা কিনে আনতে পারলি প্রাণ-ধরে? তা’হলে তো আর এরকম যন্ত্রনা হয় না.... চামার আর বলেছে কেন?....”

বাঙ্গালীদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়িল; অনেকটা নিজের সংসারে ফিরিয়া আসার মত। একবার চারিদিকটা দেখিয়া লইয়া আত্মীয়তা করিয়া বলিলেন, “যাক্‌, সব স্বজাতি দেখছি, বুড়োকে একটু জায়গা করে দিতে হবে; উঃ, বেটারা যেন নরককুণ্ড করে রেখেছে ওদিকটা।”

আত্মীয়তার কোন প্রত্যুত্তর পাওয়া গেল না। স্বজাতির প্রায় সকলেই যেমন কাঠের পুতুলের মতো অনড় হইয়া বসিয়াছিল তেমনই রহিল; শুধু এইটুকু বোঝা গেল বৃদ্ধের দাড়ির দিকে যেন সবার একটু বেশি কৌতূহল।

অতি শীর্ণ মুখে অতি সুস্পষ্ট দাড়িটি প্রায়ই লোকের নজরে পড়ে। একটু অপ্রতিভ হইয়া পোঁটলা আর ব্যাগটা বাঙ্কের উপর রাখিয়া দিয়া ডান দিকের বেঞ্চে বসিয়া পড়িলেন। বাম পাশের যাত্রীটি মোটাসোটা গোছের মাঝবয়সী লোক, তাঁহার ক্রোড়ে একটা টিনের সুটকেশ, একটা ছোট বিছানা আর একটা মুখবাঁধা হাঁড়ি—বাম হস্তে সামলাইয়া বসিয়া আছেন, ডান হস্তটি পকেটের মধ্যে।

দক্ষিণপাশে একজন মুসলমান,—কালো সূচালো দাড়ি, মাথায় ফুলকাটা একটা টুপি। তাঁহার পাশের লোকটি বৈষ্ণব, গায়ে নামাবলি, কপালে একটি তিলক, নাকে রসকলি। বয়স ৫০।৫৫ হইবে।

নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া মনটা প্রফুল্ল হইল, এবং আবার একটু আলাপ জমাইবার ইচ্ছা হইল; বিশেষ করিয়া বদ্ধ ঘরে ধুঁয়ার মতো বেহাই বাড়ির কটু ইতিহাসটা পেটের মধ্যে আটক থাকিয়া যেন দম বন্ধ করিয়া দিতেছে। তাহাকে একটু মুক্তি দেওয়া চাই-ই। বাড়ি পর্যন্ত অপেক্ষা করা,—সে অনেক দেরি। একটু গলাটা ঝাড়িয়া কাহাকেও না লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"খোট্টাদের জ্বালায় আর গাড়িটারি চড়বার জো রইল না....."

টোপটা কেহই গিলিল না।

আর একবার চেষ্টা করিলেন। ডাহিনে বাঁয়ে একবার অনির্দিষ্টভাবে চোখ বুলাইয়া লইলেন, তাহার পর নিজের মন্তব্য সম্বন্ধে নিজেরই যথেষ্ট সন্দেহ থাকিলেও বলিলেন—"যাহোক্, এদিকটা সবাই ভদ্রলোক দেখছি।"

কোন উত্তর নাই। তখন মরিয়া হইয়া সোজাসুজি পাশের মুসলমান যাত্রীটিকে প্রশ্ন করিলেন, "মশাই কোথায় যাবেন ?"

ভদ্রলোক বিরক্ত হইয়া একটু খিঁচাইয়া উত্তর করিলেন,—"যেখানকার টিকিট কিনেছি সেখানেই যাব মশাই, আপনি স্থির হয়ে বসেন তো। আপনি কোথায় যাবেন বলুন দেখি।"

"ডালিমগাঁও হয়ে...."

"কি করেন ?"

"কিছু চাষবাস আছে, আর কয়েকঘর...."

"কি ছেলেপিলে ? কোথা থেকে আসছেন ?—কত বয়েস ? ব্রাহ্মণ না কায়েৎ ? অত রোগা কেন ? রোগা তো বেহিসেব দাড়ি কেন ?"—বলিতে বলিতে পরিবর্ধমান রাগের চোটে সোজা হইয়া রুখিয়া বসিয়া বলিলেন "আসুন ; দেন উত্তর কত দেবেন।"

বৃদ্ধ একেবারেই কিম্ভূতকিমাকার হইয়া গেলেন। বিনীতভাবে বলিলেন—"হয়েছে, আপনি স্থির হয়ে বসুন।"

"আজ্ঞে না; আর অত খাতিরে কাজ নেই, বোঝা গেছে। গাড়িতে ভাব করে স্থির হয়ে বসার ফল হাতে হাতে পাওয়া গেছে,—একমাসও হয় নি। এই নিন আপনাদের গাড়ি ; আপনারাই ভাল করে বসুন। এইটুকু আসতে তিনবার গাড়ির কামরা বদলাতে হ'ল, নয় আরও একবার সই।"

দুই পকেটে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। একটু পরেই গাড়ি স্টেশনে পৌঁছিল ; বৃদ্ধের প্রতি এবং পাশের বৈষ্ণবটির প্রতি তীব্র কটাক্ষ হানিতে হানিতে নামিয়া গেলেন।

বৃদ্ধ বাম পাশের মোটা লোকটিকে প্রশ্ন করিলেন—"পাগল নাকি ?"

তিনি কোলের জিনিসপত্র একঝোঁক সামলাইয়া লইয়া বৃদ্ধের দিকে আড়ে চাহিয়া সংক্ষেপে বলিলেন, "অবস্থা গতিকে হয়ে উঠেছে!"

"যা বলেছেন, পশ্চিমেদের যা ভিড়, মাথা ঠিক রাখা দুষ্কর।....মশাইয়ের কোথায় যেতে হবে?"

ভদ্রলোক অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিলেন, "এই কাছেই।"

"তবে তো কর্মভোগ শেষ হয়ে এসেছে, আমার এখনও মেয়াদ অনেকক্ষণ। তা, জিনিসপত্রগুলো কোল থেকে নামিয়ে পাশে রেখে দিন না; কষ্ট হচ্ছে মিছিমিছি। জায়গা তো রয়েছে, আমি আর একুটু নয় সরে বসছি, নিন।"

কোলের জিনিসগুলি নামান দূরে থাকুক লোকটি গামছায় বাঁধা পুঁটুলিটি পর্যন্ত কোলে তুলিয়া লইলেন। ভদ্রতার উত্তর স্বরূপ বৃদ্ধের দিকে একটি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানিলেন মাত্র।

বৃদ্ধেরও রাগটা সপ্তমে চড়িয়া গেল! আচ্ছা লোকদের পাল্লায় পড়া গেছে তো, সোজা কথাটা বুঝিবে না কেহ!....শরীরে একটা ছোট রকম ঝাঁকানি দিয়া তিনিও লোকটার দিকে পিছন ফিরিয়া বসিলেন, ওদিকে যেমন ইসারায় অপমান, এদিকেও তাহার যোগ্য উত্তর!

ঝোঁকের উপর উল্টাইতেই বৈষ্ণব বাবাজীর গায়ে একটু পা ঠেকিয়া গেল। গায়ে করস্পর্শ করিতে যাইতেই, তিনি হাতটা দুইহাতে ধরিয়া সস্মিত মিনতিস্বরে বলিলেন,—"থাক্, থাক্, সবই শ্রীকৃষ্ণ, থাক্;....কোথা থেকে আগমন হচ্ছে মশায়ের?"

[২]

মরুপ্রান্তর ঘুরিয়া এ যেন ওয়েসিস। সুধু এক সঙ্গে এতগুলি কথা নয়; বলিবার ভঙ্গিতেও এমন একটি বৈষ্ণবোচিত মধুর গদগদ ভাব যে, সমস্ত শরীরটি যেন জুড়াইয়া গেল। বৃদ্ধ দায়ে-খালাস গোছের একটা

নমস্কার করিতে যাইতেছিলেন মাত্র, বাধা পাইয়া—পরম ভক্তি সহকারে মাথা নোয়াইয়া বলিলেন, "প্রণাম হই বাবাজী, যাক, রামা-শ্যামার কাছে তাড়া খেয়ে সাধুসঙ্গ হ'ল, পরম ভাগ্য।"—শেষের কথাগুলি, একটু আগাইয়া আসিয়া অপেক্ষাকৃত নিচু গলায় বলিলেন।

বাবাজী মৃদু হাসিয়া বিনয়ভাবে কহিলেন,—"কিচ্ছু না, সকলেই সাধু, সবার অন্তরেই তিনি বিরাজ করছেন, শুধু বিভিন্ন ভাবের-লীলা। তিনি লীলাময়, তিনি ভাবময়, তাঁর ভাবের কি অন্ত আছে? অনুরাগ, বিরাগ...."

বৃদ্ধের এসব তত্ত্বকথার দিকে তেমন কান ছিল না, ভাবিতেছিলেন —এমন বেয়াড়ারকম সমদর্শী লোকের কাছে কি করিয়া বেহাই বাড়ির কুৎসাটা উপস্থিত করিবেন। বলিলেন, "ঠিক ঠিক, একা রাগই একশ রকম পড়ে রয়েছে!....রাধে গোবিন্দ....তা' বৈকি,—সবাই হ'ল শ্রীকৃষ্ণের জীব, তাঁর লীলার আধার....হ্যাঁ শ্রীকৃষ্ণের জীবের কথায় আমার বেহাই বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল, সেইখান থেকেই আসা হচ্ছে কিনা,—মশায়, আহা-হা-হা, হাড় জিরজিরে দু'টি ঘোড়া—বেহাইকে যত বলছি—বেহাই মশাই, গাড়োয়ানকে বারণ করুন—আহা শ্রীকৃষ্ণের জীব—না হয় আর একটা দিন ফেলই করলাম গাড়ি—ততই গলা বাড়িয়ে গাড়োয়ানটাকে তাগাদা দিচ্ছে—গাড়ি ফেল করলে একটি পয়সা পাবি নি; বেহাইকে ভালো মানুষ পেয়ে তোরা যে ক্রমাগতই তাঁর কাজের ক্ষেতি করাবি'....অথচ আমি সমান বলে যাচ্ছি—আর একটা দিন থেকে গেলে আমার কাজের কিচ্ছু ক্ষেতি হবে না বেহাই মশাই....চণ্ডাল! অতবড় চণ্ডাল আপনি দেখেন নি কোথাও...."

বাবাজীর মুখে সেই প্রসন্নতার ভাব। বৃদ্ধ অপ্রতিভভাবে ঝোঁক সামলাইয়া লইয়া একটু আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, "না, আপনি যে

সবার অন্তরে তাঁর বিরাজ করার কথা বললেন তা'তো অক্ষরে অক্ষরে সত্যি—লোকটা এমনি খুব সাধু, তবে ব্যাভারে চণ্ডাল। সব আগাগোড়া শুনলে আপনিও বুঝবেন। তা'হলে ছেলের বিয়ের কথাবার্তার সুরু থেকে সব কথা আপনাকে ব'লতে হ'ল।....দাঁড়ান তবে হয়ে আসি একবার—বহুমূত্র রোগ আছে কিনা....রাধেশ্যাম, গোবিন্দ বল....এই গায়ের কাপড়টা দয়া ক'রে একটু...."

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি রয়েছি, কোন ভয় নেই, যান্।"

বাঙ্কের বাক্স ধরিয়া ধরিয়া টলিতে টলিতে চলিলেন। ল্যাভেটারির দরজাটি খুলিতে যাইবেন, বামদিকে দেয়ালে-আঁটা চৌকা একখানি নীল ফলকের উপর দৃষ্টি পড়িল ; বিদ্যুতের আলো পড়িয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছে। দরজার ছিটকিনিতে হাত রাখিয়া, চোখ কুঁচকাইয়া বিড়-বিড় করিয়া বলিলেন, "খেলে কচুপোড়া ! আবার কি বলে ? এর জন্যে আবার আলাদা পয়সা নেবে নাকি ! আগে তো এসব ছিল না !—কি ব'লছে ?—

'নিজে টিকিট কেনো....'

"হ্যাঁ, তা'হলেই হয়েছিল আর কি ! বেহাই অমন ঝানু সহুরে, তার পকেট থেকেই দেড়টা টাকা বেমালুম সরিয়ে নিলে—গেঁয়োই হও, আর সহুরেই হও ; আঁৎঘাৎ জানো, আর নাই জানো—নিজে টিকিট কেনো....তোর উপদেশের নিকুচি ক'রেছে।"

দরজাটা খুলিয়া ভিতরে একটা পা দিলেন, তাহার পর কি ভাবিয়া আবার পাটা টানিয়া লইয়া পড়িলেন—'মালের উপর নজর রাখ'....তা মন্দ কথা নয়....'জুয়াচ্চোর, চোর ও পকেটমার নিকটেই আছে।'

"আমর !!" বলিয়া বৃদ্ধ একরকম হতভম্ব হইয়া পা'টা টানিয়া লইয়াই সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। হাতটা যেন নিজে নিজেই ঘুরিয়া

দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। একবার সমস্ত গাড়িটা দেখিয়া লইলেন। ফলকের কথা-কয়টি একটা মস্ত বড় রহস্যের টীকা-টিপ্পনী করিয়া দিয়া,

একখানি নীল ফলকের উপর দৃষ্টি পড়িল

তাহার কাছে সেটাকে একেবারে পরিষ্কার করিয়া দিল—ও! তাই সব কথাবার্তা বন্ধ করিয়া যে যাহার নিজের নিজের সামলাইয়া বসিয়া আছে!

তাই সে মুসলমান বেচারি হন্যে কুকুরের মতো ক্রমাগত এক গাড়ি হইতে অন্য গাড়ি করিয়া বেড়াইতেছে।—তাই ভক্ত-বিটেল সাজিয়া, তিলক কাটিয়া, ভাব করিয়া অত তত্ত্ব বুঝাইবার ধুম !—বটে-রে !

তাড়াতাড়ি ফিরিলেন। সেখান থেকে একরকম চোখ-মুখ খিঁচাইয়া বাবাজীর দিকে চাহিতে চাহিতে মনে মনে বলিলেন, 'যান, আমি রয়েছি, কোন ভয় নেই'....ওরে আমার সাতপুরুষের গুরঠাউর ! উনি রয়েছেন !

আর এই ছিষ্টিছাড়া কোম্পানীর লোকদেরই বা আক্কেলখানা কি ?.... 'চোর পকেটমার সব নিকটেই রহিয়াছে'—কেতাত্ত হলাম,—তাঁদের ত্রিভুবনময় যেন খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, খবর দিলেন—'তাঁরা সব সভা-আলো ক'রে নিকটেই আছেন। আপনাদের যথা-সবস্ব তাঁদের সেবায় দিয়ে চরিতার্থ হন।

"নিকটেই আছে তো পাকড়াও কর্ না রে বাপু....ঢং একটা !"

এক আধজন প্রশ্ন করিল, "ফিরলেন যে ?—কৈ ভেতরে তো কেউ যায় নি।"

জায়গার কাছে আসিতে বাবাজী একটু অধিকতর বিস্মিত হইয়া প্রশ্নটা করিলেন। বৃদ্ধ উত্তর করিলেন না ; মনে মনে বলিলেন, 'তাই তো, আপনি ভারি বদ লোক তো ! আমি এত আশা করে রয়েছি, প্রায় আপনার মুণ্ডুপাত ক'রেছিলাম, আর আপনি কিনা ফিরে এলেন ! ....বাবাজী না ওর গুষ্টির শ্রাদ্ধ !'

র‍্যাপারটা কাঁধে তুলিয়া লইলেন। উপর হইতে ব্যাগ, পোঁটলা আর খাবারের চাঙারি নামাইয়া নিচে রাখিলেন। ব্যাগের ডালাটা একবার বেশ করিয়া টানিয়া দেখিয়া লইলেন, অতঃপর গুছাইয়া-সুছাইয়া বসিয়া সমস্তগুলি একে একে কোলের উপর তুলিয়া লইয়া বোধ হয়

বৈষ্ণব বাবাজীর সহিত প্রীতি-ভঙ্গের নোটীশ স্বরূপ বলিলেন, “কালীতারা—কালীতারা বলো মন।”

বাবাজী বেচারি এক বিষম ধাঁধায় পড়িয়া গিয়াছেন। দৃষ্টিশক্তি একটু কম বলিয়া বিজ্ঞাপনটি তাঁহার চোখে পড়ে নাই; তাই তিনি ঠিক যে বিশ্বপ্রেমিক বৈষ্ণবটি গাড়িতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহাই বজায় আছেন। কিন্তু ব্যাপারখানা কি? গাড়ির যেন ভাবই আলাদা! একটা মানুষ তবু যদি পাওয়া গেল, গাড়িতে একরকম পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহারও এই রূপান্তর! যাক, সবই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা।

একবার জিজ্ঞাসা না করিয়া পারিলেন না…“মশাই বুঝি তা’হলে এইখানেই নেমে যাবেন?”

বৃদ্ধ উত্তরে একটি বক্র দৃষ্টি হানিলেন মাত্র। মনে মনে বলিলেন, “তাইতো গা!—আমি কোথায় আশা করে আছি—লম্বা শফরের মধ্যে একবার না একবার দাও পাবই, আর তুমি কিনা নেমে পড়ে রসভঙ্গ করে দিতে চাচ্ছ!….রসিক আমার, নাকে রসকলি চড়িয়েছেন!”

—সমস্ত অবস্থাটি পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন—সব বেটা চোর। সে বেটা গলাবাজি করিয়া সাধুগিরি ফলাইয়া নামিয়া গেল—মস্ত বড় পীর! আসলে এখানে আর সুবিধা হইল না; গাড়ি গাড়ি রোঁদ দিয়া বেড়াইতেছেন—যেখানে কপাল খুলিয়া যায়। এরা সবাই চিনিয়া ফেলিয়াছে কিনা।….আর কে কাহাকেই বা চিনিবে?….পাশের ইনিই যে মালের গন্ধমাদন ঘাড়ে করিয়া উর্দ্ধমুখ হইয়া বসিয়া আছেন—ওর মধ্যে তাঁহার নিজের ক’টা কে জানে?

উর্দ্ধমুখ লোকটি ওদিকে অনেক কষ্টে একটা প্রলোভন দমন করিয়া বসিয়া আছে, বুঝি আর রাখা যায় না। ইচ্ছা হইতেছে—দিই অতর্কিতে

বেটা—বুড়োর দাড়ি ধরিয়া একটা টান— তাহা হইলেই ব্যস, ছদ্মবেশ বাহির হইয়া পড়ে।

কেনা দাড়ি যে তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই, শুধু সাহসে কুলাইয়া উঠিতেছে না। এরা সব মরিয়া লোক, ধাঁ করিয়া ছুরি বসাইয়া দিতে দেরি লাগে না।—তারপর চেন টানিয়া গাড়ি থামাইয়া অন্তর্ধান। প্রায়ই তো এই রকম শোনা যাইতেছে।

এককথায় এদিকে গাড়ির পনের আনা লোকেরই এই চিন্তা, এই ধারণা অর্থাৎ সমস্ত গাড়িতে মাত্র একজন সাধু····সে নিজে; বাকি সব হয় চোর, নয় জুয়াচোর, নয় পকেটমার। কোম্পানী কিছু একটা আন্দাজ না পাইলে কি অমন করিয়া লিখিতে পারে?

সময় বড় অশান্তিতেই কাটিতেছে।

[৪]

গাড়ি যখন বদরগঞ্জ স্টেশন ছাড়িল চলন্ত গাড়িতেই দুইজন লোক টপ করিয়া পা-দানির উপর লাফাইয়া পড়িল। দরজার কাছের দুইজন লোক হৈ হৈ করিয়া দরজা চাপিয়া ধরিতে যাইতেছিল আগন্তুকদের মধ্যে সামনেরটি পকেট হইতে কি একটা চোখের সামনে ধরিতেই তাহারা দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণ না করিয়া নিজের নিজের জায়গায় বসিয়া পড়িল। যাহারা ব্যাপারটি বুঝিল না, তাহারা তীব্র উৎকণ্ঠায় নবাগতদ্বয়ের দিকে চাহিয়া রহিল।

লোক দুইটি দরজা খুলিয়া গাড়ির মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল এবং চারিদিকটা ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সামনের লোকটি যে পরোয়ানাটির জোরে প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছিল তাহা এতক্ষণ

মুঠার মধ্যেই মুড়িয়া সুড়িয়া ধরিয়াছিল, পকেটের মধ্যে অন্যমনস্কভাবে প্রবেশ করাইতে যাইতেই সেটা নিচে পড়িয়া গেল। লোকটা সন্ত্রস্তভাবে তাড়াতাড়ি কুড়াইয়া লইয়া পকেটে পুরিয়া ফেলিল; কিন্তু কড়া বিদ্যুতের আলোকে সকলেই দেখিয়া লইল যে সেটা ঝকঝকে বোতাম আটা খাকী রঙের একটা মোড়া টুপি।

—বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সাধারণ বেশ। পায়ে একজোড়া হাফ-সু, গায়ে কামিজের ওপর একটা এণ্ডির কোট; সব পকেটগুলাই ভারী ভারী। চেহারাটাও বেশ ভারিক্কে গোছের, বয়স চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের মধ্যে। হাতে একটি ছোট সুটকেস। সঙ্গের লোকটি পশ্চিমা। বাম বগলে একটা পোঁটলা, হাতে কাঠের ফ্রেমে জলের কুজা ঝুলিতেছে; এইভাবেই, একহাতে হ্যাণ্ডেল ধরিয়া গাড়িতে উঠিয়াছে। বাবুর চাকর—সহজেই বোঝা যায়।

গোপনের চেষ্টা সত্ত্বেও কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না যে, আগন্তুকদ্বয় দারোগা ও পুলিশ, কোন গূঢ় উদ্দেশ্যে বহ্নি নিজেকে ভস্মের আবরণে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। বেশ একটা কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল।—

"আসুন, আসুন; এইখানটায় জায়গা রয়েছে।"

"মশাই বরঞ্চ এইখানটায় আসুন, কম্বলের ওপর।"

"এই যে আমি ট্রাঙ্কটা উঠিয়ে রাখছি,—দু'জনকারই জায়গা হবে।"

"কেন কষ্ট ক'রে অত ভেতরের দিকে যাবেন? আপনি বরং এইখানটা,—বৈষ্ণব বাবাজী আর আমার মাঝখানে ব'সে পড়ুন।.... বাবাজী পরম সাধক লোক, তখন থেকে আলাপ ক'রে বুঝলাম কিনা.... আর সিং-জি, তুমি আমার এ-পাশটায় এসে বসো বাবা। কতদূর যাওয়া হবে মশাইদের?"—বলিয়া বৃদ্ধ বোধ হয় ভদ্রলোকটিকে ধরিয়া বসাইবার আগ্রহেই হাত বাড়াইলেন।

"আহা-হা, বৃদ্ধমানুষ আপনি কষ্ট করেন কেন?—বেশ, আমি বসছি, বসছি। হাঃ-হা-হা, ও-বেটার চেহারাটা দেখে সবাই ভুল করে;—কোন সিং টিং নয়—জেতে কুর্মি। আমি এই এইখানটায় বসি বরং; হোটেল থেকে একপেট পাঁঠা গিলে এলাম, বাবাজীর আর জাত মারব না, হাঃ, হাঃ হাঃ। বুধন, তুম্ উস্ কোণাপর বৈঠো····হাঁ ঠিক।"

নিজে বৃদ্ধ আর মোটা লোকটির মাঝখানে বসিলেন। বসিয়া একটু নিচু গলায় বলিলেন, "ছোট জাত, ও বেটারা একটু দূরে থাকে সেই ভালো; দাদ, চুলকানি তো বেটাদের অঙ্গের ভূষণ। এবিষয়ে আমি মশাই আমাদের গান্ধীজির সঙ্গে একমত হ'তে পারলাম না; আপনারা রাগ করেন তো নাচার।····হ্যাঁ, কোথায় যাওয়া হবে আপনাদের?"

মাথা ঘুরাইয়া পর পর তু'পাশে তুজনের পানেই চাহিলেন।

বৃদ্ধ বলিলেন, "আমি নাব্‌ব ডালিমগাঁও।"

"আর মশাই?"

মোটা সোটা লোকটি বলিল, "আমি যাব বড়চক; কিশেনগঞ্জ লাইনে সুধাসি ইস্টিশান থেকে নেমে যেতে হবে।"

"ওঃ আপনার পৌছুতে সেই যার নাম বেলা দশটা; তাও যদি বরাৎ জোরে ট্যাক্সি পাওয়া যায়।"

"আপনার ওদিকে যাওয়া আছে নাকি?"

"শুধু ওদিকে কেন? এই লাগোয়া কটা জেলার সব বড় বড় বাজার-হাটেই বছরে তু'একবার করে ঢু মারতে হয়। দিনাজপুরে সামান্য একটু আড়ৎ আছে কিনা। অধীনের নাম বনমালী কুণ্ডু।—আর ব্যবসাতেও সুখ নেই মশাই, বাবার মুখে গল্প শোনা গেছে—"

হঠাৎ সামনের বেঞ্চির ও-কোণের দিকে চাহিয়া হাঁকিলেন, "বুধন!" সে চাহিতেই চোখের কড়া চাহনির দ্বারা একটা ইসারা করিলেন।

সতর্কতা সত্ত্বেও সকলেই দেখিল বুধন অপরাধীর মত পোঁটলা হইতে অর্ধেক বাহির হইয়া পড়া, বেল্টশুদ্ধ একটা চাপরাশ তাড়াতাড়ি ভিতরে পুরিয়া ফেলিল। বনমালী কুণ্ডু দাঁতে দাঁতে চাপিয়া অস্ফুটস্বরে নিজের মনেই বলিলেন, "বেটা অসাবধান কোথাকার!"

একটু একটু করিয়া নানারকম গল্প জমিয়া উঠিল—গান্ধীজী, এবারের ম্যালেরিয়া, পাটের অবস্থা, রাধারাণী অপহরণের মামলা। এতক্ষণ পরস্পরের প্রতি বৈরীভাব লইয়া যাহারা দম আটকাইয়া মরিতেছিল, তাহারা সবাই নিজের নিজের অভিজ্ঞতা মত আলোচনায় যোগদান করিল, গাড়ির মধ্যকার অস্বাভাবিক স্তব্ধতার ভাবটা কাটিয়া গেল। কথাবার্তার মধ্যেই বনমালীবাবু একবার কয়েকজনের কোলের দিকে চাহিয়া একটু আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা, আমি একটা বিষয় বুঝতে পারছি না—যদি কিছু মনে না করেন তো বলি—সবার কোলে একরাশ করে পোঁটলাপুঁটলি কেন?"

ছলনা!—বৃদ্ধ একটু হাসিয়া বলিলেন, "না, আপনি আর বুঝবেন কোথা থেকে?"

বনমালী বাবু তবুও বিস্মিতভাবে হাঁ করিয়া রহিলেন। মোটা লোকটি বলিলেন, "জোচ্চোর, পকেটমার, এদের অত্যাচার পড়ে গেছে মশাই, জিনিসপত্র আর হাতছাড়া করে রাখতে সাহস হয় না, কত ভেখ ধরে কত লোক যে ওৎ পেতে বসে আছে। এই ধরুন না আমারই কথা, দাড়িগোঁফ কামান লোকটি, পরিচয় পেলেন,—নাম এই—পেশা এই—পরের ইস্টিশনে নেমে একমুখ দাঁড়ি গোঁফ চড়িয়ে যেন মহর্ষি বাল্মীকি হ'য়ে...."

বৃদ্ধের দিকে একটা কটাক্ষ হানিলেন। বৃদ্ধ কথাটা কাড়িয়া লইয়া বনমালী বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন "ঠিক তো—কিম্বা ধরুন এই আমি

বুড়ো লোক, এক মুখ দাড়ি গোঁফ রয়েছে,—পরের ইস্টিশনে নেমে গিয়ে, দাড়ি গোঁফ চেঁচে ফেলে দিয়ে টোলের ন্যায়রত্ন মশাই হ'য়ে—"

মোটা লোকটির উপর একটি মর্মান্তিক প্রতিকটাক্ষ বর্ষণ করিলেন।

আপনি মহর্ষি বাল্মীকি কাকে বললেন মশাই ?

"আপনি ন্যায়রত্ন কাকে বললেন মশাই ?"

"আপনি মহর্ষি বাল্মীকি কাকে বললেন মশাই ?"

বনমালীবাবু দু'দিকে হাত দিয়া থামাইয়া দিলেন—"হয়েছে, হয়েছে। ও, বুঝেছি ব্যাপারটা, তাই বুঝি আপনারা সব গেরস্থালি ঘাড়ে করে বসে আছেন?—হাঃ—হাঃ—হাঃ—বেশ, বেশ, যত সাবধানে থাকা যায়, ততই মঙ্গল, কিন্তু এই ভাবে কতক্ষণ—"

"না, আর এখন অত সাবধান হওয়ার দরকারও নেই"—বলিয়া বৃদ্ধ কোলের বোঝাগুলি আস্তে আস্তে নিচে নামাইয়া রাখিলেন, তাহারপর উঠিয়া, সেগুলি একে একে বাক্সের উপর উঠাইয়া রাখিয়া আবার যথাস্থানে বসিয়া পড়িলেন। আরও কয়েকজন নিজের নিজের কোল আজাড় করিয়া বসিল। বৃদ্ধ আস্তে আস্তে বলিলেন, "আঃ বাঁচা গেল; ভাগ্যিস্ মশাই এসেছিলেন।"

বনমালীবাবু ছলনা-সূচক একটি হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, "কেন, আমি আসাতে আবার কি হ'ল? সামান্য একটা আড়ৎদার...."

বৃদ্ধ বিজ্ঞতাসূচক একটা হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, "ঠিক তো, সামান্য একটা আড়ৎদার....মশাই মরতে চললাম, আর লোক চিনি না? হ্যাঁ চিনতে পারিনি শুধু এক রংপুরের মাধব চৌধুরীকে। বেটা চামার, মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে ভুলিয়ে মেয়েটিকে গছিয়ে দিলে, এখন পস্তাচ্ছি। তা আমারও বিশেষ দোষ ছিল না।....তার কথা যদি উঠলই আপনি হ'তে তো গোড়া থেকে আপনাকে...."

মোটা লোকটি বনমালীবাবুর পাশে একটু ঝুঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা কোন্ থানার সংলগ্ন আছেন মশাই? আর যদি কিছু মনে না করেন তো...."

বনমালীবাবু আস্তে আস্তে তর্জনীটি ঠোঁটের উপর রাখিয়া দুইদিকেই চাহিয়া দুইজনকে চুপ করিতে ইসারা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলায় বলিলেন—"শুনুন।"

দুইজনেই দুই দিক থেকে মাথা সরাইয়া আনিলে ধীরে ধীরে বলিলেন, "যখন জেনেই গেছেন, তখন আর উপায় নেই ; আর আপনাদের দ্বারা একটু সাহায্যও হতে পারে—হ্যাঁ, দারোগাই, গভর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিস,—বনমালী কুণ্ডু নয়, হিমাংশুশেখর দত্ত ; বুধন কুর্মি নয়, মহাবীর চৌবে,—ওর পুঁটুলির মধ্যে দু'জনের স্বরূপ। যাঁর পেছু নিয়েছি তিনি এই গাড়িতেই বিরাজমান ; কিন্তু এখন স্রেফ অন্য কথা ; বুঝলেন তো ?"

বৈষ্ণববাবাজী এ গাড়ির লোকের সহিত আর আলাপ করার খেয়ালই তুলিয়া দিয়া গাড়ির জানালায় মাথা দিয়া ঘুমাইতেছিলেন। বৃদ্ধ দারোগাবাবুর দিকে একটু ঘেঁসিয়া বসিয়া, ডান চোখের ডান কোনাটা টিপিয়া প্রশ্ন করিলেন, "ইনি নাকি ?"

"আর বেশি বলা ডিপার্টমেণ্টের নিষেধ"—ফিস্ ফিস্ করিয়া এইটুকু বলিয়া হিমাংশুবাবু মুখ তুলিলেন। সকলে কৌতূহলপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া আছে। ব্যাপারটাকে তাড়াতাড়ি চাপা দিবার জন্য একজনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিয়া সহজ গলায় বলিলেন, "তা আমি বললাম বলে আপনারা সবাই যথাসর্বস্ব সব আলাদা করে বাঙ্কের উপর রেখে থুলেন ? না, এটাও আবার ঠিক নয়। মশায়, আমার সব জিনিস ঐ বেটার কাছে, বলতে নেই,—অতি বিশ্বাসী লোক, আজ এগার বছর সঙ্গে রয়েছে, আড়তের সকল জিনিসই ওর হাতে ; কিন্তু এই যে দেখছেন ছোট্ট সুটকেসটি এটি প্রাণ থাকতে হাতছাড়া করি না ; যেহেতু আড়ৎসংক্রান্ত আসল জিনিস সব এইতে। কে জানে মশাই ?—পৃথিবীর লোককে মেলা বিশ্বাস করতে নেই,—বেটা শেষ পর্যন্ত একটা মক্ষম ঘা দেবার জন্যে বিশ্বাস জমাচ্ছে কি না, তাই বা কে বলতে পারে।

পরিচয়টা প্রায় মুখে মুখে সকলের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। ট্রাঙ্ক, ব্যাগ, পোঁটলা প্রভৃতি খুলিয়া কেহ একটা মানিব্যাগ, কেহ কাপড়ে

বাঁধা ছোট্ট একটি পুঁটুলি, কেহ হয়তো মকদ্দমার নথিপত্র—যাহার যেরূপ মূল্যবান দ্রব্য সঙ্গে ছিল, কাছে লইয়া বসিল। হিমাংশুবাবু বলিলেন,—"এই ঠিক করেছেন। কি জানেন?—বিছানা বাক্স মাথায় করে বসে থাকাটা যেমন বোকামি, আবার সবচেয়ে দামী জিনিস-পত্র কাছছাড়া রাখাও তেমনি বোকামি—বরং বেশি। চোর জুয়াচ্চোরের কথা ছেড়ে দিন, ধরুন যদি হঠাৎ একটা কলিশনই হ'ল। যদি বা দৈবক্রমে, কোন গতিকে বেঁচে গেলেন তো টাকা-কড়ি, গয়না-পত্র, দলিল-দস্তাবেজ, মানে সবচেয়ে দামী যা সেগুলো তো...."

বৃদ্ধ কি ভাবিয়া এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন, তাড়াতাড়ি উঠিয়া ক্যাম্বিসের ব্যাগের তালাটা খুলিয়া আন্দাজ আধহাত লম্বা, ডালার ওপর আংটা আঁটা একটা টিনের বাক্স বাহির করিলেন। বাক্সটি হিমাংশু-বাবুকে ধরিতে অনুরোধ করিয়া সযত্নে ব্যাগের ডালা আঁটিয়া বসিলেন। হিমাংশুবাবু বাক্সটি ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন—"ঠিক করেছেন, ডান হাতে নিয়ে বসুন, বেশ সাবধান হয়ে।"

ডানদিকে বৈষ্ণব বাবাজী। বৃদ্ধ বলিলেন, "না, না, বাঁ হাতে নিয়েই বসি। বাঁ হাতটা ভুলো হাত, এই তো? তা আপনি রয়েছেন, কোন ভয় নেই।"

হিমাংশুবাবু অল্প একটু হাসিয়া চুপ করিয়া কি একটু ভাবিলেন; বেশ বোঝা গেল অসহায় বৃদ্ধের এই অতিরিক্ত নির্ভরশীলতায় তাঁহার মনটাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়াছে। একটু থামিয়া মুখটা সরাইয়া আনিয়া বলিলেন—"দেখুন, আমি রয়েছি বটে, কিন্তু যার উপর লক্ষ্য তাকে নিয়ে শীগ্‌গিরই নেমে যাব, তখন? আর একটা গেলেই যে গাড়ি নিষ্কণ্টক হোল এমন নয় তো? বুড়ো মানুষ, ভালো করেন নি রাত্তিরে অত গয়না-গাঁটি নিয়ে একা বেরিয়ে।"

বৃদ্ধ একটু খিঁচাইয়া উঠিলেন—"অত কোথায় পাব মশাই? যা বেল্লিকের সঙ্গে কুটুম্বিতে করেছি, অত দেবার পাত্র কিনা। তবে নেহাৎ ছোটলোকের সঙ্গে ছোটলোক হ'য়ে ভরি দু'এক বের করেছি, এই যা! সে চামাড়ের কথা যদি উঠলই তো...."

[৪]

এই সময় গাড়িটি আসিয়া একটি স্টেশনে দাঁড়াইল। হিমাংশুবাবু আস্তে আস্তে বলিলেন—"আমি এক্ষুনি আসছি, এসে শুনছি সব কথা। এইখান থেকে হেড্‌কোয়ার্টারে একটা টেলিফোন করে দিতে হবে।" গলা নামাইয়া বলিলেন—"বাবাজীর ওপর একটু নজর রাখবেন, আমি এলাম বলে। যদি তেমন বোঝেন মহাবীরকে দিয়ে আটকে রাখবেন।"

স্টেশন ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। টুপিটা হাতে লইয়া স্টেশন মাষ্টারের সঙ্গে কথা কহিয়া টেলিফোনের দিকে চলিয়া গেলেন। তাহার পর প্রায় গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন—"বেহাইয়ের কথা আমায় আর বলবেন কি—আমি নিজেই ভুগছি। মশাই, নরম ধাতের ভালো মানুষ দারোগা বলে আমার মোটেই বদনাম নেই, কিন্তু ঐ একটি জীবকে আমি এখন পর্যন্ত শায়েস্তা করতে পারলাম না। আমারও প্রথম ছেলেটির বিয়ে আর বছর দিলাম কিনা।"

একে এমন শ্রোতা, তায় ভুক্তভোগী, বৃদ্ধ আর ধৈর্য ধরিতে পারিলেন না, বলিলেন—"কথা যদি উঠলই আপনি হতে তো একটু অপেক্ষা করুন, একবার হয়ে এসে নিশ্চিন্দি হয়ে সব বলছি। বহুমূত্রের রোগ আছে কিনা। সেই গাড়িতে উঠেছি ইস্তক—একবার গিয়েছিলুম বটে, কিন্তু...."

"তা হলে একটু থেমে যান" ঝাঁকানিতে বড্ড কষ্ট হবে, একে বুড়ো মানুষ। এই স্টেশন এল বলে। এখানে বড্ড ভীড় হয় বটে ; তা হোক আমি রয়েছি।"

গাড়ির গতিবেগ কমিয়া আসিতেছিল। বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—"তা হলে এই বাক্সটা ;—নিয়ে যাওয়া তো সুবিধা হবে না।"

হিমাংশুবাবু বলিলেন—"ব্যাগে বন্ধ করে যান ; কিম্বা এঁর কাছেই একটু রেখে যান না, সেই-ই ভালো।"—মোটা ভদ্রলোকটিকে দেখাইয়া দিলেন।

ভদ্রলোকটি ঘন ঘন মাথা নড়িয়া বলিলেন—"না, না মশাই। ও অনুরোধ করবেন না।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"বেশ তো, ওঁকে দিতেই বা আপত্তি কি? তা উনি যখন রাজি নন, আপনিই ধরুন মিনিট দু'এক ; গভর্ণমেণ্টের ট্রেজারিতে রইল মনে করব।" বলিয়া নিজের রসিকতায় একটু হাসিলেন।

গাড়ি প্ল্যাটফরমে প্রবেশ করিল। হিমাংশুবাবু হাসিয়া বলিলেন—"দিন তা হলে। শেষকালে মুসলমানদের—'আপ পহিলে চড়িয়ে তো আপ পহিলে চড়িয়ে'—করতে করতে গাড়ি ফেল হবার যোগাড় হবে ; যান, বেশ ভালো করে দেখে শুনে বসবেন, গাড়ি এখানে দাঁড়াবে খানিকক্ষণ। হ্যাঁ, যাচ্ছেন তো ও ব্যাটা কুম্ভকর্ণের টিকিটা ধরে নেড়ে দিয়ে যাবেন তো ; ব্যাটা বেঁহুস কোথাকার!"

বৃদ্ধ চলিয়া গেলে মোটা লোকটির পানে চাহিয়া বলিলেন—"বড় ভালো লোক বেচারি ; কিন্তু আজকাল আবার বেশি ভালো হওয়াই যে....উঃ, ভাগ্যিস মনে পড়ে গেল!....মহা—ইয়ে বুধন!"

বৃদ্ধ যাইবার পথে "বুধন বাবু! বুধন বাবু!" বলিয়া একটু নাড়

দিয়া গিয়াছিলেন, সদ্যোত্থিত মহাবীর মনিবের ডাকে জড়িতকণ্ঠে উত্তর দিল—"জী হুজুর !"

"চট করে এদিকে আয় তো একবার, তোর পোঁটলা, কুঁজো থাক্, আমি দেখছি।"

মহাবীর আসিলে তাহার ঘাড়টা ধরিয়া নামাইয়া নিচু গলায় আদেশ করিলেন—"কাঠিহার গ্যাং-কেসে (gang case) এখানে বড় সাহেব আসবার কথা ছিল ; চট করে দেখে আয় তো, তাহলে একবার সেলাম বাজিয়ে আসি।"

চাপাস্বরে বলিলেও, বেশি উৎকর্ণ থাকার দরুণই হোক বা যে জন্যই হোক, অনেকেই কথাটা শুনিল।

মহাবীর গাড়ি হইতে নামিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও উঠিলেন। দুয়ারের কাছে গিয়া হাঁকিয়া বলিলেন—"স্টেশন ঘরে দেখবি, না থাকে ওয়েটিং রুমে।"

দু'পা ফিরিয়া আবার দাঁড়াইয়া বলিলেন—"নাঃ, নিজেই একবার দেখি ; ওর ঐ পোঁটলাটার আর আমার স্যুটকেসটার ওপর একটু নজর রাখবেন আপনি, আর বৃদ্ধের এইটেও।....ও ! আপনি আবার এটা রাখতে নারাজ !"

আরও দু'একজনকে অনুরোধ করিলেন, কেহই রাজি না হওয়ায় বলিলেন—"তবে থাক আমার কাছে, এখনি তো আসছি।"

কথাগুলা বলিতে বলিতেই দুয়ার পর্যন্ত গেলেন এবং সেখানে পাঁচ-সাত সেকেণ্ড একটু ইতস্ততঃ করিয়া দুয়ারের পাশের লোকটিকে ঘুমন্ত বাবাজীকে দেখাইয়া বলিলেন—"একটু নজর রাখবেন ; ওদের ঘুম যে সবদা ঘুমই তা নয়"—বলিয়া টুপ করিয়া নামিয়া গেলেন।

* * *

শরীরটি বেশ হালকা করিয়া মাঝপথ থেকেই বৃদ্ধ বেহাইয়ের গল্পের

সূত্র ধরিয়া আসিতেছেন—যত বেশি জন শোনে ততই সার্থকতা—"সাধ করে কি আর বলি—পাষণ্ড, চামার? বিয়ের কথাবার্তা কইবার সময় সে কি নিচু ভাব! —'আপনি অতি মহাশয় লোক—আপনি দেবতুল্য—আপনার....' কই, কোথায় গেলেন?"

মোটা লোকটি বলিলেন—"বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন বুঝি, এক্ষুনি আসছেন।"

বৃদ্ধ ভেতরে ভেতরে একটু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা পড়িল। বলিলেন—"আর বুধন—ই'য়ে, মহাবীর চৌবে? তাকেও দেখছি না তো!"

তাকে আগে সন্ধান নিতে পাঠালেন যে।

গাড়ি ছাড়িয়া দিল। আশা রহিল—এই বুঝি আগেকার মতো লাফাইয়া চলন্ত গাড়িতে দুইজনে উঠিয়া পড়েন। পোটলা, সুটকেস পড়িয়া রহিয়াছে—

গাড়ি প্ল্যাটফরম্ ছাড়াইয়া গেল। তখন দু'একজন প্রবোধ দিল—নিশ্চয় অন্য গাড়িতে উঠিয়াছেন, তাঁহাদের এই কাজ—

বৃদ্ধ তবুও দরজার কাছে গিয়া গলা বাড়াইয়া ডাক দিলেন—"হিমাংশুবাবু! বুধন! চৌবেজী! আমাদের গাড়ি এইখানে!"

পরের স্টেশনে সমস্ত গাড়ি তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা হইল—কোথায়ই বা দারোগা হিমাংশুশেখর, আর কোথায়ই বা কনষ্টেবল মহাবীর চৌবে? শূন্য গহ্বর, ভালো ঢাকনা দেওয়া পুরান সুটকেশটা, আর পোঁটলার মধ্যে কতকগুলা ছেঁড়া নেকড়া ও একটা নকল চাপরাস তাহাদের 'স্বরূপে'র পরিচয় দিতে লাগিল।

—এবং "কুম্ভকর্ণ" "বেহুঁস" মহাবীর চৌবের পাশে দু'টি লোকের কাটা পকেট সে পরিচয়টা আরও নিঃসন্দেহ করিয়া দিল।

জগন্নাথ

দেবতা চিন্তান্বিত হইয়া উঠিয়াছেন,—ভক্তকে বিজয়দান করিয়া স্বয়ং যে এরূপ বিপন্ন হইয়া পড়িবেন এতটা ভাবিয়া দেখেন নাই।

দেশজয় করিয়া রাজচক্রবর্তী ইষ্টদেবের দেউল রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বিরাট রাজ্যপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে বিরাট পরিকল্পনা। উন্মুক্ত সমুদ্র-সৈকতে গগনস্পর্শী প্রস্তরমন্দির উঠিবে; ক্রোশব্যাপী প্রাচীর বেষ্টিত তাহার বহিরাঙ্গন, তাহার পর অন্তর্বেষ্টনী, তাহার পর চতুষ্কোণে পার্শ্বমন্দির চতুষ্টয়, কেন্দ্রস্থলে ইষ্টদেবের সুবিশাল মূল মন্দির।

প্রথমেই বহির্বেষ্টনীর লৌহনির্মিত তোরণ, সে তোরণ অতিক্রম করিয়া অন্তর্বেষ্টনীর চন্দনকাষ্ঠ নির্মিত তোরণ, তাহার পর প্রাচীরবেষ্টিত মন্দিরের চত্বর। চত্বরটি উত্তীর্ণ করিয়া গোপুর, তাহার পর নাটমন্দির, সর্বশেষে গর্ভ-মন্দির। গর্ভমন্দিরের মধ্যস্থলে উর্ধ্বস্থাপিত মর্মর বেদী। বিজয়ী রাজার আদেশে লক্ষ লক্ষ লোক নিয়োজিত হইয়া গেল। প্রস্তর জোগাইতে দূরের একখানি পর্বত সম্পূর্ণ ভাবে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। ধীরে ধীরে দেবমন্দির উঠিয়া আকাশ স্পর্শ করিল।

রাজ্যের শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষীবৃন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার লগ্ন নির্ধারণে ব্যাপৃত; দেবতা কিন্তু শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন।

তাঁহাকে নিজের সৃষ্টি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, নিতান্ত নিজেকে মাত্র লইয়া, প্রস্তরের পর প্রস্তর স্তূপ দিয়া ঘেরা ঐ অন্ধকার বেদীর উপর উপবেশন করিয়া একইভাবে দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, যুগের পর যুগ অতিবাহিত করিতে হইবে! এই বিরাট বিশ্ব থাকিবে বাহিরে পড়িয়া, মহাকাশে আলোছায়ার মধ্য দিয়া দিবারাত্রির অভিযান চলিবে,

রূপরসাদির বিচিত্র সমন্বয়ে চলিবে ঋতু-বিবর্তন, মহাকালের নাটমঞ্চে চলিবে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের বিরাট নাট্য। তাঁহারই আনন্দ লীলা। তাঁহাকে কিন্তু স্বল্পালোকিত তোরণ পথে একইভাবে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া কাটাইতে হইবে! প্রতিদিন নিয়মিত লগ্নে একই মন্ত্রের উচ্চারণ, পুষ্পে-চন্দনে, ধূপ-ধুনায়, কাঁসর ঘণ্টা শঙ্খের নিনাদে একই পূজাবিধি, ভক্তের সেই একই আকুতি, শত শত আতুর কণ্ঠে সেই একই রূপ প্রার্থনা —রজনীর শান্তিটুকুও আগামী দিবসের দুঃস্বপ্নে থাকিবে আচ্ছন্ন হইয়া!—পরিণতি কল্পনা করিয়া দেবতা শঙ্কান্বিত হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু উপায় নাই, দেবতা যে ভক্তাধীন। ভক্তের ইচ্ছার কাছে তাঁহার নিজের ইচ্ছা যে নিতান্তই শক্তিহীন; এইখানে দেবতা যে নিজের সৃষ্টির কাছে পরাভূত।

অবশেষে নিরুপায় ভাবে একদিন তিনি ভক্তেরই দ্বারস্থ হইলেন।

প্রতিষ্ঠাদিবস ধার্য হইয়া গিয়াছে। মহাযজ্ঞের আয়োজনে সমস্ত রাজ্যে চাঞ্চল্য পড়িয়া গিয়াছে। রাজধানী উৎসবমুখর। জীবনের পুণ্যতম সঙ্কল্প সিদ্ধ হইতে চলিয়াছে. সম্রাটের চিত্তে আনন্দের পরিসীমা নাই, এমন সময় একদিন ইষ্টদেব স্বপ্নে দেখা দিলেন।

অদ্ভুত স্বপ্ন,—তাঁহাকে যেন আর চেনাই যায় না! দেবতার করযুগল শৃঙ্খলিত, যুদ্ধাবসানে যে-কোন বন্দীর মতোই তিনি নিষ্প্রভ। যজ্ঞের সূচনাতেই এই অশুভ দৃশ্যে সম্রাট শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। যজ্ঞায়োজন স্থগিত রাখিবার আদেশ দিয়া প্রধান মন্ত্রী এবং অন্যান্য অমাত্যগণকে মন্ত্রণাগৃহে আহ্বান করিলেন। স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া সকলে বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। বহু তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল ইষ্টদেবের বন্দীরূপ পরিগ্রহ কল্যাণেরই সূচনা। দেবতা চিরদিনই ভক্তের প্রেমে আবদ্ধ,

সম্রাটের সঙ্কল্পসিদ্ধির অব্যবহিত পূর্বেই ইষ্টদেবের এই রূপে আবির্ভাব হইবার অর্থই এই যে তিনি চিরতরে ভক্তের প্রেমাধীন হইয়া রহিলেন। নরলীলায় একদিন মাতার হাতের বাঁধন স্বীকার করিয়াছিলেন তো ইনিই।

আবার আদেশ প্রচার হইল যজ্ঞানুষ্ঠানের ; নিরুদ্ধ কর্মস্রোত আবার দ্বিগুণবেগে প্রবাহিত হইল।

রজনীতে সম্রাট আবার স্বপ্ন দেখিলেন,—বন্দীদশাপ্রাপ্ত ইষ্টদেব আরও নিষ্প্রভ, তাঁহার চক্ষের দৃষ্টি আরও আর্ত, আরও করুণ।....

প্রভাতে যজ্ঞায়োজন বন্ধ রাখিবার আদেশ দিয়া সম্রাট রাজ্যের শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষীবর্গকে আহ্বান করাইলেন। বহু তর্ক বিতর্কের পর তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই হইল যে স্বপ্নের মধ্যে বিরাট শুভেরই ইংগিত রহিয়াছে, অকল্যাণের লেশমাত্রেরও দ্যোতনা নাই। বিশ্বরাজের বন্দীরূপ পরিগ্রহের একই অর্থ হয়, তাহা এই যে সমস্ত জগৎকেই সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে। যজ্ঞসমাধানের পরই সম্রাট তাঁহার সেই বিরাটতম বিজয়াভিযানের জন্য যেন প্রস্তুত হন। ইষ্টদেবের আশিস তাঁহার জন্য উদ্যত হইয়া রহিয়াছে।

আয়োজন আবার বিপুলতর উদ্যমে আরম্ভ হইয়া গেল।

প্রতিষ্ঠার লগ্ন একেবারে সমাগত—মাঝখানে মাত্র একটি দিবসের অবকাশ। সেই রাত্রে দেবতা যে অবস্থায় দেখা দিলেন—তাহা একেবারেই কল্পনাতীত। শৃঙ্খলে শৃঙ্খলে সমস্তদেহ লুপ্তপ্রায় ; দৃষ্টি বোধ হয় অশ্রুর উদ্গমেই ভূমিলগ্ন।

এবার আহূত হইলেন কবি।

বলিলেন—"মহারাজ, ইষ্টদেব আপনার সত্যই বন্ধনভয়াত ; বন্দী অবস্থায় সাক্ষাৎদান প্রহেলিকা মাত্র নয়, ওর অর্থ দিনের আলোর মতোই

স্পষ্ট। যিনি বিশ্বনাথ তিনি নিজের রচিত এই বিশ্বে চিরমুক্ত, শুধু তাই নয়, তাঁর মুক্তি এই বিশ্বের গণ্ডিও অতিক্রম করে, তিনি দেশকালাতীত, কোন সীমার বন্ধনীর মধ্যে তাঁর শাশ্বত রূপ ধরা পড়ে না, তাঁর লীলার সমাধান হয় না....কিন্তু মানুষের সে-রূপ ধারণাতীত, দেবতাকে গ্রহণ করতে হলেই তাকে তার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে নিয়ে গ্রহণ করতে হবে। তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে ইট-প্রস্তরের মন্দিরের মধ্যেই বিগ্রহরূপে সঙ্কুচিত করে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ভক্ত আর ভক্তাধীন উভয়েই এই অদৃষ্ট-সূত্রে আবদ্ধ, এ থেকে কারুরই মুক্তি নেই। আমি জানি না, ইতর কেউ দেব প্রতিষ্ঠা করতে গেলে দেবতা এরূপ আচরণ করতেন কিনা; কিন্তু আপনি মনীষী, মহাপ্রাণ, বিরাট পুরুষ; আপনার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার মধ্যে, আপনার পূজার মধ্যে তিনি নিশ্চয়ই চান একটা বিরাট মুক্তির সুর। ঠিক যে কি চান তা মানুষের বোধা-তীত, তবুও আপনি নূতন ভাবে ওঁর পূজা করুন, যাতে শুধু এইটুকুই না সত্য হয়ে ওঠে যে আপনি পূজার নামে দেবতাকে প্রস্তর প্রাচীরের মধ্যে নিরুদ্ধ করে রাখলেন। আর কিছু না হোক ওঁকে আপনি মানুষের সঙ্গে এক করে দিন—মানুষের ক্ষুদ্র অদৃষ্ট, তার জন্মমৃত্যু, সুখদুঃখের প্রতিঘাতে তার প্রতিদিনের হাসিঅশ্রু, তার আশাআশঙ্কা, তার মিলনবিরহ—সহস্র অনুভূতি দিয়ে গড়া তার বিচিত্র জীবন যেন তার দেবতায় প্রতিবিম্বিত হয়। উনি এই কামনা ক'রেই একদিন নরদেহ পরিগ্রহ করেছিলেন। বিগ্রহ শরীরেও উনি এই মুক্তির পূজা পান, এই বোধ হয় ওঁর অভি-প্রেত। আপনার ইষ্টদেবের জন্য সর্ববিধ আচারমুক্ত এক নূতন পূজার প্রবর্তন করে আপনি তাঁর অভিষ্ট সিদ্ধ করুন। এই জন্যেই তিনি উত্তরোত্তর অধিকতর দীনবেশে আপনার কাছে উপস্থিত হয়েছেন।"

*   *   *   *

লক্ষ মানুষের চলার পথে লক্ষ লক্ষ নরনারীতেই দেবতার রথ টানিয়া মন্দির তোরণে উপস্থিত করিল--ব্রাহ্মণ, শূদ্র, চণ্ডাল, আর্য, অনার্য কিছুরই প্রভেদ নাই। আচার-শূন্য পূজা,—পুষ্প নাই, অর্ঘ নাই, মন্ত্র নাই, —শুধু লক্ষ লক্ষ ভক্ত প্রাণের আবেগময় প্রবাহ, সামনের ঐ মহাসমুদ্রে যেমন লক্ষ লক্ষ জলধারা উচ্ছল আবেগে আসিয়া মিশিয়া যাইতেছে। দেবতা একক নয়, দেব-সভাসীনও নয়, মানুষের মতোই পরিজন বেষ্টিত। মানুষ কি তাঁহার পূজা করে, না, তাঁহার মধ্যে পায় এক পরমাত্মীয়কে? —মানুষেরই রূপ, কিন্তু সমস্ত তুচ্ছতারই বহু ঊর্ধ্বে বলিয়া মানুষ হইয়াও আবার দেবতা।

সবার রূপকেই তিনি নিজের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া স্বয়ং তিনি রূপহীন।

আরও কাছের তিনি—মানুষের যা সবচেয়ে দূরদৃষ্ট তিনি তাহাকেও নিজের সত্তার মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন। —তিনি মৃত্যুর অধীন। তাঁর বিগ্রহ কালবিজয়ী পাষাণে নির্মিত নয়। দারু-মূর্তি,—প্রতি দ্বাদশ বৎসর দেবতার কলেবর পরিবর্তন হয়, আবার নূতন কলেবরে নূতন করিয়া হয় প্রাণ-প্রতিষ্ঠা।

ময়ূর পুচ্ছের নূতন কাহিনী

গাড়িতে ভীষণ ভিড় ছিল। গার্ডের গাড়ির পর থেকে ইঞ্জিনের আগে পর্যন্ত সমস্ত গাড়িগুলায় চেষ্টা করিলাম—কোনখানে পশ্চিমার পাল দাঁতমুখ খিঁচাইয়া রুখিয়া আসিল, কোনখানে কাবুলীওয়ালা দরজার হাতল ধরিয়া উল্টা দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল, কোনখানে বাঙ্গালীবাবু ইংরাজী ও বাঙলায় রেলওয়ে আইন কানুন সম্বন্ধে একটু শিক্ষা দিয়া বিদায় করিল।

ইউরোপিয়ান গার্ডে জায়গা ছিল।—মাত্র একটি পাদ্রী ও গোঁয়ার-গোবিন্দ গোছের তাহার একটা ক্রিশ্চান কাফ্রী সহকারী বসিয়াছিল। আমি দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। পাদ্রীটি ধর্ম্ম বিষয়ে বেশ হিসাবী বলিয়া বোধ হইল, কারণ নিজে কিছু বলিল না, স্বধু কাফ্রীটাকে টিপিয়া দিল—"He must not come,—see to it" অর্থাৎ দেখো যেন কোন মতে না ঢোকে। কাফ্রীটাকেও ষোল আনা পাপের ভাগী হইতে হইল না, কারণ সে তাড়িয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি 'স্থান ত্যাগেন' তাহাকে বাঁচাইয়া দিলাম।

ইণ্টার ক্লাশ ওয়েটিংরুমে গিয়া ব্যাগটা খুলিলাম। জ্যেঠ মহাশয় মাপ দিয়া দিয়াছিলেন—তাঁহার জন্য চাঁদনি থেকে একটা পুরা স্যুট কিনিয়া লইয়া যাইতেছিলাম—মায় টুপি নেকটাই সমেত। আমার যাহা পরা ছিল সে সব তো রহিলই, তদুপরি সেইগুলা চড়াইলাম। পেণ্টলুনটা বুক পর্যন্ত তুলিয়া বাঁধিলাম এবং নিচে পায়ের গোছের কাছে তিন চার পাট করিয়া মুড়িয়া দিলাম। টুপিটা মাথায় না দিয়া সাহেবী কায়দায় বগলদাবা করিলাম—সে এক বীরভদ্দর সোলার টুপি—পরিলে এক

প্রকার পুরুষ-ঘোমটা হইয়া পড়িত, পথ চলিবার উপায় থাকিত না ; একটা দেশী গেরো দিয়া নেক্‌টাইটা বাঁধিলাম, কোটটার আস্তিন ভিতর দিকে কনুই পর্যন্ত তুলিয়া মুড়িয়া দিলাম—ওদিকে হাঁটু পর্যন্ত লটকাইয়া রহিল....

একটা কাপড়ের পুঁটলিতে পুরোহিতদর্পণ, সত্যনারায়ণ-কথা সরলচণ্ডী, মনসা-মাহাত্ম্য প্রভৃতি মিলিয়া প্রায় ৬০ কাপি বই এবং একরাশ বাঁধান অ-বাঁধান ঠাকুর দেবতার ছবি বাঁধা ছিল,—গ্রামের ফরমাস। সেই বোঝাটা একটা কুলির মাথায় দিয়া একেবারে ইউরোপিয়ান থার্ডের সামনে গিয়া দাঁড়াইলাম এবং টুপিটা কপালের উপর একটু টানিয়া দিয়া, দরজা খুলিয়া ঢুকিয়া পড়িলাম। কাফ্রীটা আমায় স্বজাতি মনে করিয়া সম্ভাষণ করিতে যাইয়া হঠাৎ গম্ভীর হইয়া মুখের পানে চাহিয়া রহিল ; সন্দিগ্ধভাবে খানিকটা উত্তেজনার সহিতই বলিল—"তুমি না এই আসিয়াছিলে ?—জোচ্চোর !"

সেকেণ্ড বেল বাজিতেছিল ; আমি কুলির মাথা হইতে বইয়ের পুঁটলিটা নামাইতে নামাইতে সংক্ষেপে বলিলাম—"নেটিভ ক্রিশ্চান—ন্যাশান্যাল ড্রেস্"....

"স'রে দাঁড়াও, র‍্যাঙ্কিনের বড়সাহেব আসচেন"—বলিতে বলিতে তিন চারজন বখাটে বাঙ্গালী ছোকরা আমার সামনে ভিড় সরাইতে সরাইতে আসিয়াছিল। টুপি নাড়িয়া ইংরাজিতে বলিলাম—"তোমাদের সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ, বন্ধু সব মনে রেখ, এখন বিদায় !"

তাহারাও কতকটা অপ্রতিভ হইয়া গাল দিতে দিতে চলিয়া গেল, কাফ্রীটাও বোধহয়, আমি দলে ভারি আছি ভাবিয়া আর তখন কিছু বলিল না। শুধু নরখাদকের মতো আমার দিকে চাহিয়া রহিল। গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

পাদ্রীও মাঝে মাঝে অপ্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিড় বিড় করিয়া কি বকিতেছিল। ইহাদের গতিক দেখিয়া আমি আর দরজার নিকট হইতে নড়া নিরাপদ মনে করিলাম না। সেইখানেই দাঁড়াইয়া বাক্সের উপর পুঁটুলিটা অস্বস্তির সহিত নানাভাবে গুছাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, এবং ইহারা কিরূপ ব্যবহার করিলে আমি কি উপায় অবলম্বন করিব মনে মনে তাহারই একটা খসড়া তৈয়ার করিতে লাগিলাম।

পাদ্রীসাহেব কাফ্রীটাকে হুকুম করিল—"জিজ্ঞাসা করত, ও কি ইউরোপিয়ান যে এ গাড়িতে চড়িয়াছে?"—হুকুম করিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

আমিও উত্তর না দিয়া কাফ্রীটার মুখ দিয়াই প্রশ্নটা শুনিবার অপেক্ষায় রহিলাম। সে দাঁতমুখ খিঁচাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"Don't you hear, you fool, are you a European?" অর্থাৎ কথাটা কানে ঢোকেনি, মূর্খ, তুমি কি ইউরোপিয়ান?

বলিলাম—"Yes, just as much as you are" (হ্যাঁ ঠিক তোমারই মত)—বলিয়া মাথার কাছে গাড়ি থামাইবার শিকলটা বাগাইয়া ধরিলাম—উঠিয়াছে কি টানিয়া দিব—

সাহেব একটু হাসিল এবং তাহাতে কাফ্রীটা অপ্রতিভ হইয়া একটু কাসিল—একবার জানালার বাহিরে চাহিল, একবার গাড়ির ছাদের পানে চাহিল এবং অবশেষে কোনখানে চাহিলে বেশ সপ্রতিভ দেখাইবে ঠিক করিতে না পারিয়া নিজের নেক্‌টাইটা খুলিয়া আবার বাঁধিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

সাহেব বিশুদ্ধ বাঙ্গলায় আমায় সুধাইল—"টুমি বাঙ্গলা ভাষা জ্ঞাট আছ?"

হঠাৎ বাঙ্গলা শুনিয়া প্রথমটা চকিত হইয়া উঠিলাম, কিন্তু প্রশ্নটার

প্রয়োজন প্রথমে উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। বাঙ্গালীর ছেলে, বাঙ্গলা ভাষা 'জ্ঞাট' হইব না কি রকম! তাহার পর বুঝিতে পারিলাম, সাহেব যে নিজে বাঙ্গলা জানেন এ কথা নমুনা দিয়া আমায় বিদিত করা হইল। আমি অত্যন্ত বিনয়ের সহিত ইংরাজী বাঙ্গলা মিশাইয়া উত্তর করিলাম—"পবিত্র যীশুক্রীষ্টের ধর্ম গ্রহণ করা অবধি প্রাণপণে এই অপবিত্র ভাষাটা ভুলিবার চেষ্টা করিতেছি—এখনও সম্পূর্ণ সমর্থ হই নাই।....আপনি তো চমৎকার বাঙ্গলা জানেন দেখিতেছি; একেবারে প্রাণে গিয়ে লাগে। কোন বাঙ্গালীকে এমন বাঙ্গলা বলিতে শুনি নাই।"—বলিয়া চোখ দুইটা যথাসম্ভব বিস্তারিত করিয়া অন্তরের প্রশংসা জানাইলাম। শেষের কথাটা একেবারে মিথ্যা বলা হয় নাই, এইটুকু সান্ত্বনা রহিল।

সাহেব যেন কৃতকৃতার্থ হইয়া গেল। বলিল—"না, আমি কিঞ্চিটও বাঙ্গলা জ্ঞাট নহি। ইহা হয় সট্য যে বাঙ্গলা হিডেনডিগের অপবিট্র ভাষা ছিল, কিন্তু ইহাটে বাইবেল অনুবাডিট হওয়া অবটি ইহা পবিট্র হইয়া গিয়াছে। টুমি ইহাকে স্বচ্ছণ্ডে মনে রাখিটে পার,—ভুলিবার প্রয়োজন নাই।....ডাঁড়াইয়া কেন, এখানে এস"—বলিয়া সামনের জায়গা হইতে টুপিটা উঠাইয়া লইল।

সাহেবের মুখোমুখি হইয়া বসিলাম। কাক্রীটার নেক্‌টাই বাঁধা হইয়া গিয়াছিল, একবার আমার দিকে দৃষ্টিপ্রসাদ করিয়া অন্যদিকে চাহিয়া বিড়বিড় করিতে লাগিল। বুঝিলাম নিজের ভাষায় গাল দিতেছে—আমাকেও এবং পাদ্রী সাহেবকেও।

সাহেবের সহিত কথাবার্তা চলিল। গাড়ি গাঁক্ গাঁক্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; সাহেবের গলার আওয়াজ টবর্গসঙ্কুল শব্দ বাঙ্গলা ঘাড়ে করিয়া তাহার সহিত পাল্লা দিয়া ছুটিল। সাধারণের সুবিধার জন্য ভাষাটাকে এখানে যথাসম্ভব মোলায়েম করিয়া লিখিয়া দিলাম—

সাহেব প্রথমে একটু বাজাইয়া লইবার চেষ্টা করিল, গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি মিছামিছি পোষাক বদলাইয়া আসিয়াছ, না সত্য সত্য নেটিভ ক্রিশ্চান আছ ?"

আমি বলিলাম—"সত্য সত্যই আমি নেটিভ ক্রিশ্চান ব'লে মিছে পোষাকটা বদলে এসেছি, ধর্ম্মাবতার।"

সাহেব ঠোঁট দু'টা চাপিয়া গোঁফ দাড়ি একত্র করিয়া সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়িল। আবার বলিল—"কি জন্য ?"

"তোমাদের কাছে অবপিত্র পোষাক প'রে আসতে লজ্জা ক'রতে লাগল।"

"হু, অপবিত্র পোষাক পরিধান করিয়াছিলে কেন ?"

"না হ'লে হিদেনরা তাদের গাড়িতে ঢুকতে দেয় না ; গরীব মানুষ থার্ড ক্লাশে ভিন্ন যেতে পারি না।"

"এ গাড়িতে আসলেই হইত, ক্রিশ্চান গবর্ণমেণ্ট তোমাকে আশ্রয়দান করিত।"

"এটা ইউরোপিয়ান গাড়ি সাহেব—সব সময় ঢুকতে দেয় না। দয়ার অবতার তুমি ছিলে ব'লেই আসতে সাহস ক'রলাম।"

সাহেব হাসিল। অবতারে বিশ্বাস করে না বটে, কিন্তু বুঝিলাম এ-ক্ষেত্রে ফল হইয়াছে। আমি কালক্ষেপ না করিয়া আরও কতকগুলো ঐ গোছের কথা জুড়িয়া দিলাম ;—সাহেবের জেরার রোখটা কাটিয়া গেল, প্রসন্ন ভাবে বলিল—"তুমি প্রকৃত ক্রিশ্চান আছ। তোমার হৃদয়ে আলোক আছে,—কতদিন হইতে হইয়াছ ?"

"এই অল্পদিন থেকে।"

"তোমার পিতামাতা সকলেই পবিত্রধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন ?"

বলিলাম—"না ধর্ম্মাবতার ; বরং আমি আলোকে এসেছি পর্যন্ত

তাঁরা সকাল সন্ধ্যায় তোমাদের সগুষ্ঠি গাল না দিয়ে জল খান না।”

সাহেব হাসিতে লাগিল, বলিল—“কি বলেন?—‘হে মাতা কালী জোড়া পাঁঠা দিব, সাহেবদিগকে মারিয়া ফেল’—হাঃ হাঃ হাঃ—তাহার পর তোমাদের—তাহাদের কালীর সহিত আমাদের পবিত্র ভূতের ঘোরতর যুদ্ধ হয়—কালী হারিয়া যায়—তাহারা ম্যালেরিয়ায় মরিয়া যায়—ভূত হয়; আমরা সুখে রাজত্ব করিতে থাকি। তাহাদের দেবতারা চিরকালই হারিয়া যায়—ইহাকে বিজ্ঞানে বলে—“**Survival of the Fittest.**”

আমি।—“ঠিক কথা সাহেব, বাঙ্গলা দেশটা দেখলে তোমার কথায় আর সন্দেহ থাকে না। এমন ভূতের ওপর রাজত্ব ক’রতে কোন জাতই পারে নি। দিন দিন পবিত্র ভূতের আশীর্বাদে তোমাদের প্রজাও হু হু ক’রে বেড়েই যাচ্ছে।”

সাহেব।—হাঃ হাঃ হাঃ, তবুও তোমাদের দেশের লোক আমাদের ধর্মকে চিনিতে পারে না; তুমি কি করিয়া চিনিলে?”

আমি।—“খুব বেশি মাথা ঘামাতে হয় নি; এক আঁচড়েই চেনা গিয়েছে। তারপর অসভ্য জামা কাপড়গুলো ছেড়ে, এই সুসভ্য সেজে বেরিয়ে এসেছি”—বলিয়া নিজের নূতন শ্রীতে সাহেবের মনোরঞ্জন করিবার জন্য একবার দাঁড়াইয়া উঠিলাম।

সাহেব হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না। গাম্ভীর্য রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—‘বস’, ‘বস’; জামাগুলা একটু ঢিলা আছে। কে দান করিয়াছে?”

আমি।—“যে পাদ্রী সাহেবের কাছে ব্যাপ্‌টাইজ্‌ড হোয়েছি তিনিই দিয়েছেন; মস্ত বড় দানী ব্যক্তি। তাঁর সবই এই রকম বড় বড় দান।”

তারপর অসভ্য জামা কাপড়গুলো ছেড়ে, এই সুসভ্য সেজে বেরিয়ে এসেছি

সাহেব।—"দেখ, আমাদের ধর্মে কত দয়া আছে। আমিও তোমায় ক্রিশ্চান জানতে পেরে কেমন এই বিলিতী কামরায় আশ্রয় দিয়াছি। হিন্দুদের পুরোহিত হইলে দিত?"

জোরে মাথা নাড়িয়া বলিয়া ফেলিলাম—"রাধামাধব"—সঙ্গে সঙ্গে ভুলটা শুধরাইয়া লইয়া বলিলাম—"কখনই না; তারা দেবার পাত্র!"

সাহেব।—"আমরা আমাদের মেষ সকলকে এইরূপভাবে রক্ষা করি। বাহিরের শত্রু তাহার কিছুই করিতে পারে না।"

কাফ্রীটা থাকিয়া থাকিয়া সেইরূপ দৃষ্টি হানিতেছে। আমি একবার চাহিয়া লইয়া সাহেবকে বলিলাম—"ধর্মাবতার, আপনার অসীম দয়া, কিন্তু ওকে আগে একটু বুঝিয়ে দিন যে আমিও সামান্য একটি মেষ, ও যেন এখনও আমায় বাইরের শত্রু ঠাউরেই বসে আছে।....একটি মেষ আপনার এক্ষুণি কমে যেতে পারে বলে আমার ভয় হচ্ছে।"

সাহেব হাসিয়া বলিল—"না, না, ও লোকটা কাফ্রী হওয়ার নিমিত্ত অত্যন্ত রাগী আছে বটে, কিন্তু তোমার কোন ভয় নাই। আমার বাঙ্গালী সহায়কটি অসুখে পতিত হইয়াছে, তাই ওকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছি। সে-লোকটা পবিত্রহৃদয়—খুব বক্তৃতা দিতে পারে এবং হিন্দুদের দেব-দেবীকে খুব গালি দিতে পারে।....আজ আমায়ই বাঙ্গলায় বক্তৃতা দিতে হইবে...."

আমি জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া রহিলাম, সাহেব বলিল—"আমরা গোবিন্দপুরে রথের মেলায় যাইতেছি—পথভ্রষ্ট আত্মাদের আলোক দেখাইবার জন্য।"

বুঝিলাম—আর কিছু নয়, ইহারা মেলায় গিয়া আমাদের ঠাকুর-দেবতাদের গালমন্দ দিয়া, আমাদের দল ভাঙাইবার চেষ্টায় চলিয়াছে;—কোন্ না দুই একটাকে পথভ্রষ্ট করিয়াই লইবে।....মনটা বড় খারাপ

হইয়া গেল। প্রতি মেলাতেই এমন কতশত জায়গায় গিয়া ইহারা এমনি করিয়া আমাদের সর্বনাশ করিতেছে, অথচ আমরা বেশ নিশ্চিন্ত আছি আমরা যে মানুষ—আর নেহাৎ যে-সে মানুষ নয়—সেটা আমরা দেখাইব সুধু হুঁকা-তামাক বন্ধ করিবার সময়। ইতিমধ্যে হুঁকা তামাকের মায়া কাটাইয়া কতশত আপন লোক যে পর হইয়া যাইতেছে তাহার হুঁস নাই আমাদের।....হায়, যদি কোন উপায়ে আপাতত এ যাত্রাটা পণ্ড করিতে পারিতাম, সামান্যও একটা সান্ত্বনা মনে থাকিয়া যাইত।....

এতক্ষণ অন্যমনস্ক দেখিয়া বোধকরি সাহেবের সন্দেহ হইয়া থাকিবে জিজ্ঞাসা করিল—"কি চিন্তা করিতেছ?"

বলিলাম "একটা কথা ভাবছিলাম, ধর্মাবতার; কিন্তু ব'লতে মোটেই সাহস হ'চ্ছে না।"

"আমি সাহস দিতেছি, বল; কাফ্রীকে এত ভয় কেন?"

"কাফ্রীকে ভয় নয়, ধর্মাবতার; তোমার মুখে বাঙ্গলা বক্তৃতা শোনবার বড় লোভ হচ্ছে, যদি দয়া ক'রে সঙ্গে নাও...."

সাহেব উল্লসিত হইয়া উঠিল; বেঞ্চের উপর হাত চাপড়াইয়া বলিল—"নিশ্চয় যাইবে, নিশ্চয় যাইবে। আমার বাঙ্গলা জ্ঞানের জন্য গোল্ড মেডেল অর্থাৎ সুবর্ণ তকমা আছে। আর তোমায়ও আমার বাঙ্গলা সহকারীর স্থানে বক্তৃতা দিতে হইবে। বাইবেল জানা আছে তো?"

"তা' আর নাই!"—বলিয়া Jesus Christ the son of David, the son of Abraham. Abraham begot Issac থেকে সুরু করিয়া ইজ্‌রেলাইট ইস্‌মেলাইট প্রভৃতি বাইবেল প্রসিদ্ধ কতকগুলা জাতির কুলুজি গড়গড় করিয়া আওড়াইয়া গেলাম। মিশনারি কলেজে পড়ি—ঔষধ-গেলা করিয়া বাইবেলের অনেকটা মুখস্ত করিয়া রাখিয়াছি।

সাহেবের চক্ষু দেখিয়া বোধ হইল আমায় একটি রত্নবিশেষ ঠাহরাইয়াছে, আমিও তাহার রাশি রাশি প্রমাণ দিয়া যাইতে লাগিলাম। শেষে এমন হইল যে কোথায় আমিই খোসামোদ করিব, না, সেই আমার হাত দুইটা ধরিয়া মিনতির স্বরে বলিল,—"শুধু আজ বক্তৃতা দিলে চলিবে না এলফ্রেড গোসা ; তোমায় আমাদের মিশনে থাকিতে হইবে ; আমি কোনমতে ছাড়িব না...."

আমি বলিলাম—"আমাকে সর্বদা কষ্ট ক'রে ধরে রাখতে হবে না সাহেব—মিশনে থাকা তো পরম সৌভাগ্য, কটা ক্রিশ্চানের ভাগ্যে ঘটে ? তবে ওরকম রাগী কাফ্রী সেখানে কজন আছে জেনে রাখা দরকার।"

"ও ব্ল্যাক (কেলেটে) তোমার কি করতে পারে ?—আমি রক্ষা করিব তোমায়"—বলিয়া সাহেব কাফ্রীটার দিকে একটা নির্মম দৃষ্টি হানিল।

কাফ্রীটাও প্রায় সেই রকম ভাবেই দৃষ্টিটা ফিরাইয়া দিল। খুব চটিয়া গিয়াছে। আমার দিকে যা চাহিল সে আবার আরও তীব্র। আমি তাহার মুখ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া বলিলাম—"তা' হ'লে ধর্মাবতার, বোধ হয় এখন থেকেই রক্ষার কাজ আরম্ভ ক'রতে হয়...."

কাফ্রীর আমারই মত কাল বুকের ভিতরে যে হৃদয়টা আছে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া মনে মনে বলিলাম....'ভাই, লাঞ্ছনায় আমরা সব কালোই আজ এক ; এ অনুগ্রহটা ক্ষণিক—এই তোমার উপর ছিল, এই আমার উপর হইয়াছে। তবে যুগব্যাপী গোলামির পরও তোমরা এখনও যে কড়া নজরটা সুদে আসলে ফিরাইয়া দিতে পার দেখিতেছি—তবু ভাল।

এই সব কথাবার্তা, চিন্তার মধ্যে গাড়ি আসিয়া স্টেশনে দাঁড়াইল। পাদ্রী সাহেব ঠাকুরদেবতাদের উপর যে বা...বান সব ছাড়িতে লাগিল সেসব এখানে লিপিবদ্ধ করিয়া কাহারও দৃষ্টি ক... করিতে চাহি না। নিজে মুখটি বুজিয়া শুনিয়া গেলাম, অনেকটা শোন...্যাসও আছে। মনে মনে বলিলাম—'তেত্রিশ কোটির মধ্যে একজনেরও যদি তিলার্ধও আত্মসম্মান জ্ঞান থাকে তো শুনিয়া রাখো!—বিশেষ ক'রে হে মা কালী তোমারই ওপর দেখ্‌ছি যত আক্রোশ—রাতারাতি একটা বিলি করো। কোন হিন্দু হ'লে মিনতি ক'রতাম না মা, তুমি নি...ই ওপর-পড়া হ'য়ে ব্যবস্থা ক'রতে,—এর সিকি ভাগও ব'লে রেহাই পে... না....."

স্টেশন হইতে গোবিন্দপুর পাক্কা তিন ক্রোশ। একটা প্রশস্ত পথ সোজা চলিয়া গিয়াছে,—গাড়ি থামিবার কয়েক মিনিট পরে তাহার জনস্রোতে বান ডাকিল। নামিয়া দেখিলাম ছোটবড় রাস্তা দিয়া, ক্ষেতের আল দিয়া, পিঁপড়ার সারের মত উত্তর দিকে লোক চলিয়াছে। দেবতা আজ পথে নামিয়াছেন, আমার হিন্দু-আত্মা এই উদ্ভট বেশে... মধ্যে রুদ্ধ হইয়া যেন পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর মত পাখা ঝাপটাইতে লাগি... মনে হইল এই প্রবঞ্চনা ছাড়িয়া ঐ সব ছোটবড় যাত্রীর সাথে আজ পথিক দেবতার সঙ্গ লই! কিন্তু মাথায় দুষ্টামির প্ল্যানটা জাঁকিয়া বসিয়াছিল এবং অনেক-দিনের লাঞ্ছনার শোধ লইবার লোভটাও অত্যন্ত প্রবল হইয়া পড়িল, সুতরাং সাহেবের সঙ্গেই থাকিয়া গেলাম এবং আপাতত তাহারই কথায় সায় দিয়া চলিলাম।

কাফ্রী জিনিসপত্র নামাইতেছিল। সাহেব একবার চারিদিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"অনেক পথভ্রষ্ট আত্মা!"

আমি বলিলাম—"আজ্ঞে হ্যাঁ, গাদি লেগে গেছে একেবারে, পথ চলা দায়!"

সাহেব।—"একটা গাড়ি দরকার।"

আমি।—"খুব বেশি রকম, বিশেষ ক'রে আমায় লুকুবার জন্যে; দেখছেন না কি রকম ঘিরে ফেলেছে?" কথাগুলা ইংরাজিতেই বলিলাম।

সাহেব হাসিয়া ফেলিল; ইংরাজিতেই বলিল—"মিশনে ফিরিয়াই তোমার একটা ভাল সুট করাইয়া দিতে হইবে।....তোমরা সকলে কি দেখিতেছ, দশহস্তযুক্তা দুর্গা আছি, মহাদেবের বুকের কালী আছি, না দুর্গার পুত্র শুঁড়ওয়ালা গণেশ আছি?"—একথাগুলি বাঙ্গালায় দর্শকদের প্রতি বলা হইল।

আমরা তিনজনে, তাহার মধ্যে আবার বিশেষ করিয়া আমি যে কি এবং কি উদ্দেশ্যেই বা আমাদের অভ্যুদয় তাহা লইয়া চারিপাশে নানান রকমের মতামত, জল্পনা কল্পনা চলিতেছিল। একটা দজ্জাল গোছের মাগিই বেশিরকম অভিমত দিতেছিল; সাহেবকে ভেঙাইয়া বলিল—"দুর্গার পুত্র শুঁড়ওয়ালা গণেশ আছি'....মুখে আগুন, মা আবার তোমায় ছেলে ক'রবেন!....আমি বল্লু, এরা যিশুখিষ্টের দল, রথে ঠাকুর দেবতাদের গাল পাড়তে এয়েচে, তা তোমরা তো শুনবেনি। ওরা ঐজন্যে কোম্পানিগে' ট্যাকা পায় গো।—ঘেন্নার কথা বলবো কাকে, আমার গদার বাপকেও তো একরকম কলমা পড়িয়ে নেছ্‌লো....আমি সেই মেয়েমানুষ কিনা—মিন্সেকে ঝ্যাটার মুড়ো দিয়ে আবার জেতে তুলেছি।....তুই আবার কার কুল মজিয়ে এয়েচিস্‌রে ছোঁড়া? আহা কিযে মানিয়েছে—একে বেড়াল কালো তায় গাং সাঁতরে এলো...."

বলা বাহুল্য এই গাং-সাঁতরান বেড়াল আমিই। গদার বাপের হেফাজতের কথা স্মরণ করিয়া আমার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। ঝুঁকিয়া

তুই আবার কার কুল মজিয়ে এয়েছিস রে ছোঁড়া

পড়িয়া অতি ভালমানুষের মত সাহেবের একটা বাক্সের তালা গভীর মনোনিবেশের সহিত পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। সাহেব এই ছাঁকা বাঙ্গলার সব বুঝিতে না পারিলেও অস্বস্তির সহিত ইংরাজীতে বলিল—

"চল, আমরা গাড়ি ঠিক করিয়া রাখি : জোসেফ কুলি দিয়া সব লইয়া আসিবে।"

আলোচনা জোর চলিতেছে এবং সেই মাগিটা হাতমুখ নাড়িয়া, তাহার 'গদার বাপ'-এর কলমা পড়ার অথরিটিতে খুব ব্যাখ্যান করিয়া যাইতেছে। কে একজন বুঝি কাফ্রী জোসেফের কুলশীল সম্বন্ধে সংশয় জানাইয়াছে ;—গদার মা বলিতেছে "তা কেন হবে ?—আহা ও-ও আমার গদারই মত কোন বাঙ্গালী মায়ের নাড়ী ছেঁড়া তুলাল গো, এখন শোর গরু খেয়ে ওরকম চোয়াড় মেরে গেছে। হ্যাগা, তা যাবে নি ? এই তো আমার শরীল দেখছ, ভাবছ মাগি কি ক্ষীর ননীই না খায় ; ব'লতে নেই—তা যদি জাত খুইয়ে অথাত্তি কুখাত্তি খেঁত্তাম তো তোমরা কি ত্যাখন ব'লতে পারতে....'এই সেই গদার মা গো'...."

সাহেব গদার মাকে ভয় পাইলেও বোধ হয় স্বভাবের দোষে তর্কের লোভটা সংবরণ করিতে পারিল না। বিশেষ করিয়া এই একটু আগেই, সে আমার টীকার সাহায্যে আলোকপ্রাপ্ত গদার বাপের আবার অন্ধকারে ফিরিয়া যাইবার রোমাঞ্চকর ইতিহাসটী শুনিয়াছিল।—ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"কি জন্য শুয়ার গরু খাইবে না ? ঈশ্বর ফল সৃষ্টি করিয়াছেন, মাছ সৃষ্টি করিয়াছেন....গরু শুয়ারকেও সৃষ্টি করেন নাই ? তাহারা কি অপরাধ করিয়াছে ? তোমাদের অসভ্য, পক্ষপাতী ধর্মে...."

গদার মা নিজের দলের তুই তিন জনকে সাক্ষ্য মানিয়া বলিল—"দেখ বৈরিগী ঠাকুর, দেখ ঘোষের পো, দেখ্ কালবৌ—কথাগুনো একবার শুনে থুস—এ-নাগাদ ক্ষেমী বাগদিনীর ধর্মে কেউ হাত দিতে হেস্মৎ করেনি ; যদি এর নেয্যো জবাব দি, তোরা গাঁয়ে গিয়ে রটাতে পারবি নি, ক্ষেমী মদ্দ সেজে সাহেবের সঙ্গে নড়াই ক'রেছে...."

এদিকে ঠাকুর্দার কাঁধে চড়িয়া একটা সাত আট বছরের ছোঁড়া

অত্যন্ত কৌতুহলের সহিত আমাদের পরিচয় লইতেছিল। তাহার প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর্দা বলিল—"ও সাহেব, আমাদের রাজা; সেলাম ক'রতে হয়।" ছোঁড়া—"সাহেব, সেলাম" বলিয়া কপালে হাত ঠেকাইল, তাহার পর আমার দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া বলিল—"আর ওটা কি!"

ঠাকুর্দা একটা সদুত্তর খুঁজিতেছিল! সেটা আমার পক্ষে সুশ্রাব্য হইবে না জানিয়া আমি সাহেবের জামায় একটা টান দিয়া ইংরাজীতে বলিলাম—"ও একটা অক্ষর-জ্ঞানহীন মেয়েমানুষ, অত সূক্ষ্ম তর্ক কি বুঝ্‌তে পারবে?—চলুন, আসুন…"

"ওদিকে জোসেফ হাঁড়িপানা মুখ করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সে জিনিসপত্র *সুশৃঙ্খলায় নামাইবে* কি, সেখানেও একপাল লোক গাড়ির দরজা ঘেরিয়া তাহাকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল—গতিক দেখিয়া বোধ হইল 'গদার মা' গোছেরও কেহ যেন ছিল।

সাহেব বলিল—"সব পুঁটুলিগুলা নামান হইয়াছে?"

জোসেফ পুঁটলিগুলার দিকে না দেখিয়াই বলিল—"হাঁ, হইয়াছে।"

"তা হলে কুলির মাথায় করিয়া ঐখানে লইয়া এস—আমরা গাড়ি করিগে—" বলিয়া সাহেব আমায় লইয়া স্টেশনের বাহির হইয়া আসিল। কতকগুলি লোক আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিল, কতকগুলা গদার মার লেক্‌চার শুনিতে শুনিতে অন্যদিকে চলিয়া গেল, কতকগুলা জোসেফের চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

বেশিক্ষণ আর বিলম্ব হইল না; একটু পরেই আমাদের গাড়ি মেলার দিকে ছুটিতে আরম্ভ করিল; যতই অগ্রসর হইতে লাগিল লোকের ভীড় ততই পুরু হইতে লাগিল। গরমে, ঘামে, ধুলায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া জোসেফ ঢুলিতে লাগিল এবং এক একবার তন্দ্রার ঝোঁকে সাহেবের বিপুল পেটে ঢু মারিতে লাগিল, কিম্বা প্রেমিকের মত আমার ঘাড়ে

হেলিয়া পড়িতে লাগিল, এবং তাড়া খাইয়া ক্ষণিকের জন্য সচকিত হইয়া আবার নিস্তেজ হইয়া পড়িতে লাগিল। কলির কুম্ভকর্ণ।

সাহেব উদ্ব্যস্ত হইয়া পড়িল, জোসেফের গজসম মস্তক হইতে নিজের ভুঁড়িটাকে বাঁচাইবার জন্য হাতের একটা আগল সৃষ্টি করিয়া বলিল—"I never knew a Christian could sleep under these conditions." (কোন ক্রিশ্চান যে এ অবস্থায় ঘুমাইতে পারে তাহা জানিতাম না)।

শেষে হাতের আগলেও যখন বাগ মানিল না, একটা জবরদস্ত ঝাঁকানি দিয়া তাহাকে জাগাইয়া দিল এবং যাহাতে জাগ্রত থাকে সেই উদ্দেশ্যে বলিল "বইয়ের পুঁটুলিটা বাহির কর এবং কয়েক মিনিট অন্তর তিন চার খানা করিয়া কাপি রাস্তার লোকদের বিলাইতে বিলাইতে চল"—আমার দিকে চাহিয়া বলিল "ইহাতে রঠ বেচা কলা দেখা দুইই হইবে।" নিজের বাঙ্গালা জ্ঞানের গরিমায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; আমিও জ্ঞানের বহর দেখিয়া হাসিতে লাগিলাম।

জোসেফ মুষ্টিদ্বয় কোলের উপর রাখিয়া সাহেবের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

সাহেব বলিল—"কথাটা কানে গেল? পুঁটুলিটা খোল; কোথায় রেখেচ!"

"গাড়ির বাঙ্কের উপর।"

"ঘোড়ার গাড়ির ওপরটাকে বাঙ্ক বলে না, ছাত বলে। বস্তা রাখলেই সেটা বাঙ্ক হয়ে যায় না! জ্বালাতন!....যাও নিয়ে এস, কোচম্যানকে দাঁড়াতে বল।....এই খাড়া হোও।"

জোসেফ সেই একই ভাবের শূন্য দৃষ্টিতে সমস্তটাই শুনিয়া গেল। তাহার পর বলিল "রেল গাড়ির বাঙ্কের উপর আছে, তাড়াতাড়িতে নামান হয় নি।"

সাহেব লাফাইয়া উঠিল "কি সর্বনাশ! নামা[illegible] নি? পাঁচশত বই গাড়িতে রয়ে গেল! লেক্‌চার দিয়ে আজ কি ফল হবে? লোকে বই না পেলে কেন একত্র হবে, কেন বিশ্বাস করবে? বই নামান হয় নি! কিসের এত তাড়াতাড়ি ছিল? কখন টের পেলে?...."

জোসেফ নির্বিকারভাবে উত্তর দিল "গাড়ি ছেড়ে গেলে।"

"গাড়ি ছেড়ে গেলে? বলিতে লজ্জা করচে না? এতক্ষণ বলা হয় নি কেন শুনি।"

"বলব বলব করছিলাম।"

"শুনেছ এলফ্রেড গোসা? উনি যে এতক্ষণ নাক ডাকাইয়া তোমার আমার ঘাড়ে পড়িতেছিলেন ওটা ঘুম নয়। ভাবিতেছিলেন কথাটা কি করিয়া বলি; এমন গদর্ভ আর দ্বিতীয়টা দেখিয়াছ? জানোয়ার; ক্রিশ্চানিটিকে ইহারা কলঙ্কিত করিয়াছে। একটুও অনুতাপের ভাব দেখিতে পাইতেছ? আবার চেহারা দেখিতেছ?—যেন—যেন...."

সমস্ত রাস্তা পাদ্রী সাহেব ক্ষিপ্তভাবে এই রকম বকিতে বকিতে চলিল। কাফ্রীটার উপর ইহার কি ফল হইল ভাল বোঝা গেল না—কারণ সে খোলা জানালার মধ্য দিয়া হাত দুইটা বাড়াইয়া দিল এবং তাহার উপর থুথ্‌নিটা চাপিয়া বাহিরের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহাতে তাহাকে অত্যন্ত ম্রিয়মান দেখাইতে লাগিল বটে; কিন্তু মাঝে মাঝে তাহার মাথাটা যেরূপ জানালার ফ্রেমে ঠুকিয়া যাইতে লাগিল তাহাতে আমার যেন বোধ হইল সে অনুশোচনার সাগরে নিমগ্ন হইয়া দিব্য নিদ্রা যাইতেছে।...

মেলায় গিয়া আমরা প্রায় পাঁচটার সময় পৌঁছিলাম। অত্যন্ত ভীড়—এক মুঠা তিল ছড়াইলে বোধ হয় মাটিতে পড়ে না। আমাদের গাড়ি গিয়া মেলার বাহিরে একটা ঝাঁকড়া গাছতলায় দাঁড়াইল।

পাদ্রীসাহেব তাহার পরদিন ভোরে বাসায় পৌছিবে, সুতরাং কতকগুলা লটবহর ও একটা ছোট্ট তাঁবু পর্যন্ত আনিয়াছিল। জোসেফ লোক দিয়া তাঁবু খাটাইয়া জিনিসপত্রগুলা ঠিক করিয়া রাখিতে লাগিল। আমরা মুখ হাত ধুইয়া, পোষাকের ধুলা ঝাড়িয়া, ঠাণ্ডা হইয়া গাছের শেকড়ের উপর বসিলাম। সাহেব একটা লেমনেড্ পান করিয়া প্রকৃতিস্থ হইল; চারিদিকে চাহিয়া বলিল—"বড় বিলম্ব হইয়া গিয়াছে—আচ্ছা কি করিয়া বক্তৃতা দিব বলত? ইহা মোটে আমার এই তৃতীয়বার বক্তৃতা দেওয়া হইবে। অবশ্য আমার বাঙ্গালা জ্ঞানের জন্য মেডেল...."

আমি বলিলাম—"আমি কি এতটা একসঙ্গে এসেও সে পরিচয় পাইনি সাহেব? বক্তৃতার কথা যদি জিগ্যেস করলেন—সকলের চেয়ে লাগসই হবে আগে ওদের ঠাকুরদেবতাদের আজগুবি আজগুবি কীর্তিগুলা সোজাসুজি ব'লে যান; তারপর—একধার থেকে সমালোচনা, চুটিয়ে একেবারে; তাহলে যারা শুনবে তাদের মধ্যে কম লোকেরই ঘরে ফিরে যেতে হবে। আর যদি আগে থেকেই ওদের ঠাকুর দেবতাদের গালমন্দ শুরু করে দেন তো সব ভ'ড়কে যাবে। আমি ঠিক এই রকম সাজান বক্তৃতা শুনেই তো আলোকে এসেছি।.... সে ছিলেন রেভারেণ্ড উড্ সায়েব....ভাল বাঙ্গলাও জানতেন না—আর আপনার মুখে যা বাঙ্গলার তোড় শুনলাম...." ইত্যাদি।

তোড়টা আবার নামিল। অনেক স্ত্রীপুরুষ বালক বালিকা আমাদের ঘেরিয়া ফেলিয়াছিল,—অধিকাংশই নিম্ন শ্রেণীর। সাহেব বক্তৃতা দিতে শুরু করিয়া দিল। আমি উঠিবার সময় আর একবার টুকিয়া দিলাম—"দেখ্‌বেন যেন প্রথমেই গাল দিয়ে আরম্ভ করবেন না, আর বাঙ্গলাটা খুব শুদ্ধ হওয়া চাই"—মনে মনে বলিলাম যাহাতে একবর্ণও কেউ বুঝিতে না পারে।

সাহেব উঠিয়া দুইহাত বুকের উপর চাপিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর একটু ডাইনে বায়ে দুলিয়া লইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিল। যাহাতে পূর্ণ-রস গ্রহণ হয় সেজন্য সেটা সম্পূর্ণ অবিকৃত ভাবেই এখানে ধরিয়া দিলাম—

"ভড্রমহিলা এবং ভড্রমহোডয়গণ, (একটি স্ত্রীলোক বলিল—চল্ তাঁতিবৌ ; বন্ন, গাল পাড়বে) আপনারা যে হষ্ট-পডহীন ভীষণ কৃষ্ণবর্ণ ডেবটার ডর্শন করিটে আসট করিয়াছেন সে কে আছে ? টাহার বাল্য-কালের ইটিহাস বর্ণনা করিলে টাহা আপনাডের ভক্টির মূলে কুঠারাঘাট করিবে। প্রঠমট আপনাডের বিচার বুড্ডি প্রয়োগ করিয়া ডেখুন এই ডেবটা কে আছেন। আপনাডের বলা বাহুল্য যে এই অড্ভুট ডেবটাটি আপনাডের শ্রীকৃষ্ণ আছেন, যিনি বাল্যকালে কনিষ্ঠা অঙ্গুলী ডারা গোবঢর্ন ঢারণ করিয়া ছিলেন। হাঃ হাঃ—গোবঢর্ন ঢারণ করিয়া-ছিলেন !....ভড্রমহিলা এবং ভড্রমহোডয়গণ, আমি কি আপনাডিগকে প্রশ্ন করিবার স্বাঢীনটা লাভ করিটে পারি যে যাহার হস্ট ডুইটাই কটিট টাহার আবার অঙ্গুলী আসিল কোঠা হইটে ?....এ প্রশ্নের উট্টর আপনারা ডিটে পারিবেন না কিণ্টু আমি পারিব। এই কৃষ্ণ নামক ডেবটা বাল্যকালে এট ডুস্কর্ম করিয়াছিল, যে বড় হইয়া পূজার লোভে উহাকে সম্পূর্ণরূপে স্বকীয় চেহারা বডলাইয়া ফেলিটে হইয়াছে....'

আমি উঠিয়া একান্তে ইংরাজিতে বলিলাম—'সাহেব, সমালোচনা পরে হবে, এখন এক এক ক'রে আজগুবি গল্পগুলা সোজাসুজি শুনিয়ে যাও, যেমন কংশবধ, পুতনাবধ, বিশ্বরূপ দেখান, কালীয় দমন—এই সব।"

"—ভড্রমহিলা এবং ভড্রমহোডয়গণ, আসুন আমরা প্রঠমে সযট্ন সহকারে ডেখিবার চেষ্টা করি, এই ডুই রকম চেহারার অড্ভুট্ ডেবটা

বাল্যকালে কি কি কীর্তি করিয়াছিল। এই অণ্টকার ডেবটার জন্ম হইয়াছিল এক অণ্টকার রাট্রিটে। আমাডের ট্রাণকর্টা খৃষ্টের যে জন্ম হইয়াছিল টাহার টারিখ লিখিট আছে; কিণ্টু কৃষ্ণের কী টারিখ আছে?—কি অকাট্য প্রমাণ বর্টমান আছে টাহার জন্মের? (আমি জামার খুঁটটা একটু টানিয়া দিলাম) আচ্ছা সে ইটিহাসের কঠা পরে পর্যালোচনা করা যাইবে। যে সময় বসুডেব সড্যজাট কৃষ্ণকে বক্ষে লইয়া ভীরুর ন্যায় নণ্ডর গৃহে পলাইটে ছিল সেই সময় হইটেই যট অসম্ভব অসম্ভব ঘটনা বেচারি পৃঠিবীটে সংঘটিট হইটে আরম্ভ হইল। টাহাকে বৃষ্টি হইটে ট্রাণ করিবার নিমিট্ট বাসুকী সহস্র মুখের ফণা বিষ্টার করিয়া পিছনে পিছনে পশ্চাট্গমন করিটে লাগিল। ভড্রমহিলা এবং ভড্রমহোডয়গণ, আমি সট্বর আমাডের পবিট্র ঢর্মপুষ্টক হইটে ডেখাইটে চেষ্টা করিব যে এই সর্প অটি ক্রুড় জাটি।—সয়টান সর্পের রূপ....” (আমি নিরস্ত করিবার জন্য জামাটা টানিয়া দিলাম)....“আসুন এইবার আমরা নণ্ডের গৃহে প্রবেশ করি—” (একটা বুড়ি বলিল—শোন কথা, নন্দের জাত মারবে নাকি!—যত সব....) “সেখানে হটভাগ্য শ্রীকৃষ্ণ রাজার টনয় হইয়া গরু চড়াইয়া বেড়াইটে লাগিল। কঠায় বলে টুমি যাও বঙ্গে, টোমার কপালও পশ্চাটে পশ্চাটে গমন করে। বাসুকী বৃষ্টি হইটে রক্ষা করিটে পারে কিণ্টু অডৃষ্ট হইটে এক আমাডের ট্রাণকর্টা ভিন্ন কে পরিট্রাণ করিবে? ভড্রমহিলা এবং ভড্রমহোডয়গণ, গয়লা অটিশয় ডুরাট্মা জাটি। আমাকে যে গোবর্ঢন গয়লা ডুগ্ধ বিক্রয় করে সে ঈশ্বরের নামে শপঠ করিয়া বলে যে আমার নিমিট্ট চারিসের রেটে যে ডুগ্ঢ ডেয় টাহাটেও জল মিশ্রিট করে না এবং আমার কুকুরের জন্য ডশসের রেটে যে ডুগ্ঢ ডেয় টাহাটেও জল মিশ্রিট করে না! অঠচ যডি মডীয় ডুগ্ঢ কোনডিন খারাপ প্রমাণিট হয় টো কহে বোঢ হয়

ভুলক্রমে সেই কুকুরের ডুগ্‌ঢ পান করিয়াছি। একডিবস অট্যন্ত ক্রুড্‌ঢ হইয়া আমি টাহাকে চাবুক আঘাট করিয়াছিলাম। ইহাটে টাহার বৃড্‌ঢা ভগ্নী ও যুবটি পট্‌নী আমার প্রাচীরের বাহিরে ডণ্ডায়মানা হইয়া যে প্রকার বিবিঢ অঙ্গসঞ্চালন সহকারে অসভ্য গালি ডিটে লাগিল টাহাটে বুঝা গেল যে স্ত্রীগয়লারাও (আমি জামার খুট ধরিয়া টানিয়া দিলাম)....“ভড্রমহিলা এবং ভড্রমহোডয়গণ, ইহা হইটে স্বচ্ছণ্ডে বুঝা যায় শ্রীকৃষ্ণ এই গয়লা স্ত্রী-পুরুষডিগের মঢ্যে ঠাকিয়া ও টাহাডের বালক বালিকাডের সঙ্গে মিশ্রিট হইয়া চরিট্র হারাইয়া ফেলিল এবং অটাণ্ট ডুড্ডাণ্ট এবং বখাটে ছোকরা হইয়া ডাড়াইল। বিষাক্ট বৃক্ষ রোপণ করিলে টাহাটে কি উট্‌পাডিট হয় ?—কণ্টক উটপাডিট হয় এবং বিষাক্ট ফল উটপাডন হয়। শ্রীকৃষ্ণ ডুষ্ট হইয়া পড়াশুনা করিল না, ক্ষীর ননী চুরি করিটে লাগিল, প্রটিডিন চরিট্র হারাইটে লাগিল। টাহার খারাপ চরিট্রের বৃক্ষে কি ফল উট্‌পাডিট হইল !—জল-কেলি এবং বষ্ট্রহরণ ;—উঃ, লেডির বষ্ট্রহরণ !—আমাডের শ্বেটডিপের লেডি হইলে শ্রীকৃষ্ণকে শুট্‌ করিট। ভড্রমহিলা এবং ভড্রমহোডয়গণ, গয়লারা একটি ভয়ঙ্কর জাটি।—বিডেশী ভালমানুষেরা টাহাডের ডবল ডাম ডেয় টঠাপি টাহাডের ডুগ্‌ঢে জল মিশ্রিট করে ; স্ত্রীগোয়ালারা টাহাডের কুটশিট গালি ডেয়, অন্যট্র শ্রীকৃষ্ণ টাহাডের মহিলাডের বষ্ট্রহরণ করা সট্বেও টাহাকে পূজা করে, ভক্টি করে। আমি কি ন্যায়হীন কার্য করিয়াছিলাম যে মডীয় গয়লার বৃড্‌ঢা ভগ্নী এবং যুবটী পট্‌নী একট্র হইয়া....” (আমি জামার খুঁট্‌ টানিলাম)....ভড্রমহিলা এবং ভড্রমহোডয়গণ, শ্রীকৃষ্ণের অট্যাচার অনলে বিণ্ডাবন প্লাবিট হইয়া গেল। ঘরে ঘরে ক্রণ্ডনের অট্টরোল উড্ডিট হইটে লাগিল। গোপীকারা বিরহানলে কাঁডিটে লাগিল।—শ্রীকৃষ্ণ টাহাডের সবাইকে কঠা ডিয়া কঠা রাখিটে পারিল না। টাহাড়ের

স্বামীরা ষ্ট্রীডের ব্যবহারে কাঁডিটে লাগিল। পুটনা নামক রাক্ষস-বটুকে শ্রীকৃষ্ণ লজেঞ্জেসের ন্যায় চুষিয়া মারিয়া ফেলিল বলিয়া টাহার বিঢবা-য়ুক্ট স্বামী এবং সণ্টানেরা কাঁডিটে লাগিল। হায়, হায়, সে কি ড়ৃশ্য। ভড্রমহিলা এবং ভড্রমহোডয়গণ, এরূপ ডুর্ডাণ্ট ছেলে ঠাকিলে কখন রাজ্য পরিচালনা করা সম্ভব হইটে পারে? এই নিমিট্ট কংশমহারাজ শ্রীকৃষ্ণকে হট্যা করিবার জন্য চেষ্টা করিটে লাগিলেন। এই শ্রীকৃষ্ণ কংশের কে ছিল? ভগ্নীরপুট্র, ভাগিনেয় ছিল; টঠাপি কি জন্য ইহাকে হট্যা করিটে চেষ্টা করিল?—কর্টব্যপরায়ণের জন্য। শ্রীকৃষ্ণ যডাপি আমাডের শ্বেটডিপে জন্মগ্রহণ করিট টাহা হইলে টট্রট্য লোকেরা কাহার পূজা করিট?—কংশমহারাজের পূজা করিট; যেহেটু টাহার অট্যণ্ট কর্টব্য-জ্ঞান প্রবল ছিল। সে টুলাডণ্ডের·একডিকে কর্টব্যপরায়ণটাকে বসাইল, অপর ডিকে ডগ্নীর পুট্র ভাগিনেয় শ্রীকৃষ্ণকে বসাইল; কর্টব্য-পরায়ণটা ভারী হইয়া গেল....”

বলা বাহুল্য লোকে সাহেবের বক্তৃতার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না. চারিদিকে যেমন সং তামাসা দেখিয়া বেড়াইতে ছিল সেইরূপ ভাবে এইখানেও আসিয়া খানিকটা দাঁড়াইয়া, একটু শুনিয়া, কতকটা রুচি অনুযায়ী অভিমত দিয়া আবার ভাসিয়া পড়িতেছিল;—কারণ এখানে সং-এর কোন অভাব তো ছিলই না, বরং বেশ একটু নূতনত্ব ছিল। অবশ্য এমনও অনেকজন ছিল যাহারা অনেকক্ষণ হইতে দাঁড়াইয়া মন দিয়া শুনিতেছিল। তাহাদের অনেকেই সেই জাতীয় ভাবুক বৈষ্ণব যাহারা কৃষ্ণনাম শুনিলেই—আত্মহারা হইয়া পড়ে। বাল্যলীলা কথন হইতেছে,—তাহাদের পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। যেখানে একটু আধটু বুঝিতে পারিতেছে—“আহা হা হা” করিয়া উঠিতেছে; যেখানে মোটেই বুঝিতে পারিতেছে না আরও আবেগের সহিত “ওহো

হো হো" করিয়া উঠিতেছে। অনেকে পাদ্রীর এ-সুমতি হইল কেন বুঝিতে পারিতেছে না, অনেকে প্রভুর ইচ্ছা বলিয়া মীমাংসা করিয়া লইয়াছে ; আবার অনেকে 'পাদ্রী' বলিয়া যে আলাদা একপ্রকার শ্রীকৃষ্ণের জীব আছে তাহার খবরও রাখে না, সুতরাং তত্ত্বের দিকে না গিয়া দিব্য বাল্যলীলা শুনিতেছে। আমার, যতটা সম্ভব ইহাদের দিকেও কান আছে, আবার পাদ্রীর কথাও শুনিতেছি এবং প্রয়োজন মত তাহার জামার খুঁটটা টানিয়া বক্তৃতার মোড়ও ফিরাইয়া চলিয়াছি।....পাদ্রী বলিয়া চলিয়াছে "কর্টব্যপরায়ণটা ভারী হইয়া গেল, টখন কংসমহারাজ মনষ্ঠ করিলেন শ্রীকৃষ্ণের আর নিষ্টার নাই। এবং ক্রোঢে ক্ষিপ্ট হইয়া আহার নিড্রা ট্যাগ করট গালে হাট্ দিয়া চিন্তা করিটে লাগিলেন...."

আমি এইবার একটু অন্যদিকে নজর দেওয়া দরকার মনে করিলাম, কারণ কিছু সময় পর্যন্ত কংশবধের কাহিনীটা একটানা চলিবে, এবং আমার জামা টানিবার দরকার হইবে না। সাহেব মাথা নাড়িয়া ঘুষি চালাইয়া কংশের সভাঘটিত ব্যাপার বর্ণনা করিতে লাগিল....।

কাক্রাটা সেই আধ-হাত তাঁবুর মধ্যে মহা আনন্দে নাক ডাকিয়া ঘুমাইতেছিল। আমি সাহেবের অজ্ঞাতসারে তাহার নিকটে গিয়া নিচু গলায় ডাক দিলাম—"জোসেফ।"

কোন উত্তর নাই। আমি ফিরিয়া দেখিলাম সাহেব খুব গর্জন করিয়া বক্তৃতা দিতেছে—আমার আওয়াজ তাহার কানে পঁহুছিবে না।—আর একটু জোরে ডাকিলাম—"জোসেফ। মিষ্টার জোসেফ !!"

উত্তর দিতে জোসেফের দায় পড়িয়া গিয়াছে। তখন বাধ্য হইয়া ভয়ে ভয়ে একটু ধাক্কা দিতে হইল। জোসেফ একেবারে হুড়মুড় করিয়া উঠিয়া বলিল—"What is it, fire ?"—(আগুন লেগেছে নাকি ?)

ঠেলা দিয়াই আমি দুই পা পিছাইয়া গিয়াছিলাম ; সেইখান হইতে উত্তর করিলাম—"না, সাহেব বক্তৃতা দিচ্ছেন। তোমার এই বইগুলা বিলি করবার হুকুম হ'য়েছে।"

জোসেফ সাহেবকে একটা গাল দিয়া বলিল—"সে আপদ তো চুকে গিয়েছিল, আবার কোথা থেকে এল ?"

আমি সেকথার উত্তর না দিয়া বলিলাম—"আর কিছু কিছু হিদেনদের দেবদেবীর ছবিও এইসঙ্গে আছে—ওদের আকর্ষণ করবার জন্য বিলি করে দিতে ব'লছেন।"

জোসেফ কিছু সন্দেহ করিল না ; গর্ গর্ করিতে করিতে পুঁটুলিটা তুলিয়া লইল। সাহেবের একেবারে সামনা সামনি যাহাতে না পড়ে সেই জন্য বলিয়া দিলাম—"আর দেখ, ঐ কোণটাতে গিয়ে বিলি ক'রতে আরম্ভ কর,—এদিকে আরম্ভ ক'রলে সাহেবের বক্তৃতায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে,—একে তোমার ওপর ভয়ানক চ'টে র'য়েছে...."

সাহেবকে কিছু বলিতে না পারিয়া জোসেফ সাহেবের প্রতিনিধি-স্বরূপ আমাকেই চোখ রাঙাইয়া বই, ছবির বস্তা লইয়া বিলি করিতে গেল।...."

সাহেবের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কংসবধ হইয়া গিয়াছে, তখন কালীয়-দমন চলিতেছে। ঠিক কোন্‌খানটা ব্যাখ্যান হইতেছে বোঝা গেল না, কারণ সাহেব গোবর্ধন গয়লার 'বুড্‌ঢা ভগ্নী' এবং 'যুবটী স্ত্রী'র কথা আবার পাড়িয়া বসিয়াছে, বলিতেছে—"ভদ্র- মহিলা এবং ভদ্রমহোডয়গণ, গয়লা অটি ভয়ঙ্কর জাটি ;—অড়াই স্টেশনে একটি 'গডার মা' নামক স্ত্রীলোকের সাক্ষাট হইল, সে নিশ্চই গয়লা, কারণ টাহার অঙ্গসঞ্চালন এবং ভাবা প্রয়োগ আমার ডুগ্‌ঢ বিক্রেট্র গোবর্ধন গয়লার বুড্‌ঢা ভগ্নী এবং যুবটী স্ত্রীর অনুরূপ, এবং সে নিজের

পটিকে—যাহাকে টোমরা পটি-ডেবটা বল টাহাকে ঝাঁটা মারিয়া, *আমাডের পবিট্র ঢর্ম হইটে ভ্রষ্ট করিয়াছে....*"

বেশি বেলাও নাই, তাহা ভিন্ন সাহেবের এইরূপ গয়লা প্রীতির নিদর্শনে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। আমি সাহেবের জামার খুঁট ধরিয়া একটু জোরে টান দিলাম। সাহেব এমন রুচিকর বিষয়টির মাঝখানে ক্রমাগতই বাধা পাইয়া বিরক্তভাবে আমার পানে তাকাইল। আমি মিনতির সহিত কহিলাম—'বলছিলাম, দুরাচার গয়লাদের সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য শেষ হ'য়ে গেলে নেমে আস্‌বেন কি ?—আমায়ও একটু বল্‌তে বলেছিলেন ; আর বেলা নেই, তাই মনে ক'রে দিলাম—"

সাহেবের বিরক্তিটা কাটিয়া গেল, বলিল—"টাহা হইলে এইবার—সমালোচনা করা উচিট—টুমি পারিবে কি ?—ডেবটাদের খুব গালাগালি ডিটে জান ?"

আমি উত্তর করিলাম—"নিজের প্রশংসা করাটা ক্রিশ্চানের পক্ষে শোভা পায় না সাহেব, তবে এইটুকু ব'লতে পারি, রেভারেণ্ড উড্‌ সাহেব এই জন্যই এই স্যুট্টা পুরস্কার দিয়েছিলেন—"

সাহেব আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—"তবে উঠ, there is a good boy (খাসা ছোক্‌রা)।—খুব গালাগালি ডিবে, [illegible] করিয়া-শ্রীকৃষ্ণকে এবং কালীকে। আমি অট্যণ্ট ক্লাণ্ট হইয়াছি ; একটু টাট্‌কা হইতে যাই...."সাহেব তাঁবুর দিকে চলিয়া গেল।

আমি বাক্সটার উপর দাঁড়াইয়া ঘরোয়া বাঙ্গলায় বলিতে লাগিলাম—"ভাই সব, পাদ্রী সাহেবের মুখে তোমরা বৃন্দাবনের সেই ননীচোরা আর গোপীমনোহরার ছেলেবেলার কীর্তির কথা শুনলে। এখন আমার ওপর সাহেবের ফরমাস হয়েছে তাঁকে গালাগালি দিতে হবে। বেশ, মনিবের হুকুম, আমি এই উঠেছি ; কিন্তু কি গালাগালি দোব তাঁকে ! তোমরা

সব একবার ব'লে দাও ভাই। সাহেব খোদ যাঁকে গাল দিতে উঠে হাল ছেড়ে দিলেন, তাঁকে বাঙ্গালীর ছেলে আমি, কি গালাগালি দোব? গাল দিতেই তো এসেছিলাম, কথা ছিল পাদ্রীও গাল দেবে, আমিও গাল দোব, আর ঐ যে তোমাদের সত্যনারাণ-কথা, মনসার-কথা আর দেবদেবীর ছবি বিলুচ্ছে ও-ও গাল দেবে, কিন্তু সে আর হোল কৈ? কোথা থেকে মা সরস্বতী পাদ্রীর ঠোঁটে এসে বসে' সব গোলমাল ক'রে দিলেন। গালাগাল দোব কি?—আজ কতদিন পরে যমুনাপুলিনবিহারী, গোবর্ধন-ধারী, কংশদলনকারী, বংশীধারীর নাম শুনে, প্রাণ আকুল হ'য়ে কেঁদে উঠছে; মনে হচ্ছে এই রাক্ষুসে ধর্ম আর রাক্ষুসে পোষাক ফেলে আবার কৌপীন পরে তাঁর কোলে ফিরে যাই—একবার প্রাণ খুলে "হরি হরি" বলে ডাকি....(সকলে—"হরি হরি বল")

—কিন্তু এ কলঙ্কিত শরীরকে কি তিনি আর স্পর্শ ক'রবেন? চৈতন্য অবতারে বটে মহাপাপী জগাই মাধাইকে কোল দিয়েছেন; কিন্তু আমি যে ভাই তাদের চেয়ে ঢের বেশি পাপী,—আমার কি গতি আছে?.... (ভিড়ের মধ্যে)—"অবশ্য আছে—খুব আছে—সাহেবের পর্যন্ত আছে—ঐ কেলেটারও আছে—একবার সবাই 'হরি হরি' বল"—একটি চশমা-পরা যুবক সন্ন্যাসী বলিল—"জয় স্বামী শ্রদ্ধানন্দের জয়।")....

পিছনে চাহিয়া দেখিলাম জোসেফ ফিরিয়া আসিয়াছে এবং তাহার সহিত সাহেবের বেশ জোর গলায় কথা কাটাকাটি চলিতেছে,—নিশ্চয়ই আমার বই এবং ছবি বিলির ব্যাপার লইয়া। আমি শ্রোতৃমণ্ডলের দিকে ফিরিয়া বলিলাম—"ভাই সব, আর মায়েরা, পাদ্রী সাহেব যে লোকটিকে এখন গালমন্দ দিচ্ছে তার নাম নিতাই মণ্ডল, জেতে চাঁড়াল; ওদের দমবাজিতে পড়ে কেরেস্তান হ'য়ে গেছে। কেরেস্তান হ'য়ে যে কী সুখ তা আমরা দুজনে হাড়ে হাড়ে বুঝছি,—যীশুর পদে প্রার্থনা করি

যেন শত্রুতেও কেরেস্তান না হয়। সমাজ থেকে বাড়ি থেকে তো তাড়িয়ে দিয়েইছে তার ওপর যাদের কথা শুনে মাথা মুড়িয়েছিলাম সেই পাদ্রীর ব্যবহারও দেখতে পাচ্ছ। আহা বেচারি নিতাই!—ধর্ম দিয়েছে বটে, কিন্তু বড়ই নাকি ঠাকুর দেবতাদের ভক্ত ছিল, তাই এখনও তাঁদের ভুলতে পারেনি। তাই যা পয়সা পায় তাই দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁদের ছবি, তাঁদের বই কিনে রাখে আর এই রকম একটু স্নবিধে পেলেই বিলি করে।—বলে—'আর জন্মে কতই না পাপ ক'রেছিলাম, এলফ্রেড দাদা, তাই এই দুর্দশা, তাই নাকাল করছেন মা কালী; এজন্মে একটুও তো পুণ্যি ক'রে রাখি'—সাহেব এসব মোটেই পছন্দ করে না, গালমন্দ দেয়, মারধোর করে—আহা কিন্তু ভক্তি এমনি পদার্থ!....তা ভাই সব, তোমাদের ধর্ম্ম কি এতই কঠোর যে আমাদের মত পাপীকে আর নিতাই মণ্ডলের মত ভক্তকে আবার তুলে নেবে না?"....

চশমাপরা যুবক সন্ন্যাসীর দল বলিয়া উঠিল—নিশ্চয় তুলে নোব—মাথায় ক'রে তুলে নোব—ভয় নেই ভাই নিতাই মণ্ডল, সমান জবাব দিয়ে যাও, আমরা আছি...."

* * * *

জোসেফের সঙ্গে বচসার ফলে এবং মাঝে মাঝে জনতার ক্রিশ্চান-বিরুদ্ধ চিৎকারে পাদ্রীর আমার সম্বন্ধে নিশ্চয়ই সন্দেহ লাগিয়া গিয়াছিল, কাছে আসিয়া আমায় ডাকিয়া ইংরাজিতে কহিল—"এলফ্রেড্ গোসা! —এসব কি?....আমিও ইংরাজিতে উত্তর দিলাম—যাহাতে জনতার মধ্যে কেহ বুঝিতে না পারে—"মাফ্ ক'রবেন, আমার কোন পুরুষেই কেহ গোসা নয়, আমার নাম শ্রীশ্যামাপদ ঘোষ, জাতিতে কুলীন অর্থাৎ উচ্চ শ্রেণীর কায়স্থ...." আরও কিছু কিছু পরিচয় দিলাম।

সাহেব নির্বাকভাবে মুখের পানে চাহিয়া রহিল—ঘৃণায়, কি রাগে

কিম্বা বিস্ময়ে ঠিক বুঝা গেল না ; বোধ হয় সব মিশান ছিল। একটু পরে মাথা নাড়িয়া ক্রোধভরে চিবাইয়া চিবাইয়া বাঙ্গলায় বলিল— "হুঁ—ঘোষ! ঘোষ!—আমি শুনিয়াছে ঘোষেরা কায়স্থ হয়, আবার গোবর্ধনের মটো গয়লাও হইয়া ঠাকে!...."

সাহেবের দারুণ নিরাশার মধ্যে এ সান্ত্বনাটুকুতে আমি আর আঘাত করিলাম না।

সোনার-কাঠি

ছেলেবেলায় পড়া পদ্যমালায় ভূতনাথের কাহিনীটি আপনাদের মনে আছে?

একদিন বিদ্যালয়ে ছুটির সময়
সার দিয়া দাঁড়াইল ছাত্র সমুদয়
তার মাঝে এক ছেলে নামে ভূতনাথ
হাতে কালি, মুখে কালি.... ....

তারপর পদ্যটা যথাযথ মনে পড়িতেছে না, তবে কাহিনীটি আমার প্রায়ই মনে পড়ে। যদি বলি ভুলিবার উপায় নাই তাহা হইলেও বিশেষ মিথ্যা বলা হয় না, কেননা, আমাদের ক্লাসেও একটি ভূতনাথ ছিল এবং তাহাকে লইয়া ছুটির পর পদ্য-বর্নিত অনুষ্ঠানটি প্রায়ই আচরিত হইত।

আমাদের অনুষ্ঠানের পৌরহিত্য করিতেন আমাদের থার্ড মাষ্টার অম্বিকাবাবু।....সব ছেলেদের সারবন্দী করিয়া দাঁড় করান হইত। ভূতনাথের কায়েমী ভূমিকা ছিল ননীগোপালের। তাহাকে দল হইতে

বাহির করিয়া আনিয়া থার্ড মাষ্টার তাহার রূপ ও বেশভূষা বর্ণনা করিতেন—একটু অদল বদল করিয়া পদ্যতেই বর্ণনাটা হইত, শেষ হইলে ছন্দেই প্রশ্ন করিতেন—“এর মত তোমরা কি কেহ হতে চাও?”

ঘর ফাটাইয়া শব্দ হইত—“না-না-না!”

এর পর কাহিনী অনুযায়ী ননীগোপালের—“লাজে মুখ হেঁট” হইবার কথা, কিন্তু এইখানে আসিয়া কাহিনীর সঙ্গে আর কোন মিল থাকিত না। ননীগোপাল সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচ দৃষ্টিতে, নিশ্চিন্তভাবে একটু হাসিয়া নাল-গড়ান মুখে একটা ঝোলটানা গোছের শব্দ করিয়া প্রশ্ন করিত—“এবার ছুটি মাষ্টার মশাই?”

ছুটি হইলে সঙ্গীদের হাসি, ঠাট্টা, গঞ্জনার মধ্যে মুখে অল্প একটু হাসি ফুটাইয়া নির্বিকার চিত্তে ভল্লুকের মতো থপ্-থপ্ করিতে করিতে বাড়ি চলিয়া যাইত।

অতবড় নোংরা আর কুৎসিৎ ছেলে আমাদের ক্লাসে কেন, সমস্ত বাংলা স্কুলটিতে ছিল না। গায়ের রং কালো, মাথাটা তেকোনা আর শরীরের অনুপাতে একটু বড়। মাথায় চুল থাকিত দুরকম—এক বাড়িতে বাড়িতে ময়লা, জটপড়া স্তবক ঘাড় আর মুখের খানিকটা আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে, আর এক খুব ছোট ছোট খোঁচা খোঁচা চুল—পাচ-চুলা করিয়া ছাঁটা—ঢেউয়ের আকারে মাথাটা আচ্ছন্ন করিয়া আছে। ননীগোপালের অভিভাবক ছিলেন তার দিদিমা, বাপ-মাও ছিল কিন্তু তাদেরও অভিভাবক ছিলেন ঐ দিদিমাই। ননীগোপালের নাপিতও তিনিই ছিলেন, মাস তিন চার পরে পরে নিজেই কাঁচি ধরিয়া চুলগুলা কাটিয়া দিতেন। শুধু ঘাড়ের কাছে এক গোছা টিকি ছাড়া থাকিত।.... বৃদ্ধা বড় সাত্ত্বিক প্রকৃতির ছিলেন।

নাওয়া সহ্য হইত না ননীগোপালের। সহ্য হইত না বলিয়াই জল

যাহাতে ভিতরে প্রবেশ না করে সেই উদ্দেশ্যে দিদিমা খুব তেল জবজবে করিয়া মাসে একবার নাওয়াইয়া ছাড়িয়া দিতেন। তাহার পর সমস্ত মাস সেই তেল বাইরের রং-বেরংএর ময়লা আহরণ করিয়া ননীগোপালের জামা-কাপড়ে সংক্রামিত হইত। জামা কাপড় মাসের মধ্যে দিন দু'য়েক ফরসা থাকিত, সেই দুইটা দিন ননীগোপালকে কেমন যেন অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইত, তাহার পর আবার ক্রমে ক্রমে ঠিক হইয়া যাইত।

সর্বসাকুল্যে ননীগোপাল পদ্মমালার ভূতনাথকেও এতদূর ছাড়াইয়া গিয়াছিল যে থার্ড মাষ্টার ওর নাম দিয়াছিলেন ভূতনাথের ভূত। ছেলেরা আর অতটা বলিতে পারিত না, পার্ট করার জন্য প্রথমে দিন কতক নাম দাঁড়াইল ভূতনাথ, তাহার পর সেটা 'ভূতো' হইয়া ঐতেই পাকা হইয়া রহিল।

শুধু নাম কেন?—রং, রূপ, স্বভাব, সজ্জা—কোনটাই বা পাকা না ছিল ননীগোপালের তা তো মনে পড়ে না। অম্বিকাবাবুর নিত্য গঞ্জনাতেও কোনখানে এতটুকু পরিবর্তন ঘটাইতে পারে নাই। নিম্নতম হইতে উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত এক ভাবে কাটাইয়া ননীগোপাল হাই-স্কুলে গিয়া আমাদের সঙ্গে নাম লিখাইল।

হাই-স্কুলের হেডমাষ্টার স্বয়ং অখিলবাবুর এসব দিকে একটু নজর ছিল; কিন্তু অনেক ছেলে, তায় আমাদের ক্লাসের সঙ্গে তাঁহার রুটিন-গত কোন সম্বন্ধ না থাকায় ননীগোপালের নাম-ডাক কানে পহুঁছিতে একটু বিলম্ব হইল। তাহার পর একদিন টিফিন পিরিয়ডে হঠাৎ ননীগোপালের হেড-মাষ্টারের আফিসে ডাক পড়িল। আমরা সবাই ভিড় করিয়া আফিসের বাহিরে দাঁড়াইলাম। হেডমাষ্টার বিস্মিত-দৃষ্টিতে ননীগোপালের পানে চাহিয়া দুইতিনবার তাহাকে আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া বলিলেন —"তুমি এই স্কুলে পড় অথচ এতদিন আমার চোখে পড় নি যে?"

ননীগোপাল তাঁহার পানে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। হেডপণ্ডিত মশাই একটু রসিক প্রকৃতির লোক ছিলেন, বলিলেন—"সে আপনার চোখের দোষ, ও তো লাখের মধ্যে চিনে নেবার ছেলে।"

"তুমি এত নোংরা কেন?"

ননীগোপাল একবার আড়চোখে নিজের পানে চাহিয়া লইয়া চুপ করিয়া রহিল।

হেডমাষ্টার বলিলেন—"তোমার নাম কি?"

"ননীগোপাল।"—নামটা বলার সঙ্গে সঙ্গে ঝোল-টানার শব্দ করিল।

ননীর পাড়ার একটি ছোট ছেলে হাই-স্কুলের নিম্নশ্রেণীতে পড়িত, ভিড়ের আগে একটু ঠেলিয়া আসিয়া বলিল—"ওর ভালো নাম ভূতো, স্যার।"

অন্যসময় হইলে ছেলেটি বোধ হয় ধমক খাইত, কিন্তু এক্ষেত্রে হেড-মাষ্টার কিছু না বলিয়া ননীর মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন—"ঐ দেখ, তোমার আসল নাম লোপ পেয়ে গেছে। 'ভূতো' নামটা পছন্দ তোমার?"

সেই ঝোল-টানা শব্দটার ভয়ে সেকেণ্ড মাষ্টার বলিলেন "তুমি মাথা নেড়েই উত্তর দাও বাপু।"

ননীগোপাল মাথা নাড়িয়া জানাইল—না পছন্দ নয়।

হেডমাষ্টার বলিলেন—"সুখী হলাম। এ স্কুলে তোমায় আজ থেকে যে ভূতো বলে ডাকবে তার সাজা হবে; বুঝলে?"

ননীগোপাল একবার সেকেণ্ড মাষ্টারের দিকে চাহিয়া লইয়া আবার ঘাড় নাড়িয়া জানাইল বুঝিয়াছে, তবে বুঝিয়া যে আনন্দিতই হইয়াছে মুখের ভাবে এমন কিছু প্রকাশ পাইল না।

হেডমাষ্টার বলিলেন—"কেন তা বোধ হয় টের পেয়েছ?—ননী-

গোপাল হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের নাম, তুমি তাঁর মতনই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবার চেষ্টা করবে আজ থেকে....”

ননীগোপাল হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের নাম , তুমি তাঁর মতনই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবার চেষ্টা করবে আজ থেকে···

পণ্ডিত মশাই বলিলেন—"তা বলে গোষ্ঠ থেকে যখন ফিরতেন তখনকার মতন নয়।"

হেডমাষ্টার বলিলেন—"যাও, কাল আবার দেখা করবে প্রথম পিরিয়াডে।"

পরদিন হইতেই হেডমাষ্টার নিরাশ হইতে আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণ নামের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য ননীগোপাল স্নান করিয়া পরিষ্কার হইয়া আসিল,—ঘাড়, কপাল, কানের দুইধার দিয়া ময়লা তেলের ধারা গড়াইতেছে; উপর হাত হইতে গড়াইয়া নিচের হাতে কাদার মতো তেল জমা হইয়াছে, কাপড়-জামার প্রান্তগুলি তৈলসিক্ত হইয়া হলদেটে হইয়া গেছে। অকালে স্নান করার জন্য শদির মতো হইয়াছে, একটা শড়-শড়, ঘড়-ঘড় শব্দ সঙ্গে করিয়া ননীগোপাল কৌতূহলী-পরিবৃত হইয়া হেডমাষ্টারের ঘরে উপস্থিত হইল।

সেকেণ্ড পণ্ডিত ছিলেন কণ্ঠিধারী বৈষ্ণব; হেডপণ্ডিত একটিপ নস্য লইতে লইতে তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—"গুপীবাবু, যমুনা থেকে চান করে উঠলে কেমন চেহারাটা হোত একবার দেখে নিন।"

হেডমাষ্টার মশাই স্থির দৃষ্টিতে একটু দেখিয়া লইয়া খানিকক্ষণ মাথা নামাইয়া চুপ করিয়া রহিলেন; বোধ হয় ঘৃণা, রাগ এবং পরাভবের নৈরাশ্যটা দমন করিয়া লইলেন, তাহারপর মাথাটা তুলিয়া শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—"সাবান বলে একরকম জিনিস হয়—জানো?"

সেকেণ্ড মাষ্টার বলিলেন—"ঘাড় নেড়েই বোল বাপু, আজকে আবার বেশি রসস্থ আছো।"

ননীগোপাল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—জানে।

হেডমাষ্টার বলিলেন—"কাল থেকে তাই মেখে আসবে।"

সেকেণ্ড মাষ্টার বলিলেন—"তেলে-তেলে ওয়াটারপ্রুফ করে নিয়ে

ওকে নাইয়েছে তাইতেই ঘড়-ঘড়ানি শুনে হৃদ্‌কম্প হয়, সাবান মাখালে ওর সান্নিপাতিক দাঁড়াবে মশাই।”

হেডমাষ্টার একটু যেন দাঁতে-দাঁত চাপিয়াই বলিলেন—“তাই ওর ওষুধ।”

ননীগোপালকে বলিলেন—“খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে, এটা হাই-স্কুল, মনে থাকে যেন। যাও, আবার ডেকে পাঠালে আসবে।”

নিরাশ হইলেন বটে কিন্তু হেডমাষ্টার সহজে ছাড়িলেন না। দুই-বৎসর ধরিয়া সমানে পরীক্ষা করিয়া চলিলেন—কিছুদিন ভালো কথার উপর—বুঝাইয়া সুজাইয়া, পরামর্শ দিয়া, হাইজিনের নানাবিধ চার্ট দেখাইয়া, ফল না পাওয়ায় কিছুদিন সাজা দিয়া।—প্রত্যহ আসিয়া ননীগোপালকে বেঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত। নির্বিকার-ভাবে—একটা শ্যাওলা-ছাতা-পড়া স্তম্ভের মতোই দাঁড়াইয়া থাকিত ননীগোপাল : অতি অপরিচ্ছন্ন ছেলের ক্রমে যে একটা মূঢ়তা আসিয়া যায়—সেই মূঢ়তার ওদিক হইতে সে যেন বুঝিতেই পারিত না যে তাহাকে লইয়া এদিকে সমস্ত স্কুলজীবন ব্যাপিয়া একটা ব্যাপার চলিতেছে। নিজের নরকের-স্বর্গে নির্বিকল্প পরিতোষের সঙ্গে ননী-গোপাল দশমশ্রেণী পর্য্যন্ত কাটাইয়া দিল।

এই সময় হেডমাষ্টার মশাই অন্যত্র অপেক্ষাকৃত ভালো চাকরি লইয়া চলিয়া গেলেন। চার্জ দিয়া যাইবার সময় নূতন হেডমাষ্টার অরুণবাবুকে বলিয়া গেলেন—“নিজের মুখে বলতে নেই, তবে দশবছর ছিলাম, স্কুলটাতে অনেক সংশোধন করেছি, অনেক নতুন কিছুও সৃষ্টি করেছি,—অন্তত এমন কিছু মনে পড়ে না যাতে আমি হাত দিয়ে অকৃতকার্য হয়েছি ; খালি একজায়গায় আমি হার মেনে যাচ্ছি অরুণবাবু, দেখুন যদি আপনার দ্বারা কিছু হয়।”

ননীগোপালকে ডাকাইয়া আনিয়া আত্যন্ত ইতিহাস সহ পরিচিত করিয়া দিলেন।

[২]

নূতন হেডমাষ্টার একরকম সত্ত পাশ করিয়াই চাকরি লইয়াছেন; বয়স কম, খুব উৎসাহী। তাঁহার সবচেয়ে বিশেষত্ব ছিল, সব জিনিসই একটা নূতন পদ্ধতিতে করিবার চেষ্টা করিতেন।....আমরা তখন একাদশ শ্রেণীর ছাত্র, অর্থাৎ সে সময়ের গণনা অনুযায়ী, ম্যাট্রিকুলেশন দিতে আর মাত্র দুইবৎসর বাকি,—হেডমাষ্টার নিঃসঙ্কোচেই আমাদের সঙ্গে নানা বিষয় আলোচনা করিতেন।

ননীগোপালকে তিনি না রাম না গঙ্গা—কিছুই বলিলেন না। শুধু এইটুকু দেখা গেল ও ক্লাসের মধ্যে যেমন কতকটা অপাংক্তেয় হইয়াছিল, সে ভাবটা আর থাকিতে দিলেন না।

একদিন ননীগোপালের অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া হেডমাষ্টার মহাশয় ক্লাসে পাঠ বন্ধ রাখিয়া বেশ খানিকটা লেকচার দিলেন। বলিলেন—"তোমরা সোনার কাঠি বলে রূপকথায় একটা কথা শুনেছ। জিনিসটার প্রত্যক্ষ অর্থ যাই থাক, একটা এ্যালিগরিকাল তাৎপর্য আছে। সোনার-কাঠি কি করলে, না, সুপ্ত রাজকুমার কিম্বা সুপ্ত রাজকুমারীকে জাগিয়ে দিয়ে একটা নূতন জগতের সম্মুখীন করে দিলে। এ্যালিগরির দিক দিয়ে দেখতে গেলে সোনার কাঠি সেই যাদু-স্পর্শ, যা সুপ্ত কোন এক শক্তিকে জাগিয়ে দেয়। অনেক সময় শক্তি প্রকটই থাকে—অবশ্য একেবারে যে শৈশবের যুগ থেকেই প্রকট থাকে তা নয়, তবে মনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেটা আপনি-আপনিই বা অল্প আয়াসেই

প্রকট হয়ে পড়ে,—যেমন ধর তোমাদের সকলের মধ্যে যে সৌন্দর্য বা শিষ্টতা জ্ঞান আছে—বোধ হয় দু'একজনের মধ্যে সাহিত্য-প্রবণতাও আছে; কিন্তু অনেকের শক্তি আবার এত প্রচ্ছন্ন যে বোঝবার জো থাকে না, অনেকটা ছাই ঢাকা আগুনের মতন। এই সবের জন্যে সোনার কাঠির দরকার হয়, তাদের মনটাকে এমন কিছু দিয়ে স্পর্শ করতে হয় যার দ্বারা মনের সেই বিশেষ শক্তি হঠাৎ চকিত হয়ে জেগে উঠতে পারে। এই যে স্পর্শ এটা আনন্দমূলকও হতে পারে আবার নিরানন্দমূলকও হতে পারে—তবে পরিণামটা আনন্দই, কেনন না একটা শুভশক্তির বিকাশ তো?....আমি তোমাদের সহপাঠী ননীগোপালকে লক্ষ্য করেই যে তুলেছি কথাটা এটা বুঝতেই পেরেছ। ওর বাইরেটা অমন বলে মনে করাই শক্ত যে ওর মধ্যেও সৌন্দর্যজ্ঞান বলে একটা জিনিস আছে; অথচ তা আছেই কেননা ওটা মানুষের কমন্ হেরিটেজ —প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ওটা থাকবেই থাকবে।

তোমাদের থেকে তফাৎ এই হয়েছে যে ওর ও-জ্ঞানটার স্বাভাবিক বিকাশ হোল না, তাই ওর দরকার সোনার কাঠির স্পর্শ।....উইথ্ অল্ রেসপেক্টস্ টু দেম্—বাঙ্গলা স্কুলের থার্ড মাষ্টার আর তোমাদের পূর্বতন হেডমাষ্টার মশাই দু'জনেই যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তা ছিল ভুল পদ্ধতি—অর্থাৎ তার মধ্যে কোনটাই ঠিক সেই সোনার কাঠি নয় যা ননীগোপালের দরকার! কাজেই তাঁরা ফেল করলেন।”

একাদশ শ্রেণীর ছাত্র সব আমরা, লায়েক হইয়াছি, সবারই নভেল-নাটকে, বদহজমী—দু'একজন আবার নিজেরাই গল্প-নভেলে হাত দিয়াছি; সোনার কাঠি সম্বন্ধে একটা যে সরস প্রশ্ন মুখে ঠেলিয়া আসিতেছিল, প্রকাশ করিবার উপায় না থাকিলেও সেটা নিশ্চয় আমাদের দৃষ্টিতে একটা উদ্বেগ আর চাঞ্চল্য আনিয়া থাকিবে; সেটুকু হেডমাষ্টারের

দৃষ্টি এড়াইল না, তবে সৌভাগ্যক্রমে তিনি ভিতরকার কথা ধরিতে পারিলেন না—নূতন কলেজ-ছাড়া মানুষ, কতটা যে লায়েক হইয়াছি সেটা আর আন্দাজ করিতে পারিলেন না।...বলিলেন—"বুঝেছি, অর্থাৎ —তোমরা জানতে চাও সে সোনার কাঠিটা কি হতে পারে। আমি চিন্তা করছি, এখনও ঠিক করতে পারিনি। তবে আমি ঠিক করবই, আর ননীগোপালের মধ্যে কি অদ্ভুত সৌন্দর্য্যজ্ঞান আছে তা দেখিয়ে আমি সমস্ত স্কুলকে বিস্মিত আর স্তম্ভিত করে দেব একদিন।"

সেইদিনই সমবেদনা এবং সহকারিতার উপর আর একটা লেকচার দিয়া হেডমাষ্টার ননীগোপালকে দূরে সরাইয়া না রাখিয়া আমাদের মধ্যে টানিয়া লইতে উপদেশ দিলেন। একটু অলঙ্কারের অবতারণা করিয়া বলিলেন—"ওকে তোমাদের বুকের কাছে টেনে নিতে হবে।"...পরদিন হইতে ননীগোপাল প্রথম বেঞ্চের ঠিক মাঝখানটিতে জায়গা পাইল। আমার কোন রকমে, নাকচোখ বুজিয়া, আর এ দিকে বুকের কাছে স্থান দেওয়ার জন্য বুকে দম আটকাইয়া রাখিয়া হেডমাষ্টার-কথিত সোনার কাঠির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

কয়েকদিনের মধ্যেই হাব-ভাবে বোঝা গেল হেডমাষ্টার পাইয়াছেন সোনার কাঠির সন্ধান। একদিন আমরা কয়জন একটু আবদার করিয়া ধরিলাম—"স্যার জিনিসটা কি আমাদের বলতে হবে।"

বলিলেন—"বলতাম, কিন্তু তাতে জিনিসটার আকস্মিকতা নষ্ট হয়ে যাবে।......দুদিন পরেই তোমরা টের পাবে।"

দিন চারেক পরে আমাদের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ ছিল। তাহার আগের দিন ক্লাসেই হেডমাষ্টার আমাদেরজীবনের সবচেয়ে আশ্চর্য সমাচার শুনাইলেন, বলিলেন, "তোমরা শুনে আনন্দিত হবে, তোমাদের ক্লাসের পরিচ্ছন্নতার জন্য পুরস্কার এবার শ্রীমান ননীগোপালকে দেওয়া হবে।

একে তাঁহার জীবনের প্রথম কাজ, তায় একটা ছেলেকে একেবারে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতেছেন, হেডমাষ্টার বেশ আড়ম্বরের সহিত আয়োজনটা করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে অনুরোধ করিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করাইলেন। অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিলেন। অম্বিকাবাবুকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া সামনের একখানি চেয়ারে বসাইলেন।

ননীগোপালকে দেখিয়া দেখিয়া অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু সেদিন যা রূপ দেখিয়াছিলাম, তাহা জীবনে আর ভুলিব না।

জুতাটার অঙ্গে এই প্রথম ব্রস্কো পড়িয়াছে—শিশি থেকে যেটুকু বাহির করিয়াছিল তাহার অর্ধেকটা থাবলা-থাবলা করিয়া জুতায়, অর্ধেকটা ননীগোপলের দুইহাতে। ফিতার বালাই ছিল না, বেশ ছিল একরকম; পুরস্কারের উপযোগী হইবার জন্য খুঁজিয়া পাতিয়া একখানা কোথা থেকে জোগাড় করিয়াছে, বাকি একটি জুতায় লাল কাপড়ের পাড়। কাপড় আর জামা ফসা পরিয়াছে, কিন্তু তাহা হইতে এমন একটা ভ্যাপসানি গন্ধ বাহির হইতেছে যে স্পষ্ট বোঝা যায় এক দুর্গা-ষষ্ঠীর দিন ছাড়া আর সেগুলো কখনও আলো বাতাসের মুখ দেখে নাই। গায়ে আর এবার তেল মাখে নাই, হাত পা মুখে এত খড়ি উঠিতেছে, মনে হয় প্রাইজের কথা শোনার পর হইতে সাবান মাখা ছাড়া ননী-গোপাল আর কোন কাজই করে নাই।

সবচেয়ে দেখিবার জিনিস হইয়াছে চুল, দিদিমার কাঁচিতে সমস্ত মাথাটি হইয়াছে একটি লাঙ্গল-দেওয়া ক্ষেতের মতো—একটা চুলের লাইন, তাহার পরই একটা গভীর রেখা, আবার চুলের লাইন, আবার রেখা—এই ভাব। জামার উপর ঘাড়ের টিকিটা কুণ্ডলী পাকাইয়া স্প্রিঙের মতো দুলিতেছে।

ননীগোপাল সময়ে আসিতে পারে নাই, যখন তাহার নাম ধরিয়া দ্বিতীয়বার ডাক হইল তখন দেখা গেল হলের শেষ প্রান্তে সে সবে প্রবেশ করিয়াছে। অত্যধিক সাবান মাখার জন্য সর্দি আরও বেশি হইয়াছে, শড়-শড়, ঘড়-ঘড় শব্দ করিতে করিতে ম্যাজিষ্ট্রেটের হাত হইতে পরিচ্ছন্নতার পুরস্কার লইয়া ফিরিয়া গেল।

অতগুলো লোকের চোখে এমন উগ্র বিস্ময়ের ভাব আমি আর দেখি নাই, অবশ্য এক হেডমাষ্টার ছাড়া।

যতদিন ছিলেন স্কুলে ননীগোপালের প্রসঙ্গ আর মুখে আনেন নাই।

স্কুল জীবন শেষ হওয়ার সঙ্গে বাল্যসঙ্গীদের সহিত প্রায় ছাড়াছাড়ি হইয়া যায়। ননীগোপালের সহিত মাত্র আর একবার আমার দেখা হইয়াছিল—আমরা উভয়েই তখন বি. এ থার্ড ইয়ারে পড়িতেছি, আমি কলিকাতায়, ননীগোপাল একটা মফঃস্বল কলেজে। অম্বিকাবাবুর সেই ভূতনাথের ভূত। হয় তো কাপড় জামাটা ধোপার বাড়ির মুখ দু'একবার বেশি দেখে, মাথাটাও নিশ্চয় দিদিমার কাঁচির নাগালের বাহিরে উঠিয়াছে ; কিন্তু সেই অস্নাত শরীর, সেই ধূলাময়লার ছোপ, সেই একটা ভ্যাপসা গন্ধ, সেই ঘড়-ঘড়ে তরল আওয়াজ, তাহার উপর অপরিচ্ছন্নতার যে অনিবার্য পরিণাম—স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া আসিয়াছে, মুখের হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তাহার উপর আবার দাড়ি গোঁফের আবির্ভাব, পাত্র বুঝিয়া তাহারা যেন আগেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। রোগা শরীরে মাথার সেই তে-এঁটে ভাবটা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

অনেকদিন পরে বাল্যবন্ধুর সহিত দেখা, কিন্তু সত্য বলিতে কি, যে আধঘণ্টাটাক ছিলাম যেন দম আটকাইয়া গিয়াছিল। একবার জিজ্ঞাসাও করিলাম—"দিদিমা এখনও বেঁচে আছে রে ননী?"

এমনি তো যান্ত্রিক প্রথায় পাশ করিয়া যাইতেছে, কিন্তু কথাবার্তায় সেই যে মূঢ়তার ভাব সেটা ঘোচে তো নাই-ই, বরং যেন বাড়িয়া গিয়াছে। সেই ঝোলটানা শব্দের সঙ্গে হাসিতে হাসিতে ননীগোপাল বলিল—"হি-হি-হি, কেমন জিগ্যেস করছে শৈলেন।....দিদিমা বেঁচে আছে ননী ?....হি-হি-হি....মা বাবা বেঁচে আছে কিনা জিগ্যেস করছে না—দিদিমা বেঁচে আছে....হি-হি-হি....হ্যাঁ, সে বুড়ী এখনও কুলগাছ আগলে বসে আছে...."

গা ঘিন ঘিন করিতে লাগিল ; মনে মনে কুলগাছের শিরে বজ্রপাত কামনা করিয়া চলিয়া আসিলাম।

আর দেখা হয় নাই। বছর দু'য়েক পরে একবার খবর পাইলাম ননীগোপালের বিবাহ হইতেছে, এবার মাত্র খবরটা শুনিয়াই, কেন জানি না, গাটা আবার ঘিন ঘিন করিয়া উঠিল।

মাস খানেক পরে শুনিলাম—না, হয় নাই। সব ঠিক ঠাক হইয়া গিয়াছিল, তাহার পর ননীগোপাল কলেজ হোষ্টেল থেকে দুইজন সঙ্গী লইয়া মেয়ে দেখিতে গিয়াছিল।....তাহার পরই কথাবার্তা ভাঙিয়া যায়। ওরাও যে ছেলে দেখিয়া ফেলিবে ননীগোপাল অতটা ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই।

[৩]

ইহার অল্পাধিক বৎসরখানেক পরে আজ আবার ননীগোপালের সহিত দেখা হইয়াছিল। তাহার নিকট হইতে আসিয়াই কাহিনীটি লিখিতে বসিয়াছি।

নূতন চাকরি লইয়া এই সহরে সবে আসিয়াছি। একদিন আমার

ষ্টেনোগ্রাফার চিঠি দস্তখত করাইতে করাইতে বলিল—"স্যার, ননীবাবুকে আপনি চেনেন ?"

প্রশ্ন করিলাম—"কোন্ ননীবাবু ?"

পরিচয়ে বুঝিলাম—অম্বিকাবাবুর ভূতনাথ। কিছুমাত্র উৎসাহের ভাব না দেখাইয়া বলিলাম—"চিনি।"

"আপনাকে একবার ডেকেছেন।"

"হুঁ"—বলিয়া চিঠির বিষয় লইয়া একটা অন্য কথা পাড়িলাম। এবার বিবাহের কথা নয়, তবুও শরীরটা কেমন ঘিন ঘিন করিয়া উঠিল। কোথায় থাকে ননী, কি বৃত্তান্ত আর জিজ্ঞাসা করিলাম না। বোধ হয় গা করিলাম না দেখিয়া ষ্টেনোগ্রাফারও আর কথাটা সেদিন তুলিল না।

তিন চার দিন পরে আবার দস্তখত করাইতে করাইতে বলিল—"স্যার, ননীবাবু আপনাকে একবার ডেকেছেন।"

ননীর সঙ্গে আমার পরিচয়ের কথাটা যে এই ছোকরা জানে এটা আমার তেমন ভাল লাগে নাই, ননী বোধ হয় তাহার সেই ঝোলটানা হাসির সহিত বলিয়াও থাকিবে আমরা এক ক্লাসে পড়িতাম এক সময়, হয়ত বাড়াইয়া এও বলিয়া থাকিবে—খুব অন্তরঙ্গতা ছিল, দুজনে এক সঙ্গে উঠা বসা বেড়ান ইত্যাদি।....একটু গম্ভীরভাবেই প্রশ্ন করিলাম,—"যেতে বলেছে মানে ?"

ষ্টেনোগ্রাফার অতটা বুঝিল না। বলিল—"আমায় বলতে বললেন, তিনি নিজেই আসতেন তবে ডিউটির টাইম বড় বিশ্রী, একেবারে রাত আটটার পরে ফেরেন, এ রবিবারে আবার একজনের হয়ে কাজ করবেন ....তার ওপর বাসাটাও এখান থেকে অনেক দূরও কিনা...."

আমার কানে লাগিয়াছিল—'রাত আটটার পরে ফেরেন।'....যেমন

অপরিচ্ছন্ন জীবন তেমনি কাজও জুটিয়াছে চমৎকার! কোথায় করে কাজ সেটা জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্তি হইল না।

প্রশ্নটা করিয়া কিন্তু মনে মনে একটু অনুতপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, ঠিক বন্ধু না হোক, সহপাঠী তো বটে। এ রকম আগ্রহের পর একবার দেখাটা না-করা ভাল দেখায় না। এ ছোকরাই বা কি মনে করিবে?

ঠিকানাটা লইলাম, বলিলাম—"বলে দিও আমি বাড়িতেই আসব, আজ আর হবে না, কাল রাত্রি আটটার সময়; ওকে কোন ব্যবস্থা করে একটু সকাল সকাল ফিরতে বলো।"

বিস্মিত করাই যেন ননীগোপালের জীবনের ধর্ম, কিন্তু এবারে যা বিস্মিত করিল—একেবারে চূড়ান্ত।

বাড়িটা খুঁজিয়া বাহির করিতে বেশ একটু দেরি হইল। ঠিক খুঁজিয়া বাহির করিতে বলাটা ভুল হয়, ঠিকানায় পৌঁছিয়াই বাড়িটা পাইলাম, কিন্তু বিশ্বাস করিতে না পারায় তাহারই সামনে দিয়া দুই তিনবার ঘুরিয়া গেলাম; তৃতীয়বার যখন ঘুরিয়া আসিয়াছি দেখি একটা প্যাণ্ট আর শার্ট পরা ভদ্রলোক বারান্দায় বসিয়া সিগারেট টানিতেছে। রাস্তাটায় আরও দুইজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের বাসা দেখিয়া বুঝিলাম ভদ্রলোক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানই; উঠিয়া গিয়া ইংরাজিতেই বলিলাম—"মাফ করবেন, আপনি এ বাসায় কবে এসেছেন জানতে পারি কি?"

বারান্দায় নীলরঙের শেড দেওয়া নরম বিদ্যুতের বাতি, শেডের ছায়াটা ভদ্রলোকের উপর আসিয়া পড়িয়াছে; ঠোঁটে সিগারেট ধরাইয়া ইংরাজিতেই প্রশ্ন করিলেন—"কেন জানতে পারি কি?"

বাড়িটার উপর আর একবার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি বুলাইতে বুলাইতে বলিলাম —"মানে,—খবর পেলাম....ভুল খবর বলেই মনে হচ্ছে এখন....খবর

পেলাম যে ননীগোপাল বলে এক ভদ্রলোক এই বাড়িতে····আপনার আসার আগে····”

একটা বারান্দা-ফাটান হাসিতে সচকিত হইয়া প্রশ্নকারীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, হাসিরও বিরাম নাই।···· বাক্‌স্ফূর্তি হইলে প্রশ্ন করিলাম—“ননীগোপাল না!”

“বোস্” বলিয়া ননীগোপাল আমার ঘাড়ে একটি হাত দিয়া একটা উইকারের গদি-আঁটা চেয়ারে বসাইয়া নিজেও বসিল। তারপর মাঝে মাঝে হাসির ছুট দিয়া খানিকটা অনর্গল বকিয়া গেল। “আমি জানতাম এই রকম হবে। বাড়ি ঢুকেই চাকরটাকে বারান্দায় বসিয়ে বলে দিলাম—‘আমি এখুনি কাপড় ছেড়ে আসছি, কোন বাবু যদি আসে তো বসিয়ে খবর দিবি আমায়’····জুতো খুলে স্লিপারটা পায়ে দিয়ে টাইয়ের নট্‌টা খুলতে খুলতে মনে হোল, না নিজেই গিয়ে বসি বাইরে—সে বোধ হয় বারান্দার টেবিলে, চেয়ার ফুলের টব দেখেই মানে মানে সরে পড়বে।···· যা ভেবেছি ঠিক তাই.—এসে বসেছি, আর তুইও যেন নিশিতে পাওয়ার মতন ফ্যাল ফ্যাল করে চাইতে চাইতে····উঃ! সত্যি, তোর অবস্থাটা মনে হচ্ছে আর····”

উচ্চ প্রাণ খোলা হাসিতে আবার সমস্ত জায়গাটা চকিত করিয়া তুলিল।

বিমূঢ়ভাবেই চাহিয়া আছি, হাসিতে একটু যোগ দিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু ঠোঁটে মিলাইয়া মিলাইয়া যাইতেছে····ননীগোপালই!— পরিষ্কার করিয়া কামান ভরাট, নিটোল মুখ, একটু বোধ হয় বেশি খর্ব করিয়াই ছাঁটান চুলে পরিষ্কার টেড়ি, গায়ে ধপ-ধপে সিল্কটুইলের হাফ শার্ট, ম্যাটেড বেল্ট দিয়া আঁটা শার্টিনটুইলের ধপ-ধপে প্যাণ্ট।····তেল-আর ভাল সাবানের সামঞ্জস্যে গায়ের রংটা কালো হইয়াও এত স্নিগ্ধ যে চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে।····

ননীগোপাল বলিয়া যাইতেছে—"আমিও বেশি দিন এখানে আসিনি। গভর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেণ্টে চাকরিটা পেয়ে এইখানে প্রথম পোষ্টিং, তার আগে····এই দেখ বোকামি! নিজের কথা বলতেই····তুই সিগারেট খাস তো?····নে ধরা····"

নিজেই দেশলাই জ্বালিয়া ধরাইয়া দিল। নিজের সিগারেটে দুটো দ্রুত টান দিয়া আবার বলিতে লাগিল—"সত্যি তোকে দেখে এত আনন্দ হয়েছে শৈলেন—কোনটে আগে বলব কোনটে পরে, গোলমাল করে ফেলছি।····এর মধ্যে অনেক পরিবর্তন হ'য়ে গেল ভাই জীবনে····সে সব বোধ হয় বিশ্বাসই করতে পারবি নি····রোম্যান্স!—অকস্মাৎ!—অপ্রত্যাশিত ভাবে! ননের বরাতে রোম্যান্স্!—কুড্ ইউ থিঙ্ক্?"

বিমূঢ় ভাবটা কোনমতেই কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছি না; ননীগোপালের দিকে চাহিয়া যান্ত্রিকভাবে আস্তে আস্তে সিগারেট টানিয়া যাইতেছি।····ভাবিতেছি—কোথায় গেল সেই ঘড়-ঘড়ানি শড়-শড়ানি; প্রতি-কথায় সেই ঝোলটানা শব্দ? কি করিয়াই বা গেল? আর কবেই বা গেল?—এই তো এক বছরের আগে পর্যন্ত খবর ননীগোপাল একেবারে আ-ভাঙাই রহিয়াছে····আর এই কথার স্রোত মুখ দিয়া একটা বাহির করিতে যে-ননীগোপাল হিম-শিম খাইয়া যাইত!

ননীগোপাল বোধ হয় নিজের ঝোঁকেই বলিয়া যাইতেছিল, আমার অবস্থাটা অতটা বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করে নাই। একবার হঠাৎ থামিয়া বলিল, ওরে বুঝেছি, তুই ছোঁড়া বিশ্বাসই করতে পারছিস না এখনও—অম্বিকাবাবুর ভূতো কি করে অখিলবাবুর শ্রীকৃষ্ণ হয়ে উঠল।"

হাসিয়া উঠিয়াই ভিতর বাড়ির দিকে চাহিয়া বলিল, "ওগো তোমাকে একবার শীগগির আসতে হবে চা টা'এর হ্যাঙ্গাম ঠাকুরের হাতে ছেড়ে····

সোনার-কাঠি না দেখলে ও বিশ্বাস করতে পারছে না যে....নাঃ উঠতে হোল....

উঠিয়া অগ্রসর হইবার আগেই একটি তরুণী ধীরে ধীরে আসিয়া আমায় নমস্কার করিল। খুব সুন্দর না হইলেও খুব শ্রীমন্ত, বয়স সতের-আঠার হইবে, সাজসজ্জার বাহুল্য নাই, তবে রুচি যে মার্জিত,—সেটা শুধু কাপড়ের পারটুকুর কথা ধরিলেও বোঝা যায়।

সবচেয়ে চমৎকার সপ্রতিভ মুক্ত ভাবটি। আড়ষ্ট ভাবটা অল্প সময়েই কাটিয়া গিয়া আমাদের আলাপ বহুকাল পরিচিতের মতোই জমিয়া উঠিল।....ননীগোপাল একবার বলিল,—আমার বৌকে তা বলে বেহায়া ভাবিস্‌নি শৈলেন, আজ চারদিন থেকে আমাদের মহলা চলছে—শৈলেন এলে ওকে কি ভাবে কথা কইতে হবে...."

বৌ বাধা দিয়া বলিল, "এক বর্ণও বিশ্বাস করবেন না। কথা কইবার জন্যে সবারই জিব জড়িয়ে যায় না, তার জন্যে মহলা দিতে হয় না...."

মুখ ঘুরাইয়া হাসিয়া ফেলিল।

ননীগোপাল বলিল—"শৈলেন, এটা তোকে সোনার-কাঠির কথা মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে....আত্মশ্লাঘা...."

বলিলাম—"শ্লাঘার দোষ দিই না ননী; আর সব নয় হোল, তোর মাথায় তিনটে আঁটি পর্যন্ত কি করে মিলিয়ে দিয়েছেন, তাই ভেবে সারা হয়ে যাচ্ছি আমি সেই থেকে...."

তিনজনেই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলাম। বৌ সেটাকে কতকটা সংযত করিয়া লইয়া চেয়ারের পিঠের দিকে মুখটা ঘুরাইয়া লইয়াছে—একটা চাকর পরিষ্কার কাথায় একটা নবনীর মতো মাস আষ্টেকের শিশু বহন করিয়া আনিয়া বলিল—"কোন মতেই আর থাকতে চাইছে না মাইজী।

আরও গল্প হইল। ননী দম্পতি না খাওয়াইয়া ছাড়িল না। বৌ

একটি তরুণী ধীরে ধীরে আসিয়া আমায় নমস্কার করিল

আয়োজনে চলিয়া গেলে সোনার কাঠির রোম্যান্সের কথাও শুনিলাম, কিন্তু সেটা এ-কাহিনীর পক্ষে অবান্তর বলিয়া আপাতত অপ্রকাশ রাখিলাম।

আলোর নিচে

রবিবারের আলস্য মজলিসে দিগম্বর বাঁড়ুজ্যের সাতাশী বৎসর বয়সে বিপত্নীক মরিবার কথা উঠিল। অত বয়সে বিপত্নীক অবস্থায় মরা খুব স্বাভাবিক নিশ্চয়, কিন্তু সেই সময় খবরের কাগজগুলা কি একটা কারণে বাল্য বিবাহের দোষ-গুণ লইয়া আপোষের মধ্যে খুব গালাগালি করিতেছিল, তাই যে যে-কাগজের ভক্ত সে সেই কাগজের মত সমর্থন করিয়া এই সামান্য বিষয়টা লইয়াই দুইটা দল খাড়া করিয়া লইল। ক্রমে দিগম্বর বাঁড়ুজ্যে ও বাল্যবিবাহ ছাড়িয়া তর্কটা নিছক বিদ্রূপ এবং গালাগালির কোঠায় নামিয়া আসিল। সদাশিব চক্রবর্তীর রকের উপর যে রৌদ্রটা প্রথমে বেশ মিঠা ঠেকিতেছিল সেইটাই ক্ষণেকের মধ্যে তার্কিকগুলির কপালের শিরা ফুলাইয়া তাহাদের উত্তপ্ত করিয়া তুলিল। ব্যাপারটা অনেকক্ষণ চলিল।—রাস্তার উপর বটুক বাবুদের সহিস, পাড়ার গোটাকতক ছেলেমেয়ে, একজন ঝাড়ুদার, একটা ঝালচানা-ওয়ালা, একটা হিং ফিরিওয়ালা কাবুলী প্রভৃতি লইয়া একটা মাঝারি গোছের ভিড় জমিয়া গেল।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু ঠিক হইল—পাড়ায় একটা 'বাল্যবিবাহ-রোধিনী সভা' হওয়া দরকার। চাঁদার অভাবে পাড়ার থিয়েটারের আখড়াটা অনেক দিনই উঠিয়া গিয়াছে বলিয়া কোনও হুজুগ নাই, সুতরাং বিপক্ষ দলেরও কেহ খুব বেশি আপত্তি করিল না। কেহ বলিল "তর্ক তর্কের খাতিরে করছিলাম—তার সঙ্গে সভার কি সম্বন্ধ আছে?" কেহ বলিল—"বাল্য-বিবাহ মানে বুঝি কচি খুকার বিয়ে, তাতো রুখতেই হবে।" একজন জোর দিয়া বলিল—"ঐটেকেই বছরখানেকের মধ্যে বাল্যবিবাহ-সাধিনী সভায় দাঁড়-

করাব, আরম্ভ তো কর।" সদাশিব চক্রবর্ত্তী ছোট মেয়ের পাছাপেড়ে আটহাতি ডুরে শাড়িটি পরিয়া হুঁকা হাতে এই মজলিশেই ব[illegible] [illegible]ম্ভীর ভাবে কি চিন্তা করিতেছিলেন এবং মা[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]ক্ষে জোগান দিয়া তর্কটিকে চালিত করিয়া আসিতেছিলেন। [illegible] বয়স পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন হইবে, সুতরাং তাঁহার কথার আজ দাম ছিল। মীমাংসা হইয়া গেলে হুঁকাটি দেওয়ালে হেলাইয়া রাখিয়া বলিলেন—"এ তো অতি উত্তম কথা; তোমরা আমার বাইরের ঘরটিতেই লাগিয়ে দাও না, কে মানা করে? তবে ঐ এক কথা রে দাদা, রাখতে পারা চাই; নইলে শুধু...."

সতীনাথ মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল—"আলবৎ থাকবে—আপনাকে কিন্তু সভাপতি হতে হবে চক্কোত্তী মশায়; অন্তত প্রথম বছরটা সামলে দিতেই হবে।"

সকলের নিকট হইতে অনুমোদনের একটা অব্যক্ত রব উঠিল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় উৎসাহের সহিত বলিলেন—"সে কি কথা!—দরকার পড়ে হব বৈ কি, এতগুলো ইয়ংম্যানের উৎসাহ!...."

হারাধনের এ দিকে তেমন মন ছিল না। তর্কের মধ্যে সে যে একটি মোক্ষম উত্তর পাইয়া চুপ করিয়া গিয়াছিল, তাহারই একটা লাগসই জবাব খুঁজিয়া খুঁজিয়া সে মনে মনে হয়রান হইতেছিল। যদিও বা একটা উত্তর শেষ পর্যন্ত পায়, তাহা হইলেও বিতণ্ডা থামিয়া যাইবার পর দিলে বড় বেখাপ্পা হইয়া পড়িবে ভাবিয়া সে তর্কটিকে সজীব রাখিবার জন্য বলিল—"তা সভা ক'রবেন করুন চক্কোত্তী মশায়; কিন্তু ছেলেবেলায় বিয়ে ক'রেছিলেন ব'লেই যে দিগম্বর ঠাকুদ্দা—আপনার গিয়ে সাতানব্বই বছরে বিপত্নীক মারা গেলেন এ কথা আমায় বিশ্বাস করাতে পারলেন না। এর পরে কোন্ দিন আপনারা ব'লে ব'সবেন ওঁর

বাড়ির দেয়ালটা যে ভূমিকম্পে পড়ে যায়, সেও ছেলেবেলায় বিয়ে ক'রেছিলেন ব'লে"—বলিয়া, তাহাকে থাবা দিয়া যে থামাইয়া দিয়াছিল সেই সতীনাথের দিকে একটা তীক্ষ্ণ কটাক্ষ হানিল।

সতীনাথ উঠিবার পূর্বসূচনাস্বরূপ আড়ম্বরের সহিত একবার আলস্য ভাঙিবার আয়োজন করিতেছিল, মাঝখানে হঠাৎ থামিয়া গিয়া একটু হাসিল, তাহার পর খুব গম্ভীর ভাবে কহিল—"যদি আপনার কথাই ধ'রে নেওয়া যায় হারাধনবাবু, তা' হ'লেও বাল্যবিবাহের জন্যে কত বাড়ির শুধু পশ্চিম কেন, পূব, উত্তর, দক্ষিণ—সব দিকেরই দেয়াল ভেঙে যে কত দারিদ্র্যের বান ঢুকেছে তার আর হিসেব হয় না। বাল্যবিবাহ সমর্থন করবার আগে যদি ও ব্যাপারগুলোর একটু খোঁজ ক'রে দেখতেন তো মিছে তর্কের ওপর নিজেরই একটা অশ্রদ্ধা জন্মে উঠত—আর—আর—মিছে তর্ক করেন ব'লে নিজের ওপরেও...."

এক দিকে যেমন 'বাহবা'সূচক ইংরাজী বাংলা, হিন্দী কতকগুলা কথার রব উঠিল, অন্যদিকে তেমনি পরাজয়ের উত্তেজনা মাথা খাড়া করিয়া উঠিল। দলটা ভাঙ ভাঙ হইতেছিল, তর্কের গন্ধ পাইয়া আবার গুছাইয়া বসিল। হারাধনের একে তো প্রথম উত্তরেরই জবাব দেওয়া হয় নাই, তাহাতে আবার এবারের তর্কের শেষ দিকটায় এই খোঁচা,—সে তর্কের আর ধার দিয়াও গেল না, হঠাৎ চটিয়া উঠিয়া বলিল—"আরে রেখে দিন আপনাদের ওসব বোগাস—ইয়ে; আমার সভা-টভায় বিশ্বাস নেই। এতদিন পর্যন্ত দুনিয়ার যত দেয়াল বাল্যবিবাহের দোষে ভেঙে পড়েছে, এইবার না হয় আপনাদের গলা বাজির চোটে পড়বে,—ফল একই...."

সদাশিব কিসের জন্য একটু ভিতরে গিয়াছিলেন। আট হাতি পাছাপেড়ে ডুরের খুব কোঁচাটি দুলাইতে দুলাইতে হুঁকা হাতে

বাহিরে আসিয়া বলিলেন—'আবার কি হ'ল? তোমরা সব নেয়ে একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে এস, তর্ক করবার জন্যে তো সমস্ত দিনটাই প'ড়ে র'য়েছে....”

ফেলারাম সমস্ত তর্কের মধ্যে ছাঁকিয়া শুধু এই কথাটি ধীরে ধীরে বলিল—“বিশেষ কিছু হয় নি, আমাদের হারাধনবাবুর সভা-টভায় আর তেমন বিশ্বাস নেই—সেই কথা ব'লছিলেন”—বলিয়া একবার নির্লিপ্ত ভাবে হারাধনের পানে চাহিল এবং পরে সপক্ষীয়দের পানে চাহিয়া একটু মুচকি হাসিল।

সদাশিবের ঠিক এই সময়টিতে যোগদান করিতে হয়; কারণ, দেখা গেল, হারাধনের মুখে এক খণ্ড কাল মেঘ উঠিয়াছে এবং যে ঝড় উঠিবে তাহাতে ভদ্রোচিত যাহা কিছু সমস্তই উড়াইয়া লইয়া যাইবে।

“খুব ঠিক কথা, শুধু হারাধনের কেন, আমারও তো নেই বিশ্বাস—” বলিয়া তিনি ফড়াৎ ফড়াৎ করিয়া হুঁকায় বড় বড় টান দিতে লাগিলেন।

গজানন, সতীনাথ গিরিজা, নেপাল, কয়েকজন উৎসাহী প্রবাসী ছাত্র—যেমন নোয়াখালির রমেন্দ্রচন্দ্র এবং কটকের জগবন্ধু—এককথায় দলের বেশির ভাগই প্রথমটা একটু বিস্মিত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চটিয়া উঠিল এবং প্রশ্ন করিল—“যদি বিশ্বাসই নেই তো সভার জন্যে ঘর ছেড়ে দিতে গেলেন কেন চক্কোত্তী মশায়? হ্যাঁ....”

—“তোমরা সভা ক'রে, সভার কাজ দেখিয়ে আমাদের বিশ্বাস জাগাবে ব'লে, আমাদের ঘাড় ধরে বিশ্বাস করাবে ব'লে। যতক্ষণ সভাই নেই ততক্ষণ বিশ্বাস আবার ক'রব কি হা?'—বলিয়া হারাধনের দিকে চাহিয়া হাসিলেন এবং বলিলেন—“কেমন, এই তো হে হারাধন বাবু?—যে যে-ভাবেই কথা বল রে দাদা, চক্কোত্তী মশায় টেনে বের ক'রবেই ক'রবে।”

উভয় দলেরই মনের কালিমা অনেকটা কাটিয়া গেল। রাগের মাথায় যে কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছিল তাহার এমন সদর্থ হইয়া গেল দেখিয়া হারাধনও হাসিয়া সেটা স্বীকার করিয়া লইল, বলিল—"অনেকটা তাই ; মোট কথাটা কি জানেন চক্কোত্তী মশায়—আপনাদের মত একটা বিচক্ষণ মুরুব্বী লোক থাকলে সভা সমিতিতে থাকতে রাজি আছি, নৈলে শুধু ছ্যাবলামি···"

বার জোড়া চোখের মধ্যে বোধ হয় আট জোড়া চোখ ক্ষুধিতভাবে হারাধনের দিকে চাহিয়া ছিল—তাহার কথাটা থামিলে হয়—

না থামিবার পূর্বেই হারাধন অশ্রুতিপ্রিয় বিদ্রূপে জর্জরিত হইয়া উঠিল—"যা হোক হারাধন একটি মুরুব্বী সঙ্গী পেলে"—"আহা, ভ-ভা-ভাগিস্ র'জি হো—লে হা-হা-রাধন"—"ওঃ, কি মস্ত বড়—বিচক্ষণ লোকটাই না রে আমার!"

কেবলা বলিল—"বলি, ছ্যাব্‌লামি কি রে হেরো—কথাটার মানে জানিস্?" একজন বলিল—"বানান করুন তো দেখি?" আর একজন বলিল—"সন্ধি বিচ্ছেদ····"

সদাশিবের ছোট মেয়েটি বাড়ির ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিয়া দোরের চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়াই আবার ভিতরের পানে তাকাইয়া ছোট ভাইকে ডাকিল—"ওরে খেনো, আবার লেগে গেছে - দেখসে····"

সদাশিব তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন—"তোর মেয়ের নিকুচি করেছে! ভেতরে যাঃ, তামাসা পেয়েচেন····"

আহূত ছেলেটি দুই হাতের মাঝখানে দুইটি খ্যাংরা কাঠি একত্র করিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে—'নালোদ্, নালোদ' করিয়া দিদির যায়গায় আসিয়া দাঁড়াইল। ধমক খাইয়া সেও চলিয়া গেলে বাড়ির বাচ্চা কুকুরটা ছুটিয়া আসিয়া চৌকাঠের উপর পা তুলিয়া দিয়া গলা উঁচাইয়া

ওরে খেনো, আবার লেগে গেছে—দেখসে

ব্যাপারটা কি হৃদয়ংগম করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। হারাধনকে কিন্তু ধরিয়া রাখা গেল না। সে চামড়ার জালের হাল-ফ্যাসানের হালকা চটি জোড়াটা টানিতে টানিতে গো হইয়া চলিয়া গেল—কাহারও

আহ্বান—এমন কি চক্রবর্তী মহাশয়ের হুঁকাটা একবার ঘরে 'রাখিয়া' দিয়া যাইবার অনুরোধটাও গ্রাহ্য করিল না।

সে চলিয়া গেলে হুঁকাটাতে দু'টা টান দিয়া চক্রবর্তী মহাশয় বলিলেন —"নাঃ, এ বড় অন্যায় তোমাদের....”

"কিসে অন্যায় ?”—“অন্যায়টা কার ?”—“গাজুরি কথা এখানে খাটবে না।” --প্রভৃতি কতক প্রশ্ন ও অভিমতের আকারে তর্কটা আবার মাথা তুলিবার চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু ইতিমধ্যে একটি ভদ্রলোক আসিয়া চক্রবর্তী মহাশয়কে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইতে তিনি হঠাৎ ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বলিলেন—"আচ্ছা ও সব আবার ঠিক ক'রে নেওয়া যাবে'খন, তোমরা এখন নেয়ে খেয়ে নাওগে....এই যে আসুন মোক্তার মশায়— খবর ভাল তো ?....”

[২]

লোকটি আধসেরা-তালা-লাগান ক্যাম্বিসের পেটফোলা একটা ব্যাগ হাতে করিয়া উঠিয়া আসিয়া চক্রবর্তী মহাশয়ের পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকিল।

লিক্‌লিকে খর্বাকৃতি, অথচ শরীরের অনুপাতে মুখটা এবং মুখের অনুপাতে নাকটা বেজায় বড়—অনেকটা কার্বাইডের বিজ্ঞাপন-চিত্রের মত। খুব ধূর্ত বলিয়া বোধ হয়। গম্ভীর ভাব হইতে হঠাৎ হাসি এবং হাসির মধ্যে হঠাৎ গাম্ভীর্য আনিয়া ফেলিবার লোকটার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে,—আবার হাসিলে, বর্তুল নাসিকাটির উপর একটা টান পড়িয়া ধারাল অগ্রভাগটি ঠোঁটের উপর আসিয়া পড়ে, তাহাতে তাহাকে আরও বেশি করিয়া ধূর্ত দেখায়। কথা কয় চারিদিকে নজর রাখিয়া,

আর উচ্চ গলায় কথা কহিতে কহিতে [illegible] যায়গায় আওয়াজ এমন নামাইয়া ফেলে যে, শ্রোতার নিকট বিষয়টির গুরুত্ব চতুর্গুণ বাড়িয়া যায়। সব দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয়, হাঁ [illegible] মোক্তার বলি [illegible],—চেহারায় মোক্তারি, চালে মোক্তারি, কথায় [illegible] কি হাসিটিও মোক্তারি: মাখান !....

লোকটি কিন্তু মোক্তার নয়, ঘটক। চক্রবর্তী মহাশয় যে সে কথাও জানিতেন না এমন নয়, তবে আর কেহ—বিশেষ করিয়া পাড়ার ছেলে ছোকরারা কথাটা জানিয়া ফেলে এটা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না।

চক্রবর্তী মহাশয় ঘরে ঢুকিয়া একটি অষ্টাবক্র চেয়ারের উপর উপবেশন করিলেন এবং সপ্রশ্ন নেত্রে আগন্তুকের পানে চাহিয়া রহিলেন।

সে প্রবেশ করিয়া সন্তর্পণে দুয়ার ভেজাইয়া মুখোমুখি হইয়া একটি চৌকির উপর বসিল এবং শুক্‌নো গালের এক গাল হাসিয়া বলিল—"মোক্তার!—তা খুব এক চাল চেলেছেন হবি ছোঁড়াদের কাছে। বেটারা ঘটক দেখ্‌লে যেন ছিঁড়ে খেতে চায়। বলিহারি বুদ্ধি আপনার...."হঠাৎ গম্ভীর হইয়া চাপা গলায়—"তা আমি তো সেই কথাই মেয়ের মাকে ব'ললুম—বলি, বয়েস যদি হয়েইথাকে একটু, বুদ্ধি কিন্তু এখনও যুবোর মত ধারাল।"

চক্রবর্তী মহাশয় গদগদ হইয়া পড়িলেন, বলিলেন—"তা মোক্তার নয়-ই বা কিসে? প্রজাপতির আদালতে তোমরাই তো ত্রাণকর্তা সত্ত চক্কোত্তী কখনও ভুল বলে না। আসল কথা কি জান রে ভায়া?—পাড়ার এই অখণ্ডে বেটারা পাঁচ পাঁচটা সম্বন্ধ ভেঙেছে, তাই আর ঘটক নামটা উচ্চারণ করা সুযুক্তি মনে করি না। এখন চেষ্টায় আছি ওদের সঙ্গে মিশে ওদেরই রস্তা দেখাব। সবার মাথায় ঢুকেছে 'বাল্য বিবাহ-রোধিনী সভা'

মোক্তার! তা খুব এক চাল চেলেছেন ছোরাদের কাছে

ক'রতে হবে। খুব তাইয়ে দিয়েছি, ব'ললুম, সে তোমারা আমার ঘরেই কর না কেন····মহা খুশী! এক কথায় সভাপতি পর্যন্ত হ'য়ে গেলাম।—হ্যাঁ, তা হবু-শাশুড়ী কি ব'ললেন তাতে?"

"ধুর্জটী ঘটক যখন আসরে নেমেছে তখন বিয়ের আর বাকি নেই

জেনে রাখবেন, দাদা। কথার চোটে একেবারে ভিজিয়ে দিয়ে এসেছি; মাগী তো আজ হ'লে আর কাল চায় না। তবে কি জানেন?—কিছু চায় মোটা রকম; বলে—'এই ন্যাটাটা চুকিয়ে একেবারে কাশীবাসী হব, ঘটকঠাকুর। তা কর্তা তো কিছুই রেখে যেতে পারেন নি, এখন জামাই-ই হবেন আমার ভরসা'—ব'লে কাঁদতে লাগল....”

চক্রবর্তী মহাশয় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—“আহা, কান্না কেন, চক্রবর্তী কি পেছপাও কিছুতে? তাঁরই তো সব; আমি তো সেবক মাত্র—দাসানুদাস।” কন্যার মাকে মাগী বলিয়া আরম্ভ করিলেও ভাবী জামাইয়ের দরদ দেখিয়া ঘটক একটু থতমত খাইয়া গেল, সে সুর বদলাইয়া ফেলিয়া তাহার সেই নাকটানা হাসি হাসিয়া বলিল, “ঠিক সেই কথাই তো আমি ব'ললাম তাঁকে, বলি—'আপনি সে-বিষয়ে কোন ভাবনা রাখবেন না, সদাশিব চক্কোত্তীর বুকের পাটা আছে, বড় কপালজোরেই এমন সর্বগুণান্বিত জামাই পেয়েছেন আপনি।' তবে একটা বড় গোল হয়েছে—” বলিয়া সে অতি নিঃশব্দ গতিতে গিয়া ভেজান দুয়ারটা সামান্য খুলিল এবং গলা বাড়াইয়া বাহিরটা তত্ত্বাবধান করিয়া আবার দুয়ারটি ভেজাইয়া চৌকিতে আসিয়া বসিল। গম্ভীর ভাবে বলিল—“ধুর্জটী ঘটকের সব কাজই এই রকম আটঘাট বেঁধে। আজকাল আর আপনার-আমার যুগ নয়, চক্কোত্তী মশায় যে, কথা শুনবো তো বুক ঠুকে সামনে দাঁড়িয়ে; কে জানে দোরের আড়ালে পাড়ার পাঁচ জোড়া কান পাতা রয়েছে কি না....কি ব'লছিলাম—হ্যাঁ, এক যায়গায় একটু গোল বেধেছে—” চিন্তিত ভাবে মাথা নাড়িয়া—“বেধেছে একটু গোল....”

উদ্বিগ্ন ভাবে চেয়ারটা আরও নিকটে টানিয়া চক্রবর্তী মহাশয় বলিলেন —“কি, কি, আবার গোল কিসের?”

"ঐ যে ব'ললাম—আর আপনার-আমার যুগ নেই, দাদা, যে, বাপ মা ধরে বেঁধে, কাণা খোঁড়া যা একটা গলায় লট্‌কে দিলে তাই শিরোধার্য। এখন ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সব 'লব' ঢুকেছে। সে যুগে একটা বিদ্যেসুন্দর হ'য়েছিল, তাতেই পুঁথি লেখা হ'য়ে গেল ; এখন ঘরে ঘরে বিদ্যেসুন্দরের হুড়োহুড়ি···"

"আঃ, কি হয়েছে বল না ছাই—" চক্রবর্তী মহাশয় ঘটকের মুখের উপর উবুড় হইয়া পড়িলেন।

ঘটক গলাটা এত নামাইয়া লইল যে, চক্রবর্তী মহাশয়ের অত কাছে থাকিয়াও শোনা দুষ্কর হইয়া উঠিল। বলিল—'মাগী—ইয়ে, ঠাকরুণের *দূর সম্পর্কে এক কুটুম্বের ছেলে—সেই যে বলে না ?* —সইয়ের বোয়ের-বকুল-ফুলের-ভাইপো-বৌয়ের-বোনপো-জামাই—সেই গোছের আর কি ! তিনি নাকি ঘন ঘন যাওয়া-আসা লাগিয়েছেন···"

"সত্যি নাকি ? তা হবু-শাশুড়ীর কি মত ?"

"যদি শম্মা না থাকতো তো হবু-শাশুড়ী যে কার হবু-শাশুড়ী হতেন বলা যায় না—তবে····"

"কি ক'রলেন আপনি ?"

এখানে আর চাপা গলায় কুলাইল না ; অনেকটা আত্ম-বিস্মৃত হইয়াই ঘটক বেশ স্পষ্ট গলায় বলিল—"ব'ললে আত্মশ্লাঘা করা হয় দাদা, এই ধুর্জ্জটী ঘটকেরই প্রপিতামহ সিদ্ধু ঘটক একদিন ঘাটের মড়ার হাতে গৌরীদান করিয়েছিল। আজ ধর্ম্মের সে জোরও নেই, কুলীনের সে মর্য্যাদাও নেই। সিদ্ধু ঘটকের সামনে যারা তটস্থ থাকতো, তাদেরই নাতি-নাতকুড়েরা একটু বি-এল-এ ব্লে ক'রতে শিখে আজ আমায় 'সিন্ধু-ঘোটকের পৌত্তুর' ব'লে ঠাট্টা ক'রে, বাড়ির দেয়ালে গোবর দিয়ে লিখে দিয়ে যায়। আচ্ছা, দিক্, ধর্ম্মের জয় একদিন না একদিন হ'বেই····"

সদাশিব একটু অসহিষ্ণু ভাবেই বলিলেন—

"ধর্মই তো আমাদের ভরসা রে দাদা, তা কি করলে তুমি?"

"দু'তরফেই একটু ভুজং দিয়ে তো আপাতত ঠাণ্ডা ক'রে এসেছি, এখন আপনার কপাল আর আমার হাত যশ। ক'নের মাকে ব'ললাম—'দেখ ঠাকরুণ, ভাল চাও তো ঐ পীরিত-টীরিতের হাত থেকে মেয়েটিকে বাঁচিয়ে রাখো—যত নষ্টের কু ঐ সব। এই ক'রে ক'রে বয়েস খোয়ালাম, আমার তো জানতে বাকি নেই—কলেজে পড়বার সময় আজকালকার চ্যাংড়াদের ঘাড়ে ও-একটা ভূত চাপে, ডাক্তারেরা যাকে বলে হিষ্টিরিয়া—তারপর পাশ-টাশ ক'রলে বড় বড় ঘর থেকে সম্বন্ধ নিয়ে যখন ঘটক যাওয়া-আসা করে, তখন মেজাজ যায় উল্টে, তখন কে কার কড়ি ধারে? এই ক'রে ক'রে কত গেরস্ত ঘরের সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল, তা আর ঘরের কোণে ব'সে তোমরা কি বুঝবে? তা ভিন্ন পীরিত ক'রে ছেলের পেট না হয় খানিকটা ভরল, ছেলের বাপ-মায়ের জন্য তো চাঁদির খোরাক চাই—সে তুমি গরীব লোক কোথা থেকে জোগাবে? পার জোগাতে, বল না, আমিই আজ ঘটকালি করছি। তা ভিন্ন, ধর যেন সবই ঠিক হ'য়ে গেল—সাত মণ তেলও পুড়ল, রাধাও নাচল—কিন্তু চক্কোত্তী ঠাকুরের মত ছেলের বাপ তো উল্টে তোমার পায়ে টাকা ঢালচেন না যে, নিশ্চিন্দি হ'য়ে কাশীবাসী হবে! তা ভিন্ন—তা ভিন্ন' সে অনেক কথা—এখন আর মনে প'ড়ছে না। শেষকালে ব'লে এলাম—'না পেত্তয় হয় তোমার, সাত দিনের মধ্যে তোমার কাছে পাঁচশো টাকা আগাম হাজির করচি। সোনার চাঁদ জামাই হবে; মোহে ভুলে হাতের রতন'...."

"একেবারে পাঁচ-শো টাকা ক'বলে এলে?—তা, সে-মাগী কি বললে?"

টাকার কথাটা তুলিয়া ঘটক খুব সতর্কই ছিল, সামলাইয়া লইয়া বলিল—"ভাবী শাশুড়ী ঠাকরুণ আপনার দরদী মেয়েমানুষ, দাদা ; ব'ললেন—'না, সে কি কথা, ঘটক ঠাকুর !—যাঁর হাতে মেয়ে দোব, তাঁকে পেত্তয় যাব না !—আর আপনার মত লোক যখন মাঝখানে র'য়েচে !—তবে কি জানেন, শ' খানেক টাকা এখন পেলে,—একবার চক্রবর্তী মহাশয়ের মুখের পানে চকিতে চাহিয়া লইল এবং তাহাতে আবার প্রীতির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া বলিল—'শ' খানেক টাকা এখন পেলে বড় উপগার হ'ত। অমন জামাইয়ের যুগ্যি তো কিছুই করা হবে না, মনের সাধ মনেই র'য়ে যাবে ; তবুও মামুলী বরাভরণ-টরাভরণগুলোর একটু আয়োজন ক'রতে হবে তো'...."

চক্রবর্তী মহাশয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন ; ভাঙা চেয়ারটাকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন—"আরে সে তুমি একশ' কেন, আরও নিয়ে যাও না—বিশ পঁচিশ যা হয়। তিনি যদি পাঁচশ' টাকাই চাই—হুকুম ক'রতেন তো কি আর আটকাত? এখন সবই তো তাঁর মেয়েরই—"

ঘটক আনন্দে হেঁ-হেঁ করিয়া প্রাণ ভরিয়া হাসিতে লাগিল, এবং হাসির তরঙ্গে তরঙ্গে টানা নাকের ডগাটা চক্ চক্ করিতে লাগিল। চক্রবর্তী মহাশয় বলিলেন—"তারপর সেই রসিকরাজ নাগরটিকে কি বললেন?—ঠাণ্ডা করলেন কি বলে?"

ঘটকের হাসির মাত্রাটা আরও উৎকট রকম বাড়িয়া গেল। তাহারই মাঝে মাঝে থামিয়া থামিয়া বলিল—"দাদা এত হাসাতেও পারেন—বলেন কিনা—'রসিকরাজ নাগর'! না দাদা, আপনি এত দুঃখের কথায় আর হাসাবেন না—পেটের নাড়ি ছিঁড়ে যাবে—ওঃ—এত হাসাতেও পারেন আপনি—বলেন কি না—রসিকরাজ!"

হঠাৎ স্বরটা আবার একেবারে খাদে নামাইয়া কহিল—'আমি

ক'রলাম, কি ব'লতে পারি দাদা ?—যাঁর কাজ তিনিই ক'রে যাচ্চেন। আমি আর কে ?—নিমিত্ত মাত্র বৈ তো নয়।....প্রথমত গিয়ে তার বাপকে ধরলাম, ব'ললাম—এমন সোনার চাঁদ ছেলে আপনার—রূপে কাত্তিক, গুণে গণপতি—বাজারে প'ড়তে পাবে না ; আর সেই ছেলেকে, এমন বিচক্ষণ লোক হ'য়ে কিনা ঐ হাঘরে মাগীর জামাই ক'রতে যাচ্চেন !'....খুব একচোট চড়িয়ে দিলাম আর কি....বললাম—'মেয়ে সুন্দর ?—আমি ভার নিচ্ছি—হুকুম করুন, ডানা-কাটা পরী এনে হাজির ক'রছি—দুদিকে দুটো হীরের ডানা বসিয়ে'....লোকটি বড় নিরীহ ; বলে, 'ঘটক মশায়, সবই বুঝি, তবে অসহায় মেয়েমানুষ, আমাদেরই ঘাড়ে এসে প'ড়েছে....' ব'ললাম—'আপনি আমার ঘাড়ে ঝেড়ে ফেলুন, আমরা র'য়েছি কি ক'রতে ? আগে ও—মেয়ের ব্যবস্থা ক'রে তবে আপনার ছেলের জন্যে লাগব। অমন ছেলে, যদি কম-সে-কম হাজার দশেক টাকা সিন্দুকে না উঠল তো আর হ'ল কি ? হাজার খানেক তো আমিই বিদেয় ব'লে গুণে নোব—কর্‌করে....'

বুড়োর মুখ দিয়ে নাল প'ড়তে লাগল দাদা,—যাকে বলে রীতিমতো নাল প'ড়তে লাগল। ব'ললে—'তা হলে, যদি সামলে নিতে পারেন ঘটক মশায়, তো দেখুন ; আমি তো পাকা কথা দিই নি ;—ব'লেচি 'যদি অন্যত্র না হয় তো আমার ছেলে দোব....'

ঘটক কি রূপ প্রভাবটা হইতেছে লক্ষ্য করিবার জন্য একটু থামিল, তাহার পর উৎসাহের সহিত বলিয়া চলিল—'তারপর গেলাম খোঁজে সেই ছোকরার কাছে। প্রথমত সেই সইয়ের-বৌয়ের-বকুল-ফুলের সম্বন্ধটা ধ'রে ব'ললাম—"বাবাজি, তোমার গিয়ে, 'লব্‌' জিনিসটা ভাল, কিন্তু তোমাদের যে সম্বন্ধে আটকাচ্চে তার খোঁজ রাখ ? তোমরা তো বেদ-বেদান্ত ঘটক-পুরুত কিছুই মান না, তা ব'লে কি বোনের সঙ্গে বিয়ে

ক'রতে হবে? তবে অন্য সব জেতেরাই বা কি দোষ ক'রেছে? শুনে চুপ ক'রে একটু হাসলে। দেখলাম, ওষধ ধ'রেছে। একটু মিথ্যে কথা জুড়ে দিলাম—ধম্মের জন্যে সবই ক'রতে হয়, দাদা; ব'ললাম—'আর এক কথা, বাবাজি, তোমরা ছেলেমানুষ, অত মারপ্যাচ বোঝ না;—মাগী যে এদিকে আমার পাত্তোরের কাছে হাজার টাকা খেয়ে দলিল পত্তর ক'রে ব'সে আছে। কুটুম্বের ছেলে, এক গ্রামে থাকো তাতে আবার, কাজেই চক্ষু লজ্জার খাতিরে কিছু ব'লতে পারছে না। তুমি যখন মাঝ-দরিয়ায় গিয়ে প'ড়বে সেই সময় ভরা ডুবি ক'রবে'....কে হ্যা, দোর ঠেলো? একটু অপেক্ষা ক'রতে হ'চ্ছে,—চক্কোত্তী মশায় বিশেষ ব্যস্ত একটা মকদ্দমার কথা নিয়ে....ও, আপনার সেই বাচ্চা কুকুরটা।—ব্যাটা সব্বঘটে আছে....' উঠিয়া দুয়ারটা ভেজাইয়া দিয়া—বলিতে লাগিল—'কি যে ব'লছিলাম?—হ্যাঁ তুমি 'লব্-লব্' করে যখন মাঝ দরিয়ায় সেই সময় ভরাডুবি করবে, মহা জাঁহাবাজ মাগী'....শুনে ত বাছার মুখটি এতটুকু হ'য়ে গেল। বলে—'ঘটক মশায়, ওর মনে যে এত আছে? কে জানে বলুন,—তা হ'লে ও-বাড়ির ছায়া মাড়ান নয়'....মনে মনে ব'ললাম—'পথে এস বাছাধন; এ ধুর্জ্জটী ঘটক, হাঁ!'...."

চক্রবর্তী মহাশয়ের হঠাৎ চমক ভাঙিল—'ওরে তামাক দিয়ে যা না রে! দেখেছ, কারুর কি আর চাড় আছে বাড়িতে, ভায়া?—সাধ ক'রে কি আবার একটি 'সংসার' আনতে চাই? বাড়িতে একটা গণ্যিমান্যি লোক এলে, একটু খোঁজ খবর নেবার-ও মানুষ নেই একটা...."

ঘটক শশব্যস্তে বলিল—'থাক্ থাক্, কিসের এত তাড়াতাড়ি দাদা, না—না, আপনি অত ব্যস্ত হ'য়ে আমায় অপরাধী ক'রবেন না। আমার প্রতিজ্ঞা যে যতদিন না দিদি ঠাকুরুণকে এ ঘরের লক্ষ্মী ক'রে আনতে

পারছি, ততদিন পান তামাকের নাম গন্ধ নয়। নৈলে আমি কি চেয়ে নিতে পারতাম না—এ কি আমার পরের বাড়ি?....'

এমন সময় দরজায় কয়েকটা আঘাতের শব্দ শোনা গেল। চক্রবর্তী মহাশয় ঘটকের কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া সংক্ষিপ্ত ভাবে বলিলেন—'স্রেফ্ মোক্তার মশায়, ফিসের টাকা, আর বাকি খাজনার মোকদ্দমার; আর অন্য কথা নয়, বুঝ্‌লে তো?....'

ঘটক চতুর বিজ্ঞের হাসি হাসিয়া চক্রবর্তী মহাশয়কে লঘুভাবে একটু ধাক্কা দিয়া সহজ গলায় আরম্ভ করিল—"আসল কথা, হাকিম হ'য়েছে অবুঝ—আইন কানুনের ধার দিয়েও যায় না—কাজেই....বাইরে কে? ভেতরে এস, এমন কিছু গোপনীয় কথা হচ্ছে না।"

ছেলেটির একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। নাম মহীতোষ, সবে পাশ করিয়া কলিকাতার একটি সওদাগরি আফিসে প্রবেশ করিয়াছে। গ্রাম হইতে ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করে। ধূর্জটি ঘটক যখন তাহাকে সব কথা বলিয়া সাবধান করিয়া দিল, মহীতোষ সত্যই মুখটা অন্ধকার করিয়া বলিল—"তা হ'লে আর ও বাড়ির ছায়া মাড়ান নয়, ঘটক মশাই।" ধূর্জটী ঘটক মনে মনে বলিল—'পথে এসো বাছাধন এ ধুর্জ্জটী ঘটক, হুঁ!' মহীতোষও নিশ্চয়ই ঐরকম মনে মনে কিছু বলিয়াছিল। যাহা করিল তাহা হইতে এই রকমই মনে হয়।

[৩]

ঘটক যখন বিদায় লইল মহীতোষ কামিজটা গায়ে দিল, কাবুলী-চটিটা বক্‌লস্ কষিয়া পায়ে আঁটিল এবং গালে একটা পান পুরিয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। সন্ধ্যাকাল, এই সময়ই ও-পাড়ায় গিয়া তাহার এক

অনিশ্চিত-সম্পর্কের ছোট মাসতুত ভাইকে পড়ায়। ছেলেটির নাম নবকুমার, সাত আট বছর বয়স, দিব্য ফুটফুটে! বেচারার বাপ সম্প্রতি মারা গিয়াছে, এখন আছে মা আর একটি বোন, নাম উমা। আগে ইহারা অন্য কোথায় থাকিত, বাপের মৃত্যুর পর এ গ্রামে আসিয়াছে।

আর একটি কথা বলিয়া দিলেই পরিচয়টা পরিষ্কার হয়, এই উমাই এ কাহিনীর নায়িকা, ধূর্জটি ঘটক ইহার জন্যই হাঁটাহাটি করিতেছে। এ দিকে মহীতোষের ঘটা করিয়া নবকুমারকে পড়ানর আন্তরালে রহিয়াছে এই মেয়েটিই। কাজেই গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে।

নবকুমার বাড়ির বাহিরে খেলা করিতেছিল। মহীতোষকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিল এবং হাসিতে হাসিতে তাহার বাম হস্তটা দু'হাতে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ঝুলিতে লাগিল।

মহীতোষ জিজ্ঞাসা করিল—"মাসিমা কোথায় রে, নবু?"

"মা ওপরের ঘরে, আর দিদি⋯"

মহীতোষ চোখ রাঙাইয়া বলিল—"তোর দিদির জন্যে আমার যত মাথাব্যথা প'ড়েছে!"

নবকুমার ঠিক অর্থগ্রহণ করিতে পারিল না; একটু অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল—"দিদিরও মাথা ব্যথা ক'রেছে মহীদা—" সঙ্গে সঙ্গে মহীতোষের ঘাড়টা নামাইয়া কানে কানে বলিল—"কিন্তু মিছে কথা মহীদা, আমাকে ব'ললে, মহীদা যদি ডাকে তো বলিস্ দিদির মাথা ব্যথা ক'রেছে⋯"

মহীতোষকে হাসিতে দেখিয়া নবকুমার সাহস ফিরিয়া পাইল, কহিল—"হ্যাঁ মহীদা, দিদির নাকি বুড়ো বর আসবে? মা কাঁদছিলেন⋯"

মহীতোষ আবার হাসিয়া বলিল—"মিথ্যেবাদীদের যদি বুড়ো বর না হয় তো, বুড়ো বরেরা আছে কি জন্যে?"

কথা কহিতে কহিতে তাহারা ভিতরে আসিয়া পড়িল।

ছাতের উপর থেকে নবকুমারের মা মহীতোষকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিলেন। মেয়েকে ডাক দিয়া বলিলেন —"উমা, তোর দাদাকে একখানা আসন দিয়ে যা।"

মহীতোষ জিজ্ঞাসা করিল—"আজ সেই ঘটক এসেছিল, মাসিমা?—কি সব ব'ললেন আপনি?"

"যে রকম ব'লতে ব'লেছিলে সেই রকমই ব'ললাম বাবা।—হ্যাঁ, ভাল কথা—আজ পাত্তোরের ঠিকানাটা পাওয়া গেছে। তোমার কথামত তোমার বাবার নাম ক'রে ব'ললাম যে, তিনি একবার দেখে না এলে চলে না—খুব শক্ত হ'য়ে রইলাম। প্রথম তো দিতেই চায় না ঠিকানা, বলে—আমি তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব,—আমরা পাড়াগেঁয়ে লোক, অত কি বাড়ির নম্বর টম্বর মনে রাখতে পারি?....তাতে আমি একটু যখন বেঁকে দাঁড়ালাম তখন কাঁচুমাচু ক'রে যেন কত মনে করবার ভান করে ঠিকানাটা দিলে;– তাও কেমন, তোমাকে দেখাতে মানা—আজকালকার ছেলেদের নাকি বড়দের বিয়ে পণ্ড করা একটা বাতিক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। হাসিও পেল, দুঃখও হ'ল—হ্যাগা, তোমরাই সব ক'রছ-কম্মাছ আর তোমরাই বাগড়া দেবে?....যাও তো, নবু, দেরাজ থেকে ঘটকের সেই কাগজটা নিয়ে এস তো।....একটু খোঁজ নাও বাবা, তলে তলে, আমার যেন কেমন একটা অস্বস্তি লেগে আছে। চল্লিশের কাছা কাছি হয় বয়েস—কি করব, অত দেখতে গেলে চলবে না তো আমার, কিন্তু কথার মারপ্যাচে ভুলিয়ে যদি নেহাৎই একটা বুড়ো হাবড়াই এনে হাজির করে শেষ পর্যন্ত...."

মহীতোষ বিজ্ঞের মতো গম্ভীর হইয়া বলিল—'কি জানেন মাসিমা?

হাতের সম্বন্ধটা পায়ে ঠেলা কিছু না। সঙ্গে সঙ্গে অন্যত্রও চেষ্টা ক'রতে হবে, এখানে যদি কোন গলদ বেরিয়ে পড়ে তো....”

“দেখ বাবা, তোমরাই যা ভালো বোঝ; মেয়ের দিকে যত দেখছি, আমার তো বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাচ্ছে।”

মাসিমা কাজ ফেলিয়া আসিয়াছিলেন, উঠিয়া গেলেন। নবকুমার বই-এর জন্য দিদিকে হাঁক দিল। সে-ই তাহার বই-শ্লেট আজকাল গুছাইয়া রাখে, আবার পড়িবার সময় বাহির করিয়া দিয়া যায়।

কিন্তু আজ সে আর সামনে আসিল না, নবকুমারকেও ডাকিয়া কেতাব-শ্লেট গছাইয়া দিল না; দুয়ারের আড়াল হইতে হাত বাড়াইয়া সেগুলা রোয়াকের উপর রাখিয়া সামনে ঠেলিয়া দিল।

নবকুমার ভগ্নীর সঙ্কোচ দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বই-শ্লেট উঠাইয়া আনিল, এবং বইয়ের পাতা খুলিতে খুলিতে হঠাৎ মহীতোষের মুখের পানে চাহিয়া বলিল—“মহীদা, দিদির কথা শুনেছ?—”

দুয়ারের দিকে চাহিয়া সে সঙ্গে সঙ্গে চুপ করিয়া গেল। মহীতোষ তাহার পিঠ চাপড়াইয়া অভয় দিয়া বলিল—“কিরে নবু? আমার কাছে ভয় নেই, বল্।”

উমা চোখে রাগের বিদ্যুৎ হানিয়া, একবার দুয়ারের পাশ হইতে মুখটা বাড়াইয়া দৌড়াইয়া উপর তলায় চলিয়া গেল। সেখান হইতে হাঁক দিল—“নবু, তোমায় মা ডাকচেন, শিগ্গির্ শুনে যাওসে।”

নবকুমার মহীতোষের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল, কহিল—“বড় চালাক হয়েছেন; মা কলসী নিয়ে ঘাটে গেলেন আমরা যেন দেখি নি। কি বলছিল দিদি জানো মহীদা? বলছিল—‘বুড়োর সঙ্গে বিয়ে হলে, ভাই, আমি আপিন খেয়ে মরব,—মাও জব্দ হবে, মহীদাও....”

মহীতোষ মনের আগ্রহ চাপা দেওয়ার চেষ্টা করিয়া বলিল—"তাই নাকি ?—তা হলে কাকে বিয়ে করবে বললে ?"

"বিয়েই করবে না বল্‌লে মহীদা, বলছিল...."

উমার ডাক আসিল "নবু, শীগ্‌গির্‌ একবার এস তো, আমি ইয়েটা খুঁজে পাচ্ছি না—এস শীগ্‌গির্‌...."

নবু বুঝিতে না পারিয়া উঠিতে যাইতেছিল, মহীতোষ চাপাগলায় বলিল—"দাঁড়া নবু, একটা মজা করি ; বল্‌ 'আসছি'।"

নবকুমার উত্তর করিল—"যাচ্ছি দাঁড়াও"—বলিয়া সকৌতুকে মহী-তোষের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

"তুই বোস্‌। ও ভাববে তুই যাচ্ছিস্—আর সামনে গিয়ে দাঁড়াব আমি। বেশ মজা হবে না ?"

নবকুমারের চক্ষু দুইটা দুষ্টামির আনন্দে নাচিয়া উঠিল—মাথা নাড়িয়া বলিল—"হ্যাঁ, উঃ...."—আবেগের চোটে হাততালি দিয়া উঠিতে যাইতে-ছিল, মহীতোষ ধরিয়া ফেলিয়া নিরস্ত করিল ; তাহার পর খালি পায়ে আস্তে আস্তে উপরে উঠিয়া—যে ঘরে উমা ছিল সেই ঘরের কাছাকাছি পৌঁছিতেই উমা পদশব্দ লক্ষ্য করিয়া বলিল—'এই বুঝি তোমার দিদিকে ভালবাসা, দুষ্টু ছেলে !—আর কক্ষণও—কক্ষণও—কক্ষণও তোমায় যদি কোন কথা...."

মহীতোষ হাসিতে হাসিতে চৌকাঠের উপর গিয়া দাঁড়াইল। উমার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল ; প্রথমে বিস্ময়ে এবং পর মুহূর্তেই লজ্জায় অভিভূত হইয়া দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া সে বালিসের উপর উবুড় হইয়া পড়িল।

মহীতোষ একটু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার যে নির্জলা কৌতুক করিবারই ইচ্ছা ছিল এমন নয়, কিছু কথাও ছিল বলিবার এবং

আজকের যোগাযোগটি সেই বলার বড়ই অনুকূল বলিয়া মনে হইতেছিল, কিন্তু কি ভাবে বলিলে নিতান্ত থিয়েটারি কিম্বা অত্যন্ত খেলো না হইয়া বেশ মানানসই হইবে, তাহাও বোধ হয় ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। অবশেষে, সম্ভবত মনে মনে একটা কিছু খাড়া করিয়া যেই চৌকাঠ ছাড়িয়া দুই পা অগ্রসর হইবে, পিছন হইতে নবকুমার হাততালি দিয়া হো—হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—খুব জব্দ হয়েছে দিদি, কেমন মজা !

মহীতোষ চমকিয়া উঠিয়া হঠাৎ অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। এমন সময় নিম্নতল হইতে কর্ত্রী ডাকিয়া উঠিলেন—"কৈ রে, কোথায় গেলি তোরা ? মহীতোষ এক্ষুণি চ'লে গেল ?—কেন রে উমা ?"

নবকুমারকে আগে করিয়া মহীতোষ একটু অপ্রতিভ ভাবে জড়সড় হইয়া নামিয়া আসিল। নবকুমার নিজের স্বভাবগত উল্লাসে মাকে জানাইয়া দিল—"আজ মহীদা দিদিকে খুব জব্দ ক'রেছেন মা, আরও ক'রতেন····"

"সত্যি নাকি ?"—বলিয়া মা একটু হাসিলেন ; আর কোন প্রশ্ন করিলেন না। মহীতোষ কিন্তু অতিমাত্র সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, প্রসঙ্গটা চাপা দেওয়ার জন্য বলিল—"নাও, শীগ্‌গির প'ড়ে নাও নবু, বোধ হয় ঝড় উঠবে।"

তাহার পর মাসিমার পানে চাহিয়া বলিল—"ওপরে উঠে তাই দেখলাম কিনা, ভাবলাম দেখিতো এত গুমোট করে কেন !"

পাকেপ্রকারে মনের কথাটা বাড়িতে রটাইয়া দিল। বাড়িতে কথাটা লইয়া আলোচনা চলিতেই, একটু বাড়িয়া গেল। গৃহিণীর মেয়েটি খুব পছন্দ, তা ভিন্ন মায়ে ছেলের মনও বেশি দেখে; কর্ত্তার কিন্তু সত্যই একটু লোভ ছিল, তাহার উপর ধূর্জটি ঘটকের রসান্ ও একটু কাজ করিয়াছে।

কর্তা এবং গৃহিণীতে খানিকটা মনোমালিন্য চলিল। অবশেষে কর্তা কলিকালের দারাপুত্র সম্বন্ধে নিতান্ত হতাশ হইয়া এই পর্যন্ত রাজী হইলেন যে, যদি কলিকাতার সম্বন্ধটা নষ্ট হইয়া যায় তো নিজের ছেলের সঙ্গেই বিবাহ দিবেন। গৃহিণী রাগিয়া বলিলেন—'ও সব ছলের কথা বুঝি না, সে হাবাতে বুড়ো না মলে তো সম্বন্ধ ভাঙ্গবে না।

মহীতোষ কথাটা শুনিল, শুনিয়া মনে মনে একটু হাসিল।

যেদিন এই ধরণের বোঝাপড়া হইল তাহার দিন চারেক পরে মহীতোষ মাকে জানাইল—একে নূতন চাকরির খাটুনি, তায় ডেলি-প্যাসেঞ্জারির অভ্যাস না থাকায় তাহার শরীরটা ভালো বোধ হইতেছে না; দিন কতক গিয়া কলিকাতার এক মেসে থাকিবে।

মেয়েদের কাছে এই রকম হঠাৎ বাড়ি ত্যাগের একটি মাত্রই অর্থ হয়—ছেলের অভিমান। গৃহিণী দুই সন্ধ্যা খাওয়া ছাড়িয়া দিলেন, কর্তা নিজের মতটা নরম করিলেন। মহীতোষ একটু লজ্জায় পড়িল এবং সেইজন্য আরও বিশেষ করিয়া কলিকাতায় থাকিবার ব্যবস্থা করিল, বলিল—"কাজের একটু অব্যেস হয়ে গেলেই আবার চলে আসছি।"

এদিকে 'সভা' অপ্রতিহত বেগে চলিয়াছে। এই কয়েক দিনের মধ্যে গোটা সাতেক বৈঠক হইয়া গিয়াছে এবং তাহাতে গোটা দুই তিন

বেশ জোরাল মন্তব্য পাশ হইয়া গিয়াছে। ভাটপাড়া, নবদ্বীপ ও দেশের অন্যান্য স্থানের প্রধান প্রধান সভাসমিতিতে সেগুলির কপি নিয়মিতরূপে পাঠানো হইয়াছে। একটা মন্তব্যে অনেক বাকবিতণ্ডার পর বিবাহে বরের বয়স বাইশ এবং বধূর বয়স পনের এইরূপ ধার্য্য হইয়া গিয়াছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমরণ সভাপতি। সভাটিকে পুষ্পের সহিত তুলনা করা না গেলেও বাহির হইতেও ভ্রমরের মতই নূতন সভ্য আকৃষ্ট হইতেছে মন্দ নয়। খাতার মধ্যে সকলের শেষে নাম দেখা যাইতেছে মহীতোষ রায়ের!—বাহিরের লোক, এখানে কাছেই একটা মেসে থাকিয়া একটা সওদাগরি আফিসে চাকরি করে। এবং সঙ্গে সঙ্গে এই সভাটিতে আসিয়া জুটিয়া গিয়াছে। অল্পদিন আসিলেও সে খুব উৎসাহী সভ্য বলিয়া ইহার মধ্যেই নাম কিনিয়াছে।—সে নাকি বাল্যবিবাহ রোধ করিয়াই সন্তুষ্ট হইতে চায় না—দেশের, বিশ্বমানবের এবং সমাজের হিতার্থে বিবাহ নামক জঞ্জালটাই উঠাইয়া দিবার সঙ্কল্প আঁটিয়াছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উপর অগাধ শ্রদ্ধা, সভায় দাঁড়াইয়া এক দিন বলিল—'এ ধর্ম্ম-যুদ্ধে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে সারথী পেয়েছি—আর কিসের ভয়!—যুগ যুগ ধরে যে বিবাহ আমাদের ঋষিকল্পিত ব্রহ্মচর্যের মহাশত্রুরূপে অশেষ অকল্যাণ সাধন করে এসেছে, এস দেখি একবার একমন একপ্রাণ হ'য়ে তার উচ্ছেদ সাধনে বদ্ধপরিকর হই...."

এই রকম গোছের আরও সব কথা।

ওদিকে কিছু দিন হইতে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মধ্যে আবার একটি পরিবর্ত্তণ লক্ষিত হইতেছে, আর সর্বদা খালি গায়ে আটহাতি ডুরেটি পরিয়া থাকেন না। বেশভূষায় সভায় সভাপতির মর্য্যাদানুরূপ কাপড়-চোপড় তো পরিয়া বসেনই, তাহা ভিন্ন অন্য সব সময়েও বেশ মিহি থান কাপড় এবং আধুনিক ধরণের একটি সৌখীন ফতুয়া পরিয়া থাকিতেই

দেখা যায়! ক্বচিৎ এক এক দিন থানের জায়গায় কালোপেড়ে শান্তিপুরীরও আবির্ভাব হয়; কেহ যদি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দেয় তো অমনি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠেন—"দেখেছ? আর বয়সও নেই, চোখের জোরও কমে এসেছে, কি প'রতে কি প'রে আসি, বুঝতেও পারি না।—চল্লিশ প্রায় হ'য়ে এল, আর কি ব'লতে চাও?...."

এইরূপ দৃষ্টিহীনতার সুযোগ পাইয়া এক এক দিন ফিন্‌ফিনে আদ্দির পাঞ্জাবীও গায়ে উঠিয়া বসিয়া থাকে।—"গুছিয়ে সুছিয়ে রাখবার লোকও নেই, কোথাকার জিনিষ কোথায় প'ড়ে থাকে, সংসারটা যেন ছারেখারে যাচ্ছে।"

এক একজন বলে—"সে তো তোমারই দোষ ঠাকুদ্দা, কোথায় একটি গোছাল দেখে টুকটুকে ঠানদিদি আনবে, তা নয়—"

কেহ কেহ উত্তর দেয়,—"আরে দাঁড়াও, হবু-ঠানদিদির তপস্যা শেষ হ'ক; এখনও আগুনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দ্বাদশ বৎসর তপস্যা ক'রতে হবে—ঠাকুদ্দাকে লাভ করা চাড্ডিখানি কথা কি না।"

এই সব নাতিসম্পর্কীয়দের চক্রবর্তী মহাশয় হাসিয়া বলেন—"এখন তাঁরা কি আর ঠানদিদি হ'য়ে আসতে চাইবেন রে দাদা? যদি নাতবৌ হ'য়ে এসে ফাউ হিসেবে তোমাদের ঠাকুদ্দার ঘরকন্না, মেহেরবানি ক'রে, একটু ক'রে দেন তো সেই ঢের!"

তাহা হইলেও সমিতির কয়েকজন অবিশ্বাসীর মধ্যে চক্রবর্তী মহাশয়ের পরিবর্তন লইয়া বেশ একটু আলোচনা চলিয়াছে। তাহারা নাকি লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছে, ভিতরে ভিতরে যখন বিবাহের কথা কোনখান হইতে আসিতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কাপড় আট হাতি ডুরে হইতে ক্রমে শান্তিপুরেয় দাঁড়ায় এবং উগ্রগন্ধ তামাক ও থেলো হুঁকার জায়গাটা ক্রমে রবারের নলওয়ালা গুড়গুড়িটা মাথায় ফৌজদারি

বালাখানার সৌরভ বহন করিয়া অধিকার করিয়া বসে। হঠাৎ মাথা-ব্যথাটা বাড়িয়া যায় এবং ফুলেল তেলের গন্ধ উড়িতে থাকে; এমন কি মাঝে মাঝে কাঁচা পাকা চুল ঠেলিয়া একটা লম্বা টেড়ি পর্যন্ত মাথার মাঝামাঝি রাস্তা করিয়া লয়,—কোন এক কবিরাজ বলিয়াছে ইহাতে নাকি ব্রহ্মতল পর্যন্ত হাওয়া পহুঁছিবার বিশেষ সুবিধা। পরে যেমন যেমন বিবাহের সম্ভাবনাটা কমিয়া আসে, এই সবও নাকি সেই অনুযায়ী তিরোহিত হইতে থাকে এবং অবশেষে আবার সেই সাবেক চাল আসিয়া দাঁড়ায়। এ ব্যাপার তাহারা আজ এই ঝাড়া পাঁচ বৎসর ধরিয়া দেখিয়া আসিতেছে—ইহার মধ্যে ছয় ছয়টা বিবাহের সম্বন্ধ এল গেল। এ তো স্পষ্ট আবার সেই বেশাবর্তন।

বেশির ভাগই কিন্তু অটল গাম্ভীর্যের সহিত সভার কাজে মাতিয়া গিয়াছিল—কথাটাকে মোটেই আমল দিল না, বলিল—"ওদের একটা কিছু না পাকালে আর চলছে না, নুইসেন্স্!"

মহীতোষও তাহাই বলিল, বরং দুইটা ইংরাজি গাল বেশি করিয়া দিল। কয়েক দিন পরে কিন্তু প্রস্তাব উত্থাপন করিল—এই সভা নির্দ্ধারিত করিতেছে যে, সমস্ত বিবাহে বর এবং বধূর বয়সের অনুপাতটা বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে—অর্থাৎ পনের এবং বাইশের মধ্যেকার সাত বৎসরের প্রভেদটা সকল ক্ষেত্রেই অটুট থাকা চাই—যদি কোন বর পঞ্চাশ বৎসরে বিবাহ করিতে মনস্থ করেন তাহা হইলে তাঁহার তেতাল্লিশ বৎসরের বধূ খুঁজিয়া বাহির করা আবশ্যক।

প্রস্তাবটি গুরুতর বিধায় এবং সেদিন কথায় কথায় ময়াল সাপ কত বড় হইতে পারে সেই লইয়া প্রচণ্ড তর্ক হওয়ার পর, আর সময় ও উৎসাহ না থাকায়, সেটিকে পরের বৈঠকের জন্য তুলিয়া রাখা হইয়াছে।

চক্রবর্তী মহাশয় কয়েক জন উৎসাহীকে এক এক করিয়া বলিয়াছেন—"ও হে, তোমরা না দেখে শুনে যত অজ্ঞাত-কুলশীলদের এনে জোটাচ্ছ একটু বুঝে চ'ল।—কয়েক জন আবার তোমাদের উৎসাহকেও যে টেক্কা দিয়ে চ'লেছেন ; কি জান রে দাদা ?—মা'র চেয়ে যার দরদ বেশি···জানইতো সেই মেয়েলি কথাটা।"

এদিকে ঘটক মহাশয়কে বলিয়াছেন—"না ভায়া, কাজ নেই ওখানে ; বেটা ঢুকে অবধি বাগড়া দিতে আরম্ভ ক'রেছে, শুধু ওপরে ওপরেই যত ভক্তি। ও গ্রামছেড়ে যখন হঠাৎ এখানে এসে জুটল আমি তখনই সন্দেহ করেছিলাম। বলি হাঁহে, ঘটকালি ক'রে তো চুলে পাক ধরালে,—তেতাল্লিশ বছরের ক'নের কথা শুনেছ এ পর্যন্ত ? তুমি অন্যত্র দেখ, আর না হয় খুব তাড়াতাড়ি সেরে নিতে পার তো সে এক কথা।···না হে না, একেবারে অসম্ভব, তুমি এ পাড়ার চ্যাংড়াদের চেন না। গেল বারে আমার বিয়ে রুকবে বোলে শালারা ভলেন্টিয়ারের দল পর্যন্ত খুলেছিল ; শেষকালে কি কপাল ফাটিয়ে বাড়ি ফিরতে হ'বে ?"

টিকটিকির কাটা লেজের মতো লাফাইতে লাফাইতে ঘটক হুঙ্কার করিয়া বলিল—"কী ! মাথা ফাটাবে ? কোম্পানির রাজত্ব উঠে গেছে বটে ? আপনি নেবে যান আসরে দাদা—এবারে ধুর্জ্জটি বামুনা র'য়েছে মনে রাখবেন। নিয়ে আসুক বেটারা কত ভলেন্টিয়ার নিয়ে আসবে, আমিও ভূ-ভারতের যত ঘটক-পুরুৎ একত্তোর ক'রছি। আবার একটা দ্রৌপদীর স্বয়ংবরের ব্যাপার হ'য়ে যাক্—ইস্—অমনি !"

চক্রবর্তী মহাশয় তাহাকে অনেক কষ্টে ঠাণ্ডা করিয়া বলিলেন—'তা হোলে নেহাৎ যখন ব'লছ—তবে দেখ দিন ছয় সাতের মধ্যে যদি ঠিক করতে পার।—মাগি যেন ঘুনাক্ষরে না প্রকাশ করে। এদিকে সব ঠিক থাকবে, একদিন রাত্তিরে গিয়ে চুপি চুপি কাজ সেরে আসব ; তুমি, পুরুৎ

আর আমি। বিয়ের লগ্নের জন্যে অতটা ভেবো না; শুধু দেখো যেন বাড়ি থেকে যাত্রা করবার সময়টা ভাল থাকে।'

[৫]

বাল্য-বিবাহ-রোধিনী সভার জরুরি মীটিং বসিয়াছে। কয়েক দিন সভার কার্য ঠিক মত না হওয়ায় কতকগুলা প্রস্তাব জমিয়া উঠিয়াছে। তাহা ভিন্ন কতকগুলি আবশ্যকীয় নূতন প্রস্তাবও উত্থাপিত হইবে এরূপ নোটিস পাওয়া গিয়াছে, সভার বিজ্ঞাপনের নিচে লাল পেন্সিলে দাগ দেওয়া লেখা ছিল,—'দয়া করিয়া কেহ যেন বাজে তর্ক তুলিয়া সভার অমূল্য সময় নষ্ট না করেন।'

সভাপতি চক্রবর্তী মহাশয়ের সন্ধ্যা আহ্নিক এখনও শেষ হয় নাই; সকলে তাঁহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কয়েক জন একখানা মাসিক পত্রের 'মন্দিরের পথে' নামক চিত্রের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়াছে। কেব্লা গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিয়াছে—'আজি এসেছি, আজি এসেছি, এসেছি'—আর সতীনাথ চিৎ হইয়া বাম হস্তে সিগারেট টানিতে টানিতে ডান হাতে চৌকির উপর কাওয়ালী বাজাইয়া যাইতেছে। সতোষ ক্রমাগত ঘড়ির দিকে চাহিতেছিল। চক্রবর্তী মহাশয়ের মেয়েটিকে দেখিতে পাঠাইয়াছিল—বাবার কত দেরি; সে আসিয়া খবর দিল—কাপড় চোপড় ছাড়্ছেন, একটু সময় নেবে; আপনাদের শুরু করে দিতে ব'ললেন।

ফেলারাম সতোষের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—"তা হ'লে গ্রীন-রুমে ঢুকেছেন!"

সভার সেক্রেটারি টেবিলে দুইটি চাপড় দিয়া বলিল— "তা'হলে

আমাদের শুরু ক'রে দেওয়াই ভাল; চক্রবর্তী মহাশয়ের এখনও একটু দেরি আছে। আজ 'এজেণ্ডা' একটু ভারী—সময় নেবে। মহীতোষ বাবু ততক্ষণ সভাপতির আসন অলং—"

নেপালচন্দ্র কোণে একটা বাঙ্গলা দৈনিক পড়িতেছিল; কাগজটা রাখিয়া হঠাৎ চিৎকার করিয়া উঠিল,—"ওঃ সর্বনাশ হ'য়ে গেছে একেবারে!"

সকলে বিস্মিত ভাবে তাহার পানে চাহিল। নেপাল বলিল—"নোয়াখালির ওপর দিয়ে একটা মস্ত বড় সাইক্লোন পাস ক'রে গেছে—প্রায় সাতখানা গ্রাম উড়িয়ে নিয়ে গেছে!"

কেহ বলিল—"এ আর নতুন কথা কি?—ওখানে রোজ পাচটা ক'রে ওরকম সাইক্লোন বইছে।" কেহ বলিল—"এ সব জেনে-শুনেও লোকে বাড়ি করে ওখানে?" কেহ বা দয়া পরবশ হইয়া বলিল—"একটা রিলিফ ফণ্ড ষ্টার্ট করা উচিত।" গজানন পলিটিক্স লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করে, বলিল—"যদ্দিন ফরেন গবর্ণমেণ্ট আছে—"

হারাধন সতীনাথের পানে চাহিয়াছিল। সতীনাথ কিছু একটা না বলিলে সে প্রায় কোন বিষয়ে মত দেয় না, কারণ তাহার নিয়ম হইতেছে, সতীনাথ যাহা বলিবে ঠিক তাহার উল্টা অভিমত দিয়া আরম্ভ করা।

সতীনাথ বলিল—"বোধ হয় ছাপবার ভুল আছে—সাতখানা গ্রাম না হ'য়ে ঘর হ'লে বিশ্বাস ক'রতে রাজি আছি।"

হারাধন বলিল—"সতীনাথ বাবু বিশ্বাস ক'রবেন না জানলে, বোধ হয় ঝড়টা একটু বুঝে সুঝে কাজ ক'রত; বেচারার মেহনতই সার হ'ল!"

সতীনাথ বলিল—"না, তা কেন হারাধন বাবু? সব কথা নির্বিবাদে মেনে নিতে পারে এমন বর্বরদের তো সমাজে অভাব নেই।"

একজন বলিল—"সাবাস!"

ঘরের এক দিকে বেঞ্চির উপর কয়েকজন বসিয়াছিল, তাহারা আসিয়া চৌকির উপর ভীড় করিয়া বসিল।

নেপাল গলা চড়াইয়া বলিল—"সত্যে, বর্বর ব'লে ব'সলি কাকে র‍্যা? —খুব কি সভ্যতার পরিচয় দেওয়া হ'ল? এই তো আমি বিশ্বাস ক'রছি।—এর চেয়ে, ভদ্রলোক হ'য়ে কেউ অমন একটা গালাগাল দিয়ে ব'সতে পারে, এইটেই বিশ্বাস করা বেশি শক্ত ব'লে মনে হয়।"

ঘরটা সরগরম হইয়া উঠিল। একজন বলিল—"এপোলজি চাওয়া উচিত।"

আড়াল হইতে অপর একজন বলিল—"ঘাড় ধ'রে এপোলজি চাওয়াও।"

গজানন বলিল—"বলবেই তো 'বর্বর'; অতি-বিশ্বাসে দেশটা অধঃপাতে গেল।"

গিরিজা মোক্তারি পড়ে, সে আঙ্গুলের পর্ব গুণিয়া বলিল—"তা হ'লে আর বর্বর হ'তে বাকি রইল কে?—যে খবরটা পাঠিয়েছে সে বর্বর, খবরের কাগজের এডিটার বর্বর, চাকরির ভয়ে বেচারা প্রিণ্টার ছেড়েছে, —সে বর্বর—"

ফেলারাম বলিল—"চলুগ্, চলুগ্; খুব সেশন মোকদ্দমা চালাচ্ছিস্ গির্‌জে!"

একজন উৎসাহী নূতন মেম্বর আফশোষ করিয়া করুণ স্বরে বলিল—"এই কি সভার বিশেষ অধিবেশনের চেহারা! কাজের কথার সঙ্গে সম্বন্ধ নেই...." কিন্তু তাহার কথায় কেহ কর্ণপাত করিল না।

সতীনাথ কখনও মেজাজ হারাইত না, সে খুব শান্তভাবে বলিল—"আচ্ছা, বর্বর যাঁকে ব'ললাম তিনি তো চুপ ক'রে মেনে নিলেন কথাটা;

আর-সবার এত মাথা ব্যথা কেন?"—বলিয়া একবার চকিতে হারাধনের পানে চাহিল।

হারাধন এতক্ষণ মনে মনে প্রথম আক্রমণের একটা লাগসই উত্তর হাতড়াইতেছিল;—তাহা তো পাইলই না, তাহার উপর এই দ্বিতীয় চোট!—সে কথা কহিল না? চৌকির একদিকে নোয়াখালির রামেন্দ্র চন্দ্র বসিয়াছিল, কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া গিয়া তাহার হাতটা ধরিয়া টানিতে টানিতে মাঝখানে বসাইয়া বলিল—"বলুন রামেন্দ্র বাবু, আপনাদের তো দেশ, বলুন শপথ ক'রে আপনাদের দেশে এ রকম ঝড় ওঠে কিনা। আজ হ'য়ে যাক্ একটা হেস্তনেস্ত।"—বলিয়া পাঞ্জাবীর আস্তিন গুটাইতে লাগিল।

চক্রবর্তী মহাশয়ের সাত বছরের মেয়েটি দুয়ারে ঠেস্ দিয়া তামাসা দেখিতেছিল, উর্দ্ধশ্বাসে ভিতরে ছুটিয়া গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—"ও বাবা, ছুটে এ'স, শুরু হ'য়ে গেছে—এইবার হাত গুটুচ্ছে।"

"যত সব লক্ষ্মীছাড়াদের নিয়ে প'ড়েছি, বাড়িতে যেন ডাকাত-পড়া লাগিয়েছে। একবার শুভ কার্যটা হ'য়ে গেলে আপদগুলোকে আর চৌকাঠ মাড়াতে দোব না। আবার দেখি, সে ব্যাটা কি এঁচে এসেছে। ঘটকাকে ব'ললাম ও মেয়েয় কাজ নেই—তা—" নিজের মনে এই সব বলিতে বলিতে নিতান্ত বিরক্ত ভাবে বাহিরের দুয়ার পর্য্যন্ত আসিয়া একেবারে প্রসন্ন মুখে চক্রবর্তী মহাশয় বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন, বলিলেন—"আজ আবার কি নিয়ে?"

ফেলারাম সংক্ষেপে বলিল—"নোয়াখালির ঝড়।"

"নাঃ, তোমাদের সব ছেলেমানুষি; এ রকম ক'রে কি কাজ এগোয়? কোথায় নোয়াখালিতে তুচ্ছ একটা ঝড় উঠেছে—"

কেবলা বলিল—"নেহাৎ তুচ্ছ নয়, ঠাকুদ্দা। নোয়াখালি তো জন

শূন্য হ'য়েইছে, সেখানকার রামেন্দ্রবাবু কলকাতায় এসে কোন রকমে প্রাণটা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, একটা ঝাপটা এসে তাঁকেও একটা আছাড় দিয়েছে।”

নেপাল উঠিয়া চক্রবর্তী মহাশয়ের সামনে আসিয়া বলিল—“এই তো চক্কোত্তী মশায়, আপনিই বলুন না—আপনার তো এই পঞ্চাশ ষাট বছর বয়েস হ'ল, অনেক দেখেছেন, ঝড়ে গোটা সাতেক গ্রাম উড়ে যাওয়া কি এতই অসম্ভব?”

চক্রবর্তী মহাশয় বলিলেন, “পঞ্চাশ হ'লে কত কি দেখব রে দাদা, কিন্তু তার তো এখনও দেরি আছে।....না, তবুও যে দেখিনি একথা বলছি না—তবে....”

ঘরটা হঠাৎ ঠাণ্ডা হইয়া গেল। মেম্বরদের মধ্যে শত্রুমিত্র-নির্বিশেষে কানাকানি চোখোচোখির ধুম পড়িয়া গিয়াছে লক্ষ্য করিয়া, চক্রবর্তী মহাশয় একটু থতমত খাইয়া ফড়াৎ ফড়াৎ করিয়া গুড়গুড়ি টানিতে লাগিলেন; এবং ফেলারাম যদিও ‘ঠাকুদ্দার কিসের বয়েস’ বলিয়া উৎসাহ দিবার চেষ্টা করিল, তিনি বিশেষ উৎসাহ পাইলেন বলিয়া বোধ হইল না। বলিলেন, “বয়েস হবে না কেন রে দাদা, হ'য়েছে; ঝড়ও অনেক দেখেছি,—তবে সে সব কথা সভায় কেন? আজকের এজেণ্ডা কি?—আমার আবার এক জায়গায় বরাৎ আছে রাত্তির আটটার সময়।”

সতীনাথ ঘড়ির পানে চাহিয়া বলিল—“তা হ'লে সাড়ে সাত তো প্রায় বাজে। নাও হে সেক্রেটারি, গত মীটিং-এর প্রোসিডিংস্-গুনো কন্‌ফারম্ করিয়ে নাও; তারপরে—”

ফেলারাম বলিল—“তাতে তো শুধু ময়াল সাপের লম্বাই আর সেই উড়েটার মটর চাপা পড়া নিয়ে তর্ক হ'য়েছিল,—সে সব আর বাল্যবিবাহ-

রোধিনীর খাতায় তু'লে কি হবে? তার চেয়ে মহীতোষবাবু, আপনার কি সব প্রস্তাব আছে ব'লে ফেলুন।"

"সেই তেতাল্লিশ বছরের ক'নের ব্যাপারটা?—মহীতোষবাবু তোমাদের দ্বিতীয় মনু ব'লতে হবে"—বলিয়া চক্রবর্তী মহাশয় একটু কাষ্ঠহাসি হাসিবার চেষ্টা করিলেন। "তা বেশ, সব টপটপ ক'রে সেরে দাও; আমি—হুঁ"

চা আসিতে লাগিল। এটি চক্রবর্তী মহাশয়ের নূতন বন্দোবস্ত, ঘটকের পরামর্শে জারি হইয়াছে।

মহীতোষ কাপ হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল ?—"আগে উপেনবাবুর প্রস্তাবটা পাশ হ'য়ে যাক্ না ; তা'হলে আমার ও-প্রস্তাবটা না-ও দরকার হ'তে পারে'—বলিয়া উপেন্দ্রের পানে চাহিল।

উপেন্দ্র দাঁড়াইয়া উঠিয়া প্রস্তাব করিল, 'যেহেতু বাঙ্গলা দেশে বিধবা বিবাহের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়, এই সভা ধার্য্য করিতেছে যে, যাঁহারা বিপত্নীক হইবার পর পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা বিধবা ভিন্ন অন্য কাহাকেও বিবাহ করিতে পারিবেন না।'

যাহারা মহীতোষের জোটে ছিল তাহারা একবার চক্রবর্তী মহাশয়ের পানে আড়ে চাহিয়া লইল। চক্রবর্তী মহাশয় বলিলেন—'বাঃ, এ তো চমৎকার ব্যবস্থা। আমি বলি মহীতোষ বাবুর সেই তেতাল্লিশ বৎসরের ক'নের প্রস্তাবটাও এর সঙ্গে মিলিয়ে দাও না, আর ছেড়ে কি হ'বে? লিখে দাও—কনে তেতাল্লিশ বৎসরের বিধবা হওয়া চাই।"

হারাধন বাঙ্গলা দৈনিকটা একমনে পড়িতেছিল ; বলিয়া উঠিল—"সাতটা কেন, এই তো স্পষ্ট লেখা র'য়েছে—'সতেরটা গ্রাম উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে'—আগের 'এক'টা সে রকম ভাল ক'রে জাগে নি।....এই

নিন—এইবার কি ব'লবেন বলুন"—বলিয়া কাগজটা সতীনাথের গায়ে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

চক্রবর্তী মহাশয় বলিলেন—"আবার তো ঝড় উঠল, আমি তা হ'লে উঠি, অনেকটা যেতে হ'বে। তোমরা যা' করবার ঠিক ক'রে নাও।"

উপেন বলিল, "একটু বসুন, মহীতোষ বাবু কি নেমন্তন্নর কথা ব'লছিলেন; তা'তে আপনার মত বিশেষ দরকার। কৈ, মহীতোষ বাবু।"

মহীতোষ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—"আমার সানুনয় অনুরোধ এই যে, সভার পরের বৈঠক আগামী রবিবার আমাদের গ্রামে হয়। এইরূপ ভাবে দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়ে মাঝে মাঝে সভা ক'রবার যে কত উপকারিতা তা' আর আপনাদের বোধ হয় বোঝাতে হবে না। আমাদের গ্রামের সকলেই আমার মুখে সভার উদ্দেশ্য আর কার্যাবলীর কথা শুনে বড় আগ্রহ প্রকাশ ক'রছেন; বৈঠকের জন্য বাড়ি পর্যন্ত আমি ঠিক ক'রে এসেছি। আর, যেহেতু এটা সভার প্রথম বাইরে যাওয়া, আমি সমস্ত ভার বহন করছি। এখন সভাপতি মহাশয়ের আর আপনাদের দয়া ক'রে মত দেওয়া।"

ঘরের অমন কড়া বিদ্যুতের আলো চক্রবর্তী মহাশয়ের চোখে ধাঁ করিয়া যেন ধোঁয়াটে হইয়া গেল। তিনি যেন অনেক দূর হইতে অস্পষ্ট শুনিতে লাগিলেন,—"বাঃ চমৎকার আইডিয়া....ধন্যবাদ মহীতোষ বাবু....চক্রবর্তী মশায় তো আগে রাজি হবেন....থ্রী চীয়ার্স ফর্ মিষ্টার মহীতোষ রায়!—"

মাথাটা আবার ঠিক হইলে চক্রবর্তী মহাশয় বলিলেন, "আমায় তা হ'লে ছাড়ান্ দাও। আর কিছু নয়—তবে পরের বাড়ি গিয়ে হল্লা করা—বিদেশে...."

মহীতোষ বিনীত ভাবে দাঁড়াইয়া ব[illegible] "[illegible]সব কিছু ভারতে হবে না। আমার এক বিধবা মাসির [illegible] তিনটি প্রাণী তাঁরা—আমাদের বাড়ি গিয়েই থাকবেন। বাড়ি[illegible]মের একটু একটেরেয়[illegible]পাড়ার ছেলেরা বড় উৎসাহ ক'রে সাজাবার ভার নিয়েছে [illegible] "মহীদা, সাজাব এমন যে রায়চৌধুরীদের [illegible] বাড়ির [illegible] মানবে...."

চক্রবর্তী মহাশয় দাঁড়াইয়া উঠি[illegible] তা' বেশ, তবে আমায় নিয়ে এই বুড়ো বয়সে টানাটানি করা কেন—তোমরাই চালিয়ে চুলিয়ে নিও।"

ফেলারাম কিসের "বিয়ে...." বলিয়া চক্রবর্তী মহাশয়ের ভাব দেখিয়া অর্ধেক পথেই থামিয়া গেল।

মহীতোষ বলিল—'হ্যাঁ, আর একটা কথা;—যদিও রবিবারই আপাতত ঠিক রইল, তা হ'লেও পাকাপাকি ভাবে সভার দিনটা দু'দিন পরে ব'লব। একটু আয়োজন টায়োজন ক'রতে হবে তো।"

চক্রবর্তী মহাশয় ঘড়ির পানে চাহিয়া বলিলেন—"ওঃ, বড় দেরি হ'য়ে গেল।" বাহিরে আসিয়া হাঁকিয়া বলিলেন,—"ওরে দোরটোর সব বন্ধ ক'রে যা; আমি একটু বাইরে চ'ললাম।"

*   *   *   *

চক্রবর্তী মহাশয়ের বরাৎ ছিল হেদোর ধারে;—একটা সুপুরি গাছ নির্দিষ্ট করা আছে, সেখানে ঘটক আসিবে; বাড়িতে আসা নিরাপদ নয় বলিয়া কয়েক দিন ধরিয়া এই রকম বন্দোবস্তই চলিতেছে।

ঘটক সব শুনিয়া বলিল—"ইস, বেটা ভারি মতলববাজ তো! আচ্ছা থাক রবিবার, আমি বিয়ের দিন বদলে দিচ্ছি।"

"সেও হাতে রেখে ব'লেছে; রবিবার পাকাপাকি করে নি। তুমিও যেদিন বিয়ের দিন ঠিক ক'রবে—সেও ঠিক সেইদিন মীটিঙের

ছুতো ক'রে সেখানে দলবল উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে কাজ পণ্ড করবে। তার চেয়ে আর হ্যাঙ্গামে কাজ নেই—আর সে কুচক্রী মাগিও যখন এর মধ্যে রয়েছে···বুঝতে পারছনা? আর বয়সও হোল তো—চোল্····"

"ঐঃ, বয়েস বাড়িয়ে বলা তোমার কেমন একটা রোগ দাঁড়িয়ে গেছে, দাদা। চল্লিশ আবার একটা বয়েস?—ও বয়সে সাহেবদের তো দুধের দাঁতও ভাঙে না।"

"কে জানে, তোমারও কেমন জিদ্ ধ'রে গেছে; যা ভাল বোঝ করো। তবে ওখানে অসম্ভব। সব বেটা যেন ভেতরে ভেতরে জেনে গিয়ে একটা মতলব আঁটছে ব'লে বোধ হোল।"

"কেন, ব্রহ্মাণ্ডে আর মেয়ে নেই? ক' গণ্ডা চান আপানি?"—বলিয়া ঘটক একটু চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে একটু হাসিয়া বলিল—"ব'লতে সাহস করি নি দাদা, এই সেদিন গিয়ে লক্ষ্য ক'রলাম—মেয়েটির অঙ্গে একটু দোষ ছিল।"

"কি রকম?"

"যাক্ সে কথা, ও না হ'য়েছে ভালই হ'য়েছে। ছোঁড়ার ব্যাপার দেখে মনস্থির ছিল না, কাজেই মাগির জোচ্চুরিটা একটু চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল। জাঁহাবাজ মাগি বটে! ধূর্জটি ঘটকের চোখেও ধূলো দিলে। এইবার মেয়ে দেখতে যাব যখন, দাদাকেও একবার দয়া ক'রে যেতেই হবে—হেঁ—হেঁ—ছোট ভাইয়ের এইটুকু আবদার রাখতেই হবে।····"

ফীট্-অফ্-প্রিসেপ্টার

রাত্রি প্রায় দেড়টা; বিছানায় প্রবেশ করিয়া মশারি ফেলিতেছি, বাহিরে ত্রস্ত কড়া নাড়ার শব্দ হইল। মুখটা একটু কুঞ্চিত করিয়া নামিয়া গেলাম, দুয়ার খুলিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "আরে, ফীট-অফ-প্রিসেপটার যে! এত রাত্রে অতদূর থেকে?"

গুরুচরণের এ-নামটা তাহার নিজের গ্রহণ করা, আমি দিই নাই।... কোনও কারণে মুখে খুব একটা বিপন্নভাব, একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "আজ রাতটা এখানেই একটু মাথা গুঁজে থাকতে হবে মশাই, কাল যা হয় একটা ব্যবস্থা করা...."

আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলাম,—"কালীঘাটের বাড়ি কি হ'ল?"

গুরুচরণ একবার পিছন দিকে চাহিয়া আমায় অল্প একটু ঠেলিয়াই ভিতরে প্রবেশ করিতে করিতে বলিল,—"মা বিরূপ হলেন; আর কালীঘাটের ত্রিসীমানার মধ্যে থাকা চলবে না,—লড়াই পর্যন্ত তো নয়ই। ....ভেতরে আসুন সব বলছি—দোরটা বন্ধ করে দিন...."

গুরুচরণ যাহা বলিল, সেটা বুঝিতে হইলে তাহার পূর্ব-পরিচয় একটু জানিয়া রাখা ভাল। সেটা সবিস্তারে বলিবার চেষ্টা না করিয়া একটা সংক্ষিপ্তসার দিতেছি। আমার সঙ্গে পরিচয়ের ইতিহাসটাও বারান্তরের জন্য রাখিয়া দিলাম।

গুরুচরণ অম্বিকাচরণের পুত্র। জীবিতাবস্থায় কালীঘাটের অম্বিকা-চরণের যতটা নামডাক ছিল, এখন অবশ্য ততটা নাই।—নশ্বর জগতে কাহারই বা থাকে? তবুও অনেকেরই কিছু কিছু জানা থাকা সম্ভব বলিয়া, আর তাহার সম্বন্ধে নূতন করিয়া কিছু বলিলাম না। বাপের

মৃত্যুর পর ছেলে অর্ডার সাপ্লাই, ইন্সিওরেন্স, দৈব মাদুলি, হোমিওপ্যাথি, ম্যারেজ-বাই-পোষ্ট প্রভৃতি পাঁচ রকম লইয়া ফলাও ব্যবসায়ের মালিক হইয়া বসিল। ব্যবসায়ের সবচেয়ে বড় অঙ্গ ছিল, কালীঘাটের যাত্রী ধরা। গুরুচরণের নিজের মুখের কথা,—"মায়ের দয়ায় একটা দলকে একবার যদি হোটেলটায় টেনে তুলতে পারি মশাই তো, কিছুদিনের জন্যে নিশ্চিন্দি—ছেলে-বুড়ো, নেড়ি-গেঁড়ি নিয়ে আসে, সব ধান চাল বিক্রি ক'রে হাতে কিছু পয়সা নিয়ে। মা সেগুলি তাঁর সেবকের বাক্সয় তুলিয়ে দেন—মায়ের নিজের পূজো আছে; বাচ্চাগুলোর মধ্যে দুচারটেকে বোধ হয় অসুখেই পড়িয়ে দিলেন—হোমিওপ্যাথি চালালাম, কিছু এসে গেল; বৌয়ের ছেলে হয় না, দৈব মাদুলি গছিয়ে দিলাম,—দু টাকা, আড়াই টাকা, চার টাকা, ছ' টাকা—যেমন পার্টি। কিছু ইনসিওরেন্সের কেসও করেছি।"

যদি প্রশ্ন করিলাম—দৈব মাদুলিতে হয় ফল?—গুরুচরণ ডান চোখের কোণটা বুজিয়া ঠোঁটের বা দিক কুঁচকাইয়া এক অদ্ভুত ধরণের হাসির সহিত বলে—"হোল, ভালো, না হোলে 'ম্যারেজ বাই পোষ্ট' রয়েছে কি করতে? দোসরা বৌয়ের ব্যবস্থা করে দিই। আরও কিছু হাতে আসে জগন্মাতার দয়ায়। চোখ আর ঠোঁটর কোণ আরও [illegible]পিয়া খিক্, খিক্ করিয়া হাসে।

এসব ওদিককার কথা। তাহার পর লড়াই বাধিল, গোরাপল্টনে কলিকাতা ছাইয়া গেল। প্রথমে ইংরেজ টমি, তাহার পর অ্যামেরিকানরা আসিয়া তাহাদের জায়গা লইল। প্রথমে আসিয়া দিন কতক ঘরের কোণেই কাটাইল, তাহার পর ট্রামে, বাসে, রিক্সায়—চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। কতকগুলার ধরিল শিক্যারের নেশা,—অন্য শিকার নয়—ক্যামেরা শূটিং: আজব দেশ ইণ্ডিয়া—ইহার কোথায় কি বৈচিত্র্য আছে,

ফটোগ্রাফির ফাঁদে ধরিয়া ফেলিতে হইবে........বাপে-খেদান মায়ে-তাড়ান ছেলের মতো ক্যামেরা হাতে টো টো করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়—কোথায় পোড়ো মন্দির, কোথায় একটা টিপি, কোথায় সাপুড়ে সাপ খেলাইতেছে ....ক্যামেরাটা পেটের উপর ধরিয়া দাঁড়াইল, টিক্ করিয়া একটা শব্দ ;—আবার অন্য শিকারের খোঁজে চলিল।

ইণ্ডিয়াতেও যে আবার শিকার করিবার জন্য তা-বড়, তা-বড় শিকারীরা ওৎ পাতিয়া আছে, অতটা ভাবিয়া উঠিতে পারে না।...... ইংরেজ নয় কি না—তাহারা বরং ঘা খাইয়া খাইয়া অনেকটা দোরস্ত হইয়া উঠিয়াছে, নিজের গণ্ডি ছাড়িয়া সহজে বাহিরে পা বাড়াইতে চায় না।

যখন এইরকম অবস্থা, একদিন কালীঘাটের দিকে গিয়া দেখিলাম গুরুচরণ সাইনবোর্ডে নিজের নামের পাশে একটা ড্যাস দিয়া বেশ গোটা গোটা ঝক্ঝকে শাদা অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছে—Feet of Preceptor. অন্য কাজেই যাইতেছিলাম, কিন্তু বিশেষ কৌতূহল হওয়ায় দাঁড়াইয়া পড়িয়া দুয়ারের কড়া নাড়িলাম। গুরুচরণ বাহির হইয়া বিস্মিতভাবে হাসিয়া বলিল—"আরে আপনি! আমি ভাবলাম, বেটা ষ্টুয়ার্ট বুঝি জ্বালাতে........"

কথাটুকু যেন মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেছে এইভাবে হঠাৎ থামিয়া গিয়া বলিল –"আসুন ভেতরে।"

বলিলাম,—"বসতে পারব না বেশিক্ষণ—লম্বা ইংরেজী টাইটেল দেখলাম— বাইপোষ্ট আনালে নাকি ?"

গুরুচরণ ঠোঁটের কোণটা কুঞ্চিত করিয়া বলিল—"ধোঁকা খেয়ে গেলেন আপনিও ? আমারই নামের ট্রান্স্লেশন যে !—গুরুস্য চরণ—গুরুচরণ—Feet of Precepor.

সত্যই তো ;—অতটা ভাবিয়া দেখি নাই, হঠাৎ বিস্ময়ের ঝোঁকে। বিস্ময়টা কিন্তু লাগিয়াই রহিল, বরং উগ্রতর হইয়াই প্রশ্ন করিলাম—“তা হঠাৎ নামের অনুবাদ ?”

গুরুচরণ চোখের কোণে আমার পানে চাহিয়া বলিল—“অ্যামেরিকানরা এসে গেল যে !........”

তবু কিছু বুঝিতে না পারিয়া বলিলাম—“আসুক, তার সঙ্গে Feet of Preceptor-এর কি সম্বন্ধ ?”

হাসিটার মধ্যে ব্যঙ্গের অংশ বাড়াইয়া দিয়া গুরুচরণ বলিল—“মাস্টারি করতেন, বুঝতে দেরি হবে ! বিবেকানন্দের শিষ্য যে সব !—বেলুড়ে অত বড় মন্দির হাঁকড়িয়ে দিলে গুরুর-গুরু রামকৃষ্ণের পাথরের মূর্তি বসিয়ে। কেন, বিবেকানন্দের মূর্তি বসাতে পারত না ?—জানে ইণ্ডিয়া গুরুপূজোর দেশ ; শিষ্য গুরুর পায়ের তলায়।...মা-ই বুদ্ধিটা বাৎলে দিলে—চুরি নয়, চামারি নয় ; নিজের নামের ইংরেজীটুকু ক'রে চোখের সামনে একটু ধরা। যেদিন বুদ্ধিটুকু হ'ল তার পরদিন নয়, তারপর দিন থেকে শুরু হয়ে গেল বেটাদের আনাগোনা ; দেখেন না সারাদিন কিরকম ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায় ? সব অ্যামেরিকান ইউনিভার্সিটির ছেলে—ইণ্ডিয়াকে জানতে চায়, দেখতে চায়, ইণ্ডিয়ার বই পড়তে চায়...'মিস্টার ফিট-অফ-প্রিসেপ্‌টার, তুমি রামকৃষ্ণ-ভিভেকানণ্ডা সম্বন্ধে কি জান ? তোমাদের শাস্ট্রাজ্‌ পড়তে চাই'...সে এক এলাহি কাণ্ড—নাইবার খাবার ফুরসৎ পাওয়া যায় না।....পেটের ধান্দা করে ফুরসৎ নেই,—কে অত রামকিষ্ণের খবর রাখে মশাই ? ছিল একটা লোক এই পর্যন্ত জানি। চিৎপুরের গতি মণ্ডলকে গিয়ে ধরলাম—প্রেস আছে একটা, কিছু বই টই ছাপায়। বললে—'কোথায় আছ ? গোটাকতক কলেজের ছেলে ছুটকে-ভটকে এসে পড়েছে—বাকি সব আমারই মতন,

"আরে, ফাঁট্-অফ-প্রিসেপ্টার যে! এত রাত্রে অতদূর থেকে!" ১৫৭ পৃঃ

রামকেষ্ট-কথামৃত পড়বে না হাতি! খরচ ক'রে ছাপিয়ে উইয়ে খাওয়ান!

"গতি মণ্ডলের পরামর্শেই একটা স্কুলের ছেলেকে কিছু দিয়ে বিদ্যে-সুন্দরের মতো খানকতক নাম করা বই ট্রানস্লেশন করিয়ে গতি মণ্ডলের প্রেস থেকে ছাপিয়ে ঘরে তুললাম;—শাস্ত্র-শাস্ত্র করছে, গতি মণ্ডল 'বাৎস্যায়ন' বলে একটা বইও দিলে ঢুকিয়ে। বই প'ড়ে কয়েক বেটা গেল ভড়্কে, আসা বন্ধ ক'রে দিলে। কিন্তু সে মাত্র কয়েক জন; তারা যেমন গেল, অন্য সবাই একেবারে গাঁদি বেঁধে আসতে লাগল—'মিষ্টার ফাট-অফ-প্রিসেপ্টার, তোমাদের শাস্ট্রাজ দাও, আরও ট্রানস্লেশন ক'রে দাও'—সে এক এলাহি কাণ্ড, বইয়ের যোগান দিয়ে উঠতে পারি না।"

বলা বৃথা জানিয়াও বলিলাম—"ঐ সব বই প'ড়ে আমাদের সম্বন্ধে কি একটা নিচু ধারণা হ'য়ে যাচ্ছে সেটা একবার ভেবে...."

বাধা দিয়া গুরুচরণ চোখের কোণে একটু হাসিয়া বলিল—"ওদের সম্বন্ধেই বা আমাদের ধারণাটা কি উঁচু হ'চ্ছে মশাই? বেটারা বিবেকা-নন্দের নাম ক'রে এসে বিদ্যেসুন্দর নিয়ে কাড়াকাড়ি লাগিয়ে দিচ্ছে!"

খিক্ খিক্ করিয়া হাসিয়া একটু বক্র দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া থাকিয়া আবার শুরু করিল—"এই গেল শাস্ত্রের কথা। আসছে দুটো পয়সা ঘরে, মিছে কথা বলব না। এ ভিন্ন ফটো তোলার বাই আছে বেটাদের।....আদি-গঙ্গার ঘাটের জগন্নাথ, মহাবীর-হনুমান, মা-কালী, এইরকম কড়া কড়া দেবতাদের ফটো;—সেবায়েৎদের সঙ্গে খাতির আছে, ব'লে ক'য়ে সুবিধে ক'রে দিই, তাতেও জগন্মাতার দয়ায় আসছে দুপয়সা। লুকুলে অধর্ম হবে...."

ক্ষুব্ধভাবে বলিলাম—"অন্তত এইখানটায় বড়ই অন্যায় ক'রছ গুরুচরণ। আমাদের মূর্তিরহস্য ওরা জানে না, বোঝবার ক্ষমতা নেই; আমরা

ভগবানের রূপের দিকে কখনও ঝোঁক দিই না, সবই তাঁর রূপ—তাই ভগবান ব'লে যখন একটা উবড়খাবড় পাথরকেও আশ্রয় করি—তখনও আমাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি-আন্তরিকতা সমানভাবেই তার ওপর গিয়ে পড়ে। ওরা সেটা তো মোটেই বোঝে না ; আমাদের কালী, আমাদের জগন্নাথ, আমাদের হনুমানের ফটো নিয়ে হাসি ঠাট্টা বিদ্রূপে, এমন কি গালা-গালিতে ওদের দেশের কাগজ ভরিয়ে....”

গুরুচরণের ডান চোখটা কোঁচকানই ছিল, হঠাৎ বাঁ ঠোঁট দুইটাও সেই সঙ্গে কোঁচকাইয়া লইয়া—খিক্ খিক্ করিয়া একটু হাসিয়া লইল, বলিল—“একবার দেখুকই না চটিয়ে, তাই জন্যেই তো দিচ্ছি সামনে ঠেলে—খিক্-খিক্—খিক্.... ওর মধ্যে একজন আবার একেবারে কাঁচা-খেকো দেবতা !”

—ওর সেই সয়তানী হাসি মুখে, চোখটা কুঞ্চিত করিয়া আমার পানে চাহিয়া রহিল।

এ সবই পূর্বেকার ইতিহাস, পরিচয় হিসাবে দিলাম। এদিনে রাত দুপুরে আসিয়া কড়া নাড়ার কারণটাও গুরুচরণের নিজের ভাষাতেই প্রকাশ করি।—

চেয়ারে বসিয়া প্রথমেই প্রশ্ন করিল—“আচ্ছা, কোর্টমার্শেল হ'লে ব্যাটাদের কি করে ব'লতে পারেন ?—ছেলেবেলায় শুনেছিলাম কোর্টমার্শেল মানেই দাঁড় করিয়ে বুকে গুলী দেগে দেওয়া, এখন বুঝি আর.... ?”

বাধা দিয়া প্রশ্ন করিলাম—“কেন ?”

“শুনলাম স্টুয়ার্ট বেটার কোর্টমার্শেল হবে।....খতম ক'রে দিলে নিশ্চিন্দি হওয়া যেত আর কি।...সমস্ত পথ যে কি ধুক্পুকুনিতেই কেটেছে—কেবলই ভয়—ঐ বুঝি বেটা পড়ল এসে।....বাইরের দোরে কি খট-খট আওয়াজ হ'ল একটা ?”

বলিলাম—"না তো।"

গুরুচরণ নিশ্চিন্ত হইয়া শুরু করিল—"গোড়া থেকেই সব বলি ; সেই তো অ্যামেরিকান টমিদের কথা বলেইছিলাম আপনাকে,—বেশ দু'পয়সা আসতে লাগল। ফটোগ্রাফ তোলার দিক থেকে তো আসছেই, এদিকে বইয়ের কাটতিও চলেছে বেড়ে ;—আজ দপ্তরি বেঁধে দিয়ে গেল, কাল নেই সে এক এলাহি কাণ্ড! ওরই মধ্যে আবার একটু হোম টোমও করি—ওরা হাঁ ক'রে দেখে, ফটো নেয় ;—মানে সবরকম টোপই ফেলে রাখলাম—যার যেটা রোচে।....এর মধ্যে গতি মণ্ডলের পরামর্শে একটা মারণবশীকরণের বইও ট্র্যানস্লেশন ক'রে বের ক'রে দিই।....একদিন হোমের ব্যবস্থা ক'রছি—বাইরের ঘরেই ক'রতাম—স্টুয়ার্ট ব্যাটা এসে ঘরে ঢুকল, হাতে ঐ বশীকরণের বইটা। চেয়ারে ব'সে ব'ললে—'মিষ্টার ফীট-অফ-প্রিসেপ্‌টার, তোমাদের এই শাস্ত্রাজে যে ব'লছে মানুষকে বশ ক'রে ফেলতে পারা যায়—এটা কি সত্যি?'

"কতই যেন প্রাণে লেগেছে এইভাবে ব'ললাম—'আমাদের শাস্ত্রাজকে সন্দেহ ক'রছ সাহেব? ওসব কি মানুষের লেখা যে মিথ্যে হবে?....একথা শুনলেও যে আমাদের কান অপবিত্র হয়!'

"দুহাতে দুটো কান একটু চেপে ধ'রে, দুটো হাত কপালে ঠেকালাম—একটু ভড়ং চাইতো? ছোঁড়াটা ভালো—একটু নিরীহ গোছের ; খুব কিন্তু হয়ে বললে—'না, না, মিষ্টার ফীট-অফ-প্রিসেপ্‌টার—তুমি অফেন্স নিও না—তোমাদের শাস্ত্রাজ খুবই বড় আর বিশ্বাসযোগ্য—আমরা যখন বনে জঙ্গলে ঘুরছি, তোমরা তখন কত উন্নত!....আচ্ছা, একটা কথা—ঐ যে বলছ বশীকরণ ওর আসল মানেটা কি? ধর, আমার যে গেব্‌ল্—সে আর আমেরিকা থেকে আমায় চিঠি দিচ্ছে না—রাগ করেই হোক বা যে জন্যেই হোক ; তোমার ঐ বশীকরণে চিঠি এসে পৌঁছুতে পারে আমার কাছে?"

একটু সাহস করে লেগে পড়তে হয়, বুঝলেন তো? বললাম—"আলবৎ পারে। কি রকম একটা টান ধরবে!"

বললে—'সে আমি খুব বিশ্বাস করি, মিষ্টার ফীট-অফ-প্রিসেপটার, ইণ্ডিয়ায় সব সম্ভব; কি করতে হবে আমায় তা হ'লে?'

বললাম—'দূরে রয়েছে—এ ক্ষেত্রে তোমায় একটা মাদুলি ধারণ ক'রতে হবে।'

লাগে তুক্, না লাগে তাক,—কে জানে সে বেটি বিয়ে-থা ক'রে ব'সে আছে কি না, একটু সন্দেহের রাস্তাও ছেড়ে রাখলাম, বললাম—'কাছে থাকলে কপালে মন্ত্রপূত সিঁদুর ছুঁইয়ে দিলে আর কোন কথাই থাকে না, তবুও মাদুলিতে বারো আনা চান্স আছে।'

'নিশ্চয় তোমায় দিতে হবে মাদুলিটা, মিষ্টার ফীট-অফ-প্রিসেপ্টার!'—ব'লে একেবারে হামড়ে প'ড়ল।

হোমটা ওরই সামনে একটু ঘটা ক'রে সেরে, খানিকটা ছাই একটা মাদুলিতে পুরে দিয়ে দিলাম। ব'লতেও হোল না—দু'খানি দশ টাকার নোট সামনে রেখে দিলে।....তা দেয় ভালো ওরা!

জগন্মাতার দয়া—দু'পুরুষ ধ'রে সেবা ক'রছি তো কায়মনোবাক্যে?—ঠিক তিনদিন পরে—হোমিওপ্যাথিক ব্যাগটা নিয়ে বেরুচ্ছি—হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির।—"মিষ্টার ফীট-অফ-প্রিসেপটার, ওয়াণ্ডারফুল—ওয়াণ্ডারফুল তোমাদের শাস্ত্রাজ্! আজ সকালে প্রথম ডেলিভারিতেই, আমার গের্লের চিঠি!—ওয়াণ্ডারফুল তোমাদের কাণ্ড!—ওয়াণ্ডারফুল ট্যালিস্‌ম্যান!"

সে যে কী ক'রে প্রশংসা ক'রবে, তা যেন ভেবে পায় না; অথচ বেটা ভেবে দেখলে না যে মাদুলি ধারণ করবার অন্তত হপ্তাখানেক আগেই সেখান থেকে তার চিঠি রওয়ানা হ'য়ে গেছে!....লবে পড়লে তো আর

বুদ্ধিশুদ্ধি থাকে না কিছু বেটাদের....আরও দশটা টাকা বকশিস দিলে!

অনেকক্ষণ ধ'রে নানারকম কথা হ'ল—শাস্ত্রে আরও সব কি কি আছে, কোন্ শাস্ত্র কত পুরোন, কারা সব লিখেছে—বিবেকানন্দ কোন 'শাষ্ট্রাজ্' লিখে গেছেন কিনা—নানান কথা। শেষকালে ওঠা-ওঠার সময় একটু কাঁচু-মাচু ক'রে ব'ললে—"মিষ্টার ফীট্-অফ-প্রিসেপ্টার, একটা কথা ব'লতে চাই, যদি পারমিশন দাও ..."

পারমিশন মানেই তো কিছু আমদানি, কেন দোব না, বলুন না?.... বললাম—"স্বচ্ছন্দে বল।"

একটু চুপ ক'রে থেকে ব'ললে—"ওয়াকাইয়ের মিস্ ইলিয়ট্‌কে আমি মরিয়া হ'য়ে ভালোবেসে ফেলেছি, মিষ্টার ফীট্-অফ-প্রিসেপ্টার, আমাদের কম্পানির ডানকান আর গীল্ডও তাকে চায়, কিন্তু আমি বেশ জানি তাদের ভালোবাসা লড়াই পর্য্যন্ত। আমি ওয়ার থামলেই তাকে বিয়ে ক'রে অ্যামেরিকায় নিয়ে যাব; কিম্বা সে যদি ইণ্ডিয়াতেই থাকতে চায়, আমিও এখানেই থেকে যাব—ওয়াণ্ডারফুল জায়গা হচ্ছে ইণ্ডিয়া। এখন কথা হচ্ছে, কি ক'রে বেচারিকে ঐ ডেভিল দুটোর হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া যায়....তোমাদের বশীকরণ এতে সাহায্য ক'রতে পারে?"

গুরুচরণ তাহার সেই হাসি লইয়া আমার দিকে একটু চাহিয়া রহিল, বলিল—"বুঝুন্ সয়তানিটা—আমেরিকা থেকে গেরলের চিঠি আসা চাই, আবার মিস্ ইলিয়টকেও পাওয়া চাই!....মনে মনে ব'ললাম—'মরগে যা বেটারা, তোদের হালই ঐ, আমার দুটো পয়সা এলেই হ'ল'!"

তবু একটু হাতে রাখলাম—জুয়া খেলাই হচ্ছে তো মশাই? স্টুয়ার্টকে বললাম—"পারবে না কেন?—পারে সাহায্য ক'রতে, তবে ব্যাপারটা একটু বেশি জটিল; গেরলের চিঠি পাওয়া নয়তো, যে এক কথায় হয়ে যাবে!...."

বলা শেষও হয়নি, মণিব্যাগটা বের করে দশ টাকার পাঁচখানি নোট চৌকির ওপর বিছিয়ে দিলে। বললে—"তোমাদের শাস্ত্রাজ সব পারে

"তুমি ঠিক ক'রে দাও, আরও বকশিস দোব তোমায়"

মিষ্টার ফীট্-অফ-প্রিসেপ্টার ; যতই দেখছি, ততই আমার বিশ্বাস বেড়ে যাচ্ছে। তুমি ঠিক ক'রে দাও, আরও বকশিস দোব তোমায়।"

জুয়া খেলাই তো? একটু সন্দেহের রাস্তা রেখে দিলাম তবুও; বললাম—"মন্ত্রপূত সিঁদুর কপালে ছুঁইয়ে দিলে কোন সন্দেহই থাকত না; কিন্তু সে তো আর সম্ভব নয়; আমি তোয়ের করে দিচ্ছি, কোন রকমে একটু মিস ইলিয়টের রুমালে লাগিয়ে দিতে পার যদি—একটুও, তো আশা হয়। মানে, মিস ইলিয়ট যখন রুমালে মুখ মুছবে, একটু না একটু ছুঁয়ে যাবেই কপালে, ষোল আনা না হোক, বার আনা চান্স থাকে।"

একেবারে উলসে উঠল—"মিষ্টার ফীট্-অফ-প্রিসেপ্টার, যেমন তোমাদের শাষ্ট্রাজ্ ওয়াণ্ডারফুল, তেমনি তুমিও একটা জীনিয়াস; অ্যামেরিকায় থাকলে প্রেসিডেণ্ট হ'তে পারতে! এ যা রাস্তা বাংলালে, এক বড় বড় নভেলিষ্টদেরই মাথায় আসে…"

সে প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ হয়ে উঠল।….হোমিওপ্যাথিক বাক্স রেখে দিয়ে ব'সে গেলাম হোমে….

গুরুচরণ হঠাৎ জিভটা কামড়াইয়া, মাথাটা একটু দুলাইয়া নিজের হইতেই বলিল—"রামঃ, তা কি পারি—জগন্মাতার সিঁদুর দিতে? কি একটা গো-পার্বণ ছিল, বৌ গরুটার ক্ষুরে তেল-সিঁদুর লাগিয়ে দিয়েছিল, তারই খানিকটা, একটা কচুপাতায় মুছে এনে, হোমের পাশে রাখলাম; শেষ হ'লে জল ছিটিয়ে স্টুয়ার্টের হাতে দিয়ে দিলাম।—ওঠবার সময় আরও একখানি দশ টাকার নোট চৌকির ওপর বিছিয়ে বললে—তোমাদের শাষ্ট্রাজ যদি মনস্কামনা পূর্ণ করে তো আরও বকশিস দোব, মিষ্টার ফীট্-অফ-প্রিসেপ্টার। ভয়ঙ্কর ভালোবাসি আমি মিস্ ইলিয়টকে।"

এবারেও তুক্‌টা লেগে গেল,—ত্রি-পুরুষ ধ'রে কায়মনোবাক্যে জগন্মাতার সেবা ক'রছি তো?….দিন সাতেক আর স্টুয়ার্টের দেখা নেই, ভাবলাম দিলে বুঝি বেটাকে আসামে ঠেলে, একটা ভালো খদ্দের হাতছাড়া হ'ল! এমন সময় হঠাৎ একদিন স্টুয়ার্ট এসে হাজির।….'কি সায়েব, ব্যাপার

কি ?'—"না, সব ঠিক হয়ে গেছে মিষ্টার ফীট্-অফ-প্রিসেপ্টার। ডানকানটাকে আসামে পাঠিয়ে দিয়েছে ; বাকি ছিল গীল্ড, তার সঙ্গে মিস ইলিয়টের হঠাৎ চটাচটি হ'য়ে গেল একদিন—হাউ ওয়াণ্ডারফুল তোমাদের শাষ্ট্রাজ, মিষ্টার ফীট্-অফ-প্রিসেপ্টার !—এদেশে যে ভিভেকানণ্ডার মতন লোক জন্মাবে—আমি মোটেই আশ্চর্য হচ্ছি না।....অবিশ্যি বিয়ে এখন সম্ভব নয়, তবে আমাদের আংটি-বদল হ'য়ে গেছে।"

ছোঁড়াটা বড়ঘরের ছেলে, হাতে একটা হীরের আংটি ছিল, তার জায়গায় একটা ম্যাকমেকে পাংলা মামুলি সোনার আংটি।—ছুঁড়িটা গছিয়েছে, আর কি !....মনে মনে ব'ললাম ; তোমায় গেরোয় ধ'রেছে আমি কি করব ? আংটিটা আগে দিয়ে দিলে আর সিঁদুরের হাঙ্গাম ক'রতে হ'ত না।....যাই হোক, সব ব'লে ক'য়ে—"হিয়ার ইউ আর"—বলে পাঁচখানি পাঁচ টাকার নোট চৌকির ওপর বিছিয়ে দিলে।

ভাবটা কিন্তু কেমন যেন চনমনে—যেন কি একটা ব'লতে চায়, ফুৎ করে উঠতে পারছে না। তারপর খানিকক্ষণ একথা-সেকথা বলার পর ব'লেই ফেললে। বলে—"মিষ্টার ফীট্-অফ-প্রিসেপ্টার, এই যে বশীকরণ ব'লে ব্যাপারটা তোমাদের শাষ্ট্রাজে রয়েছে, এটা কতদূর পর্যন্ত লাগসই হয় ? ধর—এই ধর—কোন ফেরোশাস জানোয়ার—যেমন ধর একটা টাইগার—তাকেও কি বশ ক'রে ফেলা যায় ?

ঘরে একটা সিংহবাহিনীর ছবি টাঙান ছিল, বললাম—"তোমার সন্দেহ হ'চ্ছে ? না হ'লে, ওটা কি ক'রে সম্ভব হ'ল, সায়েব ? তবে সিঁদুরটা আগে ছোঁয়াতে হবে তো ?"

বললে—"না, একেবারেই সণ্ডেহ নেই মিষ্টার ফীট্-অফ-প্রিসেপ্টার ; তোমাদের শাষ্ট্রাজ সব পারে—ওয়াণ্ডারফুল ক্ষমতা !"

ব'লে একটু চুপ ক'রে ভাবলে, তারপর হঠাৎ মুখ তুলে ব'ললে—

"তাহলে তোমায় আসল কথাটা বলি—আমাদের কম্পানীর অফিসার, ব্যাটা উডল্যাণ্ড অত্যন্ত হারামজাদা, একটা ম্যান-ঈটার টাইগারও তার কাছে ভেড়া, মিষ্টার ফীট-অফ-প্রিসেপ্‌টার! উঠতে-বসতে আমাদের যে কী নাকালটাই করে! বিশেষ ক'রে নজর হাজরির ওপর; একটু যদি এদিক-ওদিক হ'ল তো আর রক্ষে থাকে না। তবুও চালিয়ে যাচ্ছিলাম কোন রকমে, কিন্তু তোমাদের শাস্ত্রাজের জোরে এখন মিস ইলিয়টের মনটা একটু আমার দিকে চলেছে—এই সময় অত কড়াকড়ির মধ্যে থাকলে সব ভেস্তে যেতে পারে; তাই বলছিলাম—ওটাকে একটু হাত করবার যদি ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারতে...."

একটু লোভে প'ড়ে গেলাম মশাই—বেটার দেওয়ার হাতটা খুব দরাজ কিনা। ব'ললাম, 'হবে না কেন?—হবে, তবে ব্যাপারটা বড়ই জটিল—মিস ইলিয়টের মতন মেয়েছেলে নয়তো যে....'

দশ টাকার দশখানি আনকোরা নোট চৌকির ওপর বিছিয়ে দিয়ে ব'ললে—'জটিল তোমার সোজা ক'রে দিতেই হবে, মিষ্টার ফীট-অফ-প্রিসেপ্‌টার, তুমি টাকার জন্যে ভেব না; মিস্ ইলিয়টকে ভালোভাবে পাবার জন্যে আমি সমস্ত অ্যামেরিকাটা দিয়ে দিতে পারি।'....

সে বিনিয়ে বিনিয়ে অনেক কথা।"

গুরুচরণ একটা বিড়ি ধরাইয়া কয়েকটা টান দিল, তাহার পর আবার বলিতে লাগিল—"মিস ইলিয়ট একটা মেয়েছেলে, তায় সর্বদা মেলামেশা আছে, তার রুমালে একটু সিঁদূর লাগিয়ে দেওয়া শক্ত নয়; কিন্তু এ একটা অফিসার।—কি হয়, কি হয় একটা ধুক্‌পুকুনি লেগে রইল সমস্ত দিন। এসব কাজ তো একলা হয় না—একেবারে গোরা-পল্টন নিয়ে ব্যাপার!—য'তে বাগ্দিকে হাত করেছিলাম। সে ওদের ক্যাম্পে কাজ করে, খবরটা-আসটা দেয় মাঝে মাঝে। একটা বিয়ের কথাবার্তা

ঠিক করেছিলাম, বিছানায় ব'সে কুস্তি দুটো মিলোচ্ছি, এমন সময় য'তে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির। 'কিরে ব্যাপার থানা কি?'....বললে—'পালাও গোঁসইঠাকুর, এদেশ ছেড়ে পালাও; একটু ছাড়া পেলেই আগে তোমার ঘাড় মটকাবে।'

তার মুখেই সব শুনলাম। বলে—কত অফিসার এল গেল, গোঁসাই-ঠাকুর—এমনটা আর চোখে প'ড়ল না! হাঁড়ির মতন এই এতখানি, রাঙা টকটকে মুখ, নাকের নিচে একথাবলা গোঁফ, চোখ দুটি বাঘের মতন সর্বদাই জ্বলছে!—আর বউ-কাঁটকি শাউড়ির মতন অষ্টপ্রহর টমিগুলোকে দাঁতে পিষছে। অনেক তো দেখলুম—কিন্তু অমন দুষমণ অফিসার দেখিনি!

স্টুয়ার্ট তোমার কাছ থেকে সিঁদূর তো নিয়ে গেল; ছোঁক্-ছোঁক্ করে, কিন্তু দেবার সুবিধেই পায় না। শেষে রাত্তিরে একটু সুবিধে ক'রে দিলেন মা-কালী। খোলা তাঁবুর নিচে উডল্যান্ড সায়েব ঘুমুচ্ছে—নাক ডাকছে, যেন বাজ খসে পোলো; স্টুয়ার্ট সায়েব আমায় ডেকে ব'ললে—'এই অবসর! য'তে, যা গিয়ে সিঁদূরটা ছুইয়ে আয়।'........শোন কথা! আমি ঐ বুনো বাঘের মাথায় সিঁদুর ছোঁয়াই গে! বললাম—"কাজটা কিছু শক্ত নয় সাহেব, এক্ষুনি যেতে পারি; কেননা, যেই ছোঁয়াবো, তেক্ষুনি তো বশে এসে যাবে কিনা; তবে কথা হচ্ছে, তাতে তোমার তো কোন লাভ হবে না।'

"শুনে কি ভাবলে রগ দুটো চেপে। তারপর বললে—'আচ্ছা, তুই দেখ, কেউ আসে কিনা।'

"অফিসারগুলো নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুমোয় ব'লে বড়সায়েব এদিকে পাহারা একটু ঢিলে করিয়ে দিয়েছিল। ফাঁক বুঝে স্টুয়ার্ট তো খুট ক'রে ঢুকে পড়ল। একটা বড় দেবদারু কাঠের বাক্সের পাশে আড়াল হ'য়ে আমি দেখতে

লাগলুম।····গুটি গুটি ক'রে হামাগুড়ি দিয়ে খাটের পাশে মাথার পেছনটিতে গিয়ে বসল, তুবার হাতটা ঘুমন্ত অফিসারের কপালের কাছে নিয়ে গিয়ে টেনে আনলে, তারপর দুগ্গা-সিদ্ধি ব'লে দিলে আঙুলটা ঘ'সে—লাগা-মাত্তরই বশ হয়ে যাবে কিনা!

"মনে হ'ল যেন জাপানী বোমা খসে পড়ল, গোসাইঠাকুর!—হুজ্যাট্? বলে কঁ্যাক ক'রে স্টুয়ার্টের হাতটা ধ'রে চরখির মতন ঘুরে বসল সায়েব। সঙ্গে সঙ্গে সুইচ টিপে বাতিটা দিলে জ্বেলে।—সতীলক্ষ্মী ঘোষাল গিন্নীর মতন এক গাদা সিঁদূর সেই প্রকাণ্ড কপালে রগ-রগ ক'রছে।"

য'তে বাগ্দি এই পর্যন্ত দেখেছিল, তারপর প্রাণ নিয়ে সটকে পড়ে। তারপরেই বলে সে কী হৈচৈ! —সমস্ত ক্যাম্পটা যেন ওলটপালট হ'য়ে গেল।

কোর্ট মার্শাল হবে স্টুয়ার্টের, কি সাজা হবে তা বলতে পারলে না য'তে; বললে—'ফুরসৎ পাওয়া মাত্তরই খবরটা দিতে ছুটে এলাম গোসাই-ঠাকুর। যদি ছাড়া পায়, তো তোমায় ধনে-প্রাণে মারবে বেটা, যা চাউনি দেখলাম চোখে!'

শেষ করিয়া গুরুচরণ বলিল—"এই অবস্থা, এখন ভাবছি—দিল্লী পালাই, কি বম্বে?—এ তল্লাটে তো আর থাকা চলবে না।" বলিলাম—"দিল্লীই বোধ হয় তোমার সুবিধে হবে, কালীবাড়ি আছে একটা।

গুরুচরণ তাড়াতাড়ি হাত দুইটা যুক্ত করিয়া কপালে ঠেকাইল, বলিল—"আবার কালীবাড়ি!—দু-পুরুষ ধ'রে কায়মনোবাক্যে সেবা করলুম—এই তার পুরস্কার হ'ল? —একেবারে ভিটে থেকে উজোড় করে দেওয়া!"

বাদী

সন্ধ্যার পর বারান্দার কোণটিতে চুপচাপ করিয়া একটা ঈজিচেয়ারে বসিয়া আছি। একটি ঘনপল্লবিত জামরুল গাছের নিচে এইখানটায় অন্ধকার বেশ জমাট হইয়া নামে। আজকাল এই সময় মনটা তেমন ভাল থাকে না। সমস্ত দিন কলিকাতার রাস্তাঘাটে মৃত-বুভুক্ষিতের অসহ্য দৃশ্য; কোথাও একটু গল্প করিতে বসিলেই ওই আলোচনা, খবরের কাগজের পাতা খুলিলেই ওই কথা;—যতই দিনের অবসান হইতে থাকে মনটা ভারাক্রান্ত হইয়া আসে। সন্ধ্যা পর্যন্ত আর চলাফেরা করিবার উৎসাহ থাকে না, এই খানটিতে আসিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকি। এই যে অন্ধকার গাঢ় হইয়া অভিশপ্ত পৃথিবীটা লুপ্ত হইয়া যাইতেছে, কাছে-পিঠে কোথাও একটা প্রদীপের শিখা পর্যন্ত নাই যে, সে-অন্ধকারকে খণ্ডিত করিয়া সেই পৃথিবীর খানিকটা ব্যক্ত করিয়া ধরে—এইটি বেশ লাগে। ইচ্ছা করিয়া কিছু ভাবি না, অথবা আরও যথাযথভাবে বলিতে গেলে—কিছু না ভাবিবারই ইচ্ছা লইয়া বসিয়া থাকি। কিন্তু তবু আসিয়াই পড়ে ভাবনা—নানান্ রকম, বিশৃঙ্খল। কি অদ্ভুতভাবে মরা! মৃত্যুকে কি অদ্ভুত ব্যঙ্গ! যাহারা মারে তাহারাই আশ্বাসের কথা বলে, বাঁচাইবার অভিনয় করে, দানছত্র খোলে!...হইবে না?—কত বড় জাতির উত্তরাধিকারী! ইহাদেরই পূর্বপুরুষরা তো বিশ্বমাতার মূর্তি কল্পনা করিয়াছিল—এক হাতে ছিন্নমুণ্ড, এক হাতে বরাভয়।.... আপনি চটিলেন? বলিতেছেন, ওটা তত্ত্বের দিক? হয়তো ঠিক; বুঝি না। আমি শুধু ভাবি, তত্ত্বটা কি ফল ফলাইল, অথবা—আপনারই কথা ধরিয়া বলি—তত্ত্বই যদি তো, সেটি এই বিষবৃক্ষের গোড়াতেই কুঠার হানিতে পারিল না কেন?

অন্তরের সঙ্গে বাহিরের অন্ধকারও গাঢ় হইয়া আসিয়াছে, একটি মাঝবয়সী লোক শ্রান্ত গতিতে আসিয়া বারান্দার নিচেটিতে বসিল। অন্ধকারে যতটা বুঝিলাম, মনে হইল, এতই শ্রান্ত যে পা ঠিক রাখিতে পারিতেছে না। ছেঁড়া ময়লা কাপড়, গায়ে আধ-ফরসা একটা ছেঁড়া জামা ঝলঝল করিতেছে; অন্ধকারে মুখের যতটুকু দেখা গেল, মনে হইল, ক্ষৌরকার্যের সঙ্গে অনেকদিনই কোন সম্পর্ক নাই। লোকটার কোলে একটা বছর ছয়েকের রোগা মেয়ে, গায়ে একটা নূতন ছিটের পেনি—নিতান্ত হীন বলিয়া মনে হয় না, কোন গৃহস্থের বাড়িতে ভিক্ষা করিয়া পাইয়া থাকিবে।

লোকটা মেয়েটাকে কোলে লইয়াই উবু হইয়া বসিল এবং বসিয়াই নিজের হাঁটুর উপর কনুই রাখিয়া ডান হাতে কপালের অবিন্যস্ত চুলগুলা খামচাইয়া ধরিয়া মাথাটা গুঁজড়াইয়া দিল।

লুকাইব না, মনে মনে বেশ একটু বিরক্ত হইলাম। সমস্ত দিন তো এই দেখিয়াই কাটাইলাম; বাড়িতে প্রবেশ করিব, এই চর্চাই হইবে। এক মুঠা অন্ন মুখে তুলিতে যাইব, চারিদিক ইহাদেরই হাহাকারে বিষ হইয়া উঠিবে। মাঝখানের এই একটু অবসরের চেষ্টা, ইহার উপরও যদি ইহারা এমনভাবে সশরীরে আসিয়া হানা দেয় তো লোকে বাঁচে কি করিয়া? একটু নিশ্বাস ফেলিবারও সময় দিবে তো?

ঠিক কঠোর না হইলেও একটু রুক্ষ কণ্ঠেই বলিলাম,—"বাপু, একটু ক্ষ্যামা দাও দিকিন, লোকে একটু নিরিবিলি দেখে বসবে তা....তুমি না হয় ওই সদরের দিকে যাও; যদি কিছু দিতে পারে....আর দেবেই বা কোথা থেকে বল মানুষে?....তবুও যাও, দেখ; আমায় একটু ছাড়।"

শুধু গোঁজড়ানো মুখে 'উফ!' করিয়া একটা শব্দ হইল, নড়নচড়নের কোন লক্ষণ নাই। মেয়েটা আমার পানে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া

ছিল, মনে হইল, তাহার ঠোঁট দুইটি যেন একটু থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। চোখ দুইটিও দুই বিন্দু জলে চকচক করিয়া উঠিল।

না, অব্যাহতি নাই ; প্রশ্ন করিলাম,—খাবি কিছু ?

মেয়েটি কিছু বলিবার আগেই লোকটা মুখটা অল্প একটু আমার পানে ফিরাইয়া কতকটা রুদ্ধ কণ্ঠেই বলিল—"না, ওর খাবার কষ্ট থাকতে দিই নি বাপু, ওর যা কষ্ট তা—"

শেষ না করিয়াই মেয়েটাকে বুকে আরও চাপিয়া ধরিল, তাহার পর তাহার মাথার উপর নিজের মুখটা চাপিয়া একটু দুলিয়া দুলিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া ভাঙা ভাঙা ভাবে বলিয়া যাইতে লাগিল—"তোকে আমি তো দোব না খাবার কষ্ট, বেটী ; দিই ? বল্ বল্—বল্ না, সোনা আমার, মানিক আমার ! খাবার কষ্টও দোব না, পরবার কষ্টও দোব না ; তার জন্যে আমায় ভিক্ষে করতে হয়, চুরি করতে হয়, গাঁটকাটা সাজতে হয়, সেও স্বীকার ; না খেয়ে তোকে মরতে দোব না।....বল্ না বাবুকে, আমি নিজে সমস্ত দিন খেয়েছি কিছু ?....খেয়েছি ? তোর মুখে তুলে দিই নি সবটুকু ? বল্ না বাবুকে ; আমি না দিলে তোকে দেবে কে ? আর আছে কে ?"

দুই হাতে আরও নিবিড়ভাবে জড়াইয়া দুলিয়া দুলিয়া আদর করিতে লাগিল—"মা আমার, সোনা আমার, হীরে আমার—"

দৃশ্যটা ক্রমেই মর্মন্তুদ হইয়া উঠিতে লাগিল। দুর্ভিক্ষেরই একটা দিক্,—সবাই গিয়াছে, বাপ বুকে করিয়া লইয়া দ্বারে দ্বারে বেড়াইয়া ফিরিতেছে, নিজেকে বঞ্চিত করিয়া মুখের অন্ন তুলিয়া দিতেছে ; একাধারে মা, বাপ, ভাই, বোন—সব।

প্রশ্ন করিলাম—"তা হ'লে তুমি কিছু খাবে ? দেখি, দাঁড়াও, যদি কিছু পাই। আর বাপু, গেরস্তই বা করে কি বল ?"

"না, ওর খাবার কষ্ট থাকতে দিচ্ছিনে বাপু, ওর যা কষ্ট..."

উঠিতেই লোকটা কতকটা সেই ভাবে মাথা গুঁজিয়াই ডান হাতটা বাড়াইয়া আমার একটা পা চাপিয়া ধরিল ; প্রায় পড়পড় হইয়া গিয়াছিল, কোন রকমে সামলাইয়া লইয়া একটু সেই ভাবেই থাকিয়া বলিল—"না

বাবু, আপনি বসুন; আগে সবটা একটু শুনুন। খাব আর কোন্ মুখে? প্রাণ রেখেই বা আর কি হবে? রাখতুম, ভেবেছেন বাবু? রেখেছি শুধু এইটের জন্যে। মা আমার, সোনা আমার, কি যে তোর নামটি বল্ তো? শুনিয়ে দে তো বাবুকে একবার।”

মেয়েটিকে একটি চুম্বন করিয়া তাহার মুখের খুব কাছে মুখ রাখিয়া চাহিয়া রহিল। মেয়েটি কেমন বিহ্বল এবং হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছে, হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত আর ভীতিজনক অবস্থায় পড়িলে শিশুরা যেমনটা হইয়া পড়ে। লোকটার মুখের পানে চাহিয়া অস্ফুট স্বরে কহিল—“নক্ষ্মী”।

লোকটা আবার মেয়েটাকে চাপিয়া ধরিল, কয়েকটা উচ্ছ্বসিত চুম্বন দিয়া বলিল—“নক্ষ্মী! নক্ষ্মী! নক্ষ্মী, না হাতী....সে তো ওদের দেওয়া নাম, আমি কি নাম দিয়েছি তাই বল্ না।”

মেয়েটি কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল—“আবাগী”।

লোকটা আবার মুখটা গোঁজ্ড়াইয়া সামনের কেশগুচ্ছটা খামচাইয়া ধরিল, তাহারই মধ্যে অল্প একটু মুখ ঘুরাইয়া আমার পানে চাহিয়া গাঢ় স্বরে বলিল—“রাখব না ‘আবাগী’ নাম বাবু? কম দুঃখে রেখেছি? যার বাপ....ওফ!”

আবার মুখটা গুঁজিয়া নীরব হইয়া রহিল।

মেয়েটি কেন এত বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে, এতক্ষণে যেন কতকটা আন্দাজ হইল। প্রশ্ন করিলাম—“তোমার মেয়ে নয়?”

লোকটা একেবারেই মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল, একটা কিসের আঘাতে কি যেন কে কাড়িয়া লইতেছে—এইভাবে একটা হঠাৎ ভয়ে নাড়া খাইয়া উঠিল; মেয়েটাকে আরও নিবিড় বন্ধনে বুকে চাপিয়া আরও গাঢ় স্বরে বলিয়া উঠিল—“অমন কথা বলবেন না বাবু, তা হ’লে

আমি বাঁচব না···তুই আমার মেয়ে নয়? তুই আমায় ছেড়ে চ'লে যাবি? 'আবাগী' বলি ব'লে তুই রাগ করলি? হবি না আর আমার মেয়ে? বল্ না বাবুকে, সোনা আমার, মানিক আমার, বল্ না, বাবুকে, তুই কার মেয়ে?····"

একটু কেমন কেমন বোধ হইতেছে। শোকে, অভাবে লোকটার কি মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে? এমন মর্মন্তুদ ঘটনাও তো হইতেছে আজকাল।

ক্ষুধার চোটে বসিয়াও শরীর ঠিক রাখিতে পারিতেছে না, যেন টলিয়া পড়িবে, তবু আহারে প্রবৃত্তি নাই, কথার তেমন বাঁধুনি নাই,—সব হারাইয়া সব চেতনা এই শেষ সম্বলটুকুর উপর জড়ো হইয় উঠিয়াছে—ভয়ে আতঙ্কে মস্তিষ্কের বিকৃতিতে····

"বল্ না, বল্ বাবুকে, নয় তুই আমার মেয়ে? বল্ না বাবুকে, কার মেয়ে তুই?"

সেই রকম বিহ্বল দৃষ্টিতেই চাহিয়া মেয়েটা যেন ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল—"তোমার"।

"ওই শুনুন বাবু, আমারই আবাগী, আমারই সোনা। বল্ না আবাগী, বাবু? এই হাহাকার, চতুর্দিকে লোক কিউয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, প'ড়ে ম'রে যাচ্ছে, বাড়িকে বাড়ি ম'রে সাফ হয়ে গেল, আর তুই বাপ হয়ে কিনা মদ গিলে·এই দুধের বাছাটাকে—"

আবার রহস্যাবৃত হইয়া পড়িতেছে; বাপ নয় তাহা হইলে।

"তোমার ভাইঝি নাকি?"—বলিয়া প্রশ্ন করিতে যাইতেছিলাম, লোকটা একটু বিরতি দিয়াই যেন হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিল—"গাল দিই সাধে বাবু? আরও দোব। একশ'বার দোব, ম'রে উরকুর উঠে যাচ্ছে চারিদিকে, আর তুই শালা কিনা মদ গিলে এই দুধের

বাছাটাকে ফুটপাথের ওপর ফেলে রেখে....হ্যাঁ বাবু, আপনি বোধ হয় পেত্যয় যাবেন না—ফুটপাথের ওপরে, একপাল ভিখিরীদের কাচ্চাবাচ্চা-দের মধ্যে ব'সে হাপুস নয়নে কাঁদছে, 'বাবা গো, ওগো বাবা গো !'....বুক ফেটে যায় বাবু, শুনলে....মদের দোকানের সামনে বাবু, মদের দোকানের সামনে ! হাজার ন্যাকড়া পরা হোক, না খেতে পেয়ে হাজার মর-মর হয়ে পড়ুক, তবু ভিখিরীদের কাচ্চাবাচ্চাগুলো ওর চেয়ে ঢের সুখী—তাদের মা আছে, বাপ আছে....যার নেই তার নেই, আলাদা কথা ; কিন্তু এ আবাগীর যে থেকেও নেই বাবু। মদের দোকানের সামনে ব'সে হাপুস নয়নে কাঁদছে, কে হাতে একটা প্যাঁজের বড়া দিয়ে গেছে, হাতেই আছে, ওই এক বুলি—'বাবা গো, ওগো বাবা গো !' বললাম, 'কোথায় তোর বাবা ?' মুখের পানে সে যে কি ফ্যালফ্যাল চাওয়া—পাষাণও গ'লে যায় দেখলে। ওর তো মুখে রা নেই, একটা ভিখিরীর মেয়ে এঁটো খুঁটে খাচ্ছিল, বললে, 'বলছে, ওর বাপ ওই মদের দোকানটায় সেঁধেচে গো। বলনু, খা এসে, তা'....

কি যে হ'ল মনে বাবু !....ইচ্ছে করল, সে আঁটকুড়ির সন্তানের কাঁচা মাথাটা যদি"—

লোকটা একদমে অনেকগুলা কথা বলিয়া যেন ক্লান্ত হইয়া একটু চুপ করিল, কপালের উপরের চুলগুলা খামচাইয়া অল্প অল্প ধুঁকিতে লাগিল।

বলিলাম "ওর বাপ তোমার যেন কেউ হয় ব'লে"—

লোকটা ঝাঁকড়া চুলগুলা নাড়িয়া একটু উগ্রভাবেই আমার পানে ঘোলাটে চোখে চাহিয়া বলিল—"ওর বাপ নেই বাবু, দয়া ক'রে তার নামটা আর করবেন না আমার সামনে। ওকে তো তাই বলনু, "নেই তোর বাপ, মরেছে, নইলে তোকে এক পহর থেকে এই ভিখিরীর দলে

ফেলে রাখে? আর থাকলেই কি উবগার হবে তোর সে বাপ দিয়ে? সে শালা মরুক, মরুক, মরুক সে শালা!"—

মেয়েটা হঠাৎ ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। লোকটার ভাব সঙ্গে সঙ্গে বদলাইয়া গেল; তাড়াতাড়ি মাথাটা বুকে চাপিয়া বসিয়া বসিয়া দোলা দিতে দিতে অসীম দরদভরে বলিতে লাগিল—"না না, আছে তোর বাপ—সোনা আমার, মানিক আমার, বাবা আছে রে—এই তো আমি রয়েছি, নয় আমি তোর বাপ? বলবি নি বাপ আমায়?"····

রহস্যটা বাড়িয়াই যাইতেছে। মেয়েটি ভাইঝি সম্বন্ধের নয়, কেন না, তাহা হইলে উহার বাপকে 'শালা' বলিয়া গাল পাড়িত না; নাতনী-জাতীয়ও নয়, তাহা হইলে আর বাপ হইতে যাইবে কি করিয়া? ভাবিবারও অবসর দিতেছে না। ইহা ঠিক যে, মেয়েটার বাপ লোকটার পরিচিত, খুবই সম্ভব প্রতিবেশী—কোন মাতাল প্রতিবেশী। দূরসম্পর্কের আত্মীয়ও হইতে পারে। যে স্তরের লোক বলিয়া মনে হইতেছে, তাহাতে ভাই-সম্পর্কের লোককে রাগ বা আক্রোশের মাথায় শালা বলা এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কিন্তু হউক নিম্নস্তরের, লোকটার প্রাণ আছে—নিজের পেটে অন্ন নাই, নিজের মুখের গ্রাস মেয়েটির মুখে তুলিয়া দিয়াছে। মেয়েটার গায়ে যে নূতন জামাটা, রাস্তার ধার হইতে কেনা হইলেও টাকা দুয়েকের কম নয় এই বাজারে। নিজের গায়ে ন্যাকড়া, তবুও—

চিন্তার মধ্যেই আমি হঠাৎ যেন ধাক্কা খাইয়া সচকিত হইয়া উঠিয়া বসিলাম, মেয়েটা সত্যই বদ্ধ এক পাগলের হাতে পড়ে নাই তো? গোড়ায় একটু লাগিয়াছিল ধোঁকা, আবার সেটা কাটিয়া গিয়াছিল; এবার কিন্তু ধারণাটা বদ্ধমূল হইয়া গিয়া আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা যেন পরিষ্কার হইয়া আসিতে লাগিল। কথার কিছু বাঁধুনি নাই, বেশ বলিয়া

যাইতেছে, হঠাৎ মাঝখানে এক-একটা কথা অসংলগ্ন বেখাপ্পা ; বলার ভঙ্গীও সেই রকম, কতকটা স্পষ্ট, কতকটা অর্ধস্পষ্ট, কতকটা একেবারেই যেন জিবে জড়াইয়া যাইতেছে। হয়তো অতিরিক্ত দুর্বলতা ; কিন্তু সেখানেও যে পাগলামিরই লক্ষণ—সমস্ত দিন খায় নাই, অথচ আহার্য দিতে গেলে পা জড়াইয়া বারণ করে। যতই ভাবিতে লাগিলাম, আন্দাজটা ততই যেন পুষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। পাগলই ; এখন যে ভাবেই হউক, আর যে কারণেই হউক, এই মেয়েটার উপর ঝোঁক গিয়া পড়িয়াছে ; ওকে বাঁচাইতে হইবে—শুধু বাঁচানো নয়, ভাল পরাইয়া, ভাল খাওয়াইয়া বাঁচানো। যে করিয়াই হউক একটা জামা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে, সমস্ত দিনে আহার্য যেটুকু যোগাড় হইয়াছিল উহারই মুখে তুলিয়া দিয়াছে। এ ঝোঁকের কারণ অনেক রকমই হইতে পারে ; এ মহামারীর বাজারে তো অপ্রতুল নাই, হয়তো প্রাণের চেয়ে প্রিয়তরনিজের সন্তানটিকেই হারাইয়াছে,—বস্ত্র নাই, অন্ন নাই, অসহায়-ভাবে চাহিয়া দেখিয়াছে, জঠরের অগ্নি তাহারই চোখের নিচে তাহাকে তিল তিল করিয়া দগ্ধ করিয়া ফেলিল। পাগল করিয়া দেওয়ার দৃশ্য নয় ?

যদি নিজের নাই হারাইয়া থাকে তো রাস্তার দুই ধারে প্রতিদিনের প্রতিমুহূর্তের দৃশ্যও কি যথেষ্ট নয় ?

মনে পড়িয়া গেল, আজ হাওড়ার পুলের সামনে একটি দৃশ্য—একটি ভদ্রলোক, প্রকৃতই শিক্ষিত ভদ্রলোক ট্রামের প্যাভিলিয়নের নিচে দাঁড়াইয়া ভগবান হইতে আরম্ভ করিয়া বড়লাট, মন্ত্রী, পেয়াদা, হিটলার, রুজভেল্ট, চার্চহিল, তোজো—একধার হইতে সকলকে গাল পাড়িয়া যাইতেছে—ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী, যখন যে ভাষায় জোর পাইতেছে। সোজা গালাগাল নয়, গালাগালের লেকচার, রীতিমত বাগ্মিতা। লোক

জড়ো হইয়া গিয়াছে, গলার কপালের শির ফুলাইয়া গালাগাল দিয়া যাইতেছে। দুইজন পুলিস লইয়া একটা সার্জেণ্ট ভিড় ঠেলিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। ভদ্রলোকের চেহারাটা একেবারে বদলাইয়া গেল—রাগের ভাবটা আছে, তবে তাহার সঙ্গে গুরুগাম্ভীর্য। সার্জেণ্ট কিছু বলিবার পূর্বেই তর্জনী নির্দেশ করিয়া বলিল—"You are late, mind you!" (দেরি ক'রে ফেলেছ, মনে থাকে যেন!) সঙ্গে সঙ্গেই বিচারকের ব্যাণ্ড অর্থাৎ গলাবন্ধনের মত করিয়া রুমালটা গলায় ঝুলাইয়া বিচারকেরই দৃপ্ত ভঙ্গীতে একজন মাড়োয়ারী দর্শকের পানে দেখাইয়া বলিল—"Swear him—the profiteer first; I hold my court here" (আমি এখানে আদালত করছি, আগে এই মুনাফাখোর রাক্ষসকে শপথ করাও।)

ততক্ষণে পুলিস দুইটার সংবিৎ হইয়াছে, কিছু না বুঝিলেও বেটন তুলিয়া অগ্রসর হইল। সার্জেণ্ট বলিল—"মারো মৎ, পাগলা হ্যায়, ঘর চালান দেও।"

শুধু তো দেহের বিনাশ নয়, উৎকট অমানুষিক দৃশ্যে কত মস্তিষ্কও যে এ রকম বিকৃত হইয়া যাইতেছে, কে তাহার হিসাব রাখে! এ শিক্ষিত নয়, বিচারের কথা বোঝে না, আত্মলোপের বিকারে মাতিয়া উঠিয়াছে।

বোঝা গেল!

কিন্তু একটা কথা,—পাগলের হাতে এ রকম একটা কচি মেয়েকে তো ছাড়িয়া দেওয়া নিরাপদ নয়; এখন ঝোঁক ধরিয়াছে বাঁচাইবার, যে-কোন মুহূর্তেই কিন্তু সেটা যে আছাড় মারিবার ঝোঁকে পরিণত হইয়া যাইতে পারে। রহস্যের চিন্তা ছিল, রহস্যটা কাটিয়া গিয়া একটা দুশ্চিন্তা আসিয়া জুটিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া ভাবিতে

লাগিলাম, শেষে ঠিক করিলাম, কোন প্রকারে মেয়েটিকে উদ্ধার করা যাক আপাতত, তাহার পর ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা ব্যবস্থা করা যাইবে; থানায় দাখিল করিয়াই দিই, বা অনাথ-আশ্রমেই ভর্তি করিয়া দিই, কিছু একটা ব্যবস্থা হইবেই।

বলিলাম—"তোমার মনটা যে কত দরাজ, কর্তা, যতই ভাবছি যেন আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। আমাদের ভদ্দরলোকদের মধ্যেও এতটা দয়া-মমতা চোখে পড়ে না আজকাল; কে কাকে দেখছে বল? বেশ বেশ, এই রকম আমরা যদি পরস্পরকে না দেখি তো বাঙালী জাতটা টেঁকবে কি ক'রে এ দুর্দিনে? বাইরের লোকদের দরদ তো দেখতেই পাচ্ছি। বড় আনন্দ হ'ল; নিজে না খেয়ে, না প'রে—"

গোঁজড়ানো মুখ দিয়া 'উফ!' করিয়া একটা আওয়াজ হইল, মুঠাটা চুলের ঝুঁটিটাকে আরও একটু জোরে যেন খামচাইয়া ধরিল। মনে হইল, ওষুধ যেন লাগিতেছে।

বলিলাম—"ভগবান তোমার ভাল করবেন বাপু; নিশ্চই করবেন, তাঁর কাছে তো আর ইতর-ভদ্র নেই। কিন্তু আমি একটা কথা বলছি, মেয়েটিকে তুমি এ রকম ভাবে কাঁহাতক নিয়ে ঘুরে বেড়াবে ঘাড়ে ক'রে? আমি বলি কি, আমার এখানে না হয় রেখে দাও, ছেলেমানুষ এক মুঠো খাবে, থাকবে, তোমার যখন খুশি এক-একবার ক'রে দেখে যাবে। একটা কচি মেয়ে, চোখে পড়ল, আমাদেরও তো একটু দেখা উচিত।"

'উফ' করিয়া আবার একটা শব্দ, বেশী টানা, সঙ্গে সঙ্গে মাথার একটা ঝাঁকানি, যেন নিজের মাথাটাকেই নিজে একটা নাড়া দিল। আশা হইল, প্রস্তাবটা উহার পক্ষে কষ্টকর হইলেও বোধ হয় রাজি হইবে। হঠাৎ খেয়াল হইল, এই সময় যদি পেটে কিছু পড়ে তো বোধ হয় মাথাটা একটু ঠাণ্ডাও হইতে পারে, উহারই মধ্যে একটু ভাবিয়া দেখিবার

শক্তি আসিতে পারে। বলিলাম—'আর এক কাজ কর, তুমিও এক মুঠো কিছু খেয়ে নাও, বামুনের বাড়িতে এসে পড়েছ, খালি পেটে ফিরে যাবে? নিজের পেট কেটেও তো লোকেদের দিতে হচ্ছে যা কিছু। তুমি একটা ভাল লোক, অভুক্ত গেলে—'

ছেলেটাকে ডাকিয়া বলিলাম—"ওরে, এক মুঠো ভাত, একটু ডাল, আর যা হয়েছে একটু নিয়ে আয় তো একটা কিছুতে ক'রে শীগ্‌গির; আর এক ঘটি জল।"

লোকটা কিরকম এক অদ্ভুতভাবে একমনে শুনিতেছিল, উঠিয়া পড়িয়া জামরুল গাছের নিচে তুইটা নেবুর ঝাড়ে অন্ধকারটা যেখানে আরও গাঢ় হইয়া গিয়াছে সেই দিকটায় তুই-তিন পা আগাইয়া গেল—মেয়েটাকে ছাড়িয়াই। সঙ্গে সঙ্গে আবার তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়া মেয়েটাকে বাঁ কোলে তুলিয়া লইল, যেন হঠাৎ বেহাত করিয়া ফেলিতে-ছিল; তাহার পর গটগট করিয়া ঝোঁপের দিকে চলিয়া গেল—মনে হইল, পকেটে একটা ভারী গোছের কিছু ছিল, যেন বেশ ভাল করিয়া মুঠাইয়া ধরিয়াছে। সেদিকে ঘরের একটু কোণ পড়ে, তাহার ওদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নিরতিশয় বিস্ময়কর ব্যাপার। ইচ্ছা হইল, যাই পিছনে পিছনে; কিন্তু গাটা ছমছম করিয়া উঠিল। পকেটে কি? ছুঁড়িয়া মারিবে না তো? আরও সাংঘাতিক কিছুও হইতে পারে—পাগলের কাণ্ড! বোধ হয় মিনিট তুই-তিন আমি একটু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়াই বসিয়া রহিলাম। লোকটা যায় নাই, খড়খড় করিয়া একবার শব্দ হইল, তাহার পরই মেয়েটা 'ও বাবা গো' বলিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। ছেলেটা আমার একটা লণ্ঠন হাতে ভাত লইয়া আসিতেই ছিল, বলিলাম,—'শীগগির এস, পা চালিয়ে।"

ছেলেটার হাত থেকে লণ্ঠন লইয়া অগ্রসর হইব, দেখি ঘরের কোণ ঘুরিয়া লোকটা চলিয়া আসিতেছে, কোলে মেয়েটা, সেই রকম বিহ্বল স্তম্ভিত দৃষ্টি, বোধ হয় আরও বেশি।

পা দুইটা এবার আরও টলিতেছে, পকেটে ইট-পাটকেলও নয়, রিভলভারও নয়, লণ্ঠনের আলোয় নিজের উপরাধ'টা নিঃসংশয়ভাবে প্রকাশ করিয়া একটি বোতল। মদের গন্ধেও হাওয়াটা হঠাৎ বোঝাই হইয়া গেছে।

বাঁ কোলে মেয়েটাকে ভাল করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া ঝড়ে-টলানো তালগাছের মত খানিকটা টলিয়া লইয়া একটু স্থির হইয়া দাঁড়াইল, তাহার পর রক্তাভ চক্ষু দুইটা আমার মুখে ন্যস্ত করিয়া জড়িতকণ্ঠে বলিল—"ভদ্দল্লোক। আর আমরা হলুম ইতোর! কেয়া মেরা ভদ্দল্লোক রে! মদ টেনে নিজের পেটের মেয়েকে পথে বশ্'স্তে রেখেছি—ভদ্দল্লোকের কাশে বিচার চাইতে এলুম—দু ঘা দে উত্তমমধ্যম ক'রে, তা না, কুটুম-আদরে এককাঁশি ভাতের ব্যবস্থা—বড়া আমার ভদ্দল্লোক! —ছোঃ ছোঃ!....চল্ বেটী--"

একটা ঝাঁকানি দিয়া ঘুরিয়া টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেল।

ইহার পরেও কিছু বলিবার আছে, তবে সেটা শুনিতে কি রকম হইবে জানি না।

দুঃখিত হই নাই মোটেই, বরং সেদিন যতক্ষণ জাগিয়া ছিলাম, মনটা খুবই প্রফুল্ল ছিল। একটু আশ্চর্য, কিন্তু কথাটা সত্য। আজ কয় মাস ধরিয়া 'ফেন দাও মা'-র একঘেয়ে শব্দের মধ্যে একটা অভিনবত্ব অন্তত একটা লোকের ভিতর চোখে পড়িল, যাহার ভিক্ষা চাওয়ার প্রয়োজন হয় নাই, নেশা করিবার মত মনের অবস্থা আছে, নেশা করিবার মত ফালতু পয়সাও আছে, মৃতের গাদার মধ্য দিয়া যে নিজের খেয়াল লইয়া

নিজের পথ ধরিয়া যাইতে পারিতেছে। আপনাদের খারাপ লাগিতেছে নিশ্চয়, জানি লাগিবেই। একটা, মাতাল যে আমার মনে সে রাত্রে কতবড় একটা স্বস্তি আনিয়া দিয়াছিল, আমার মনকে অষ্টপ্রহরব্যাপী একটা উৎকট চিন্তা হইতে কি অদ্ভুতভাবেই না কয়েক ঘণ্টার জন্য মুক্তি দিয়াছিল, সে কথা আমি কি করিয়া বুঝাইব আপনাদের ?

মাসী

মস্ত বড় দোতলা বাড়ি। বাইরের মহলটা আলাদা। ভিতরে দুইটি মহল, রান্নাবাড়িটা ধরিলে তিনটা। বাড়ির এক কোণ থেকে ডাক দিলে অন্য কোণে সব সময় আওয়াজ পহুঁছায় না।

এত বড় বাড়িটাকে জিয়াইয়া রাখিয়াছে দুইটি শিশুতে।

কেমন ধারা একটু শোনায় বটে ; প্রশ্ন ওঠে, তবে আর সবাই গেল কোথায়।

আর সবাই সংসারটাকে বাঁচাইয়া রাখিতে ব্যস্ত—আজকের সংসার আবার ভবিষ্যতের সংসারও। ঠাকুরমা, দিদিমা, মাসী পিসীতে অনেকগুলি বৃদ্ধা,—তাঁহারা পুষ্পে নৈবেদ্যে ঠাকুরদের তুষ্ট করেন,—"তোমরাও খাও-দাও ঠাকুর, এদেরও খাওয়াদাওয়ার দিকে একটু নজর রেখো"।

যাঁরা গিন্নীর দলের তাঁহাদের তো উদয়াস্ত দম লইবার সময় থাকে না ; রান্নার দিকে নজর রাখো, বাজারের দিকে নজর রাখো, আফিস-ইস্কুলের ব্যবস্থায় যেন এতটুকু না গাফিলতি হয়, আরও সব নানানখানা ;

এঁদের পরে যাঁরা, তাঁদের [illegible] ফাই-ফরমাস খাটিতে-খাটিতে দম বন্ধ হইয়া আসে—পূজার [illegible] থেকে পান সাজা, [illegible] ছোট দলের ধোওয়ান-মোছান জামাকাপড়-পরান পর্যন্ত। অর্থাৎ সংসারের বর্তমান থেকে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত [illegible]

কর্তারা সংসার বাঁচাইয়া রাখার একেবারে গোড়ার ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত—অর্থাৎ রোজগারের ব্যাপার। সকাল থেকে মক্কেল, রোগী—একটু ডাইনে-বাঁয়ে চাহিবার ফুরসত থাকে না। বৈকালে হয়তো একটু ক্লাব, সেখানেও উদ্দেশ্য ঐ একই—অর্থাৎ সংসারটিকে জিয়াইয়া রাখা। তাহার জন্য নিজের নিজের প্রাণশক্তিকে অটুট রাখিতে হইবে তো ?—তাই ক্লাব, অথবা অন্যভাবে একটু চিত্তবিনোদন।

কিন্তু সংসার বাঁচাইয়া রাখা আর বাড়ি বাঁচাইয়া রাখা এক কথা নয়। বিধাতাপুরুষ যে মন্ত্রে বাড়ি বাঁচাইয়া রাখেন সে-মন্ত্রের সংগীত একটু অন্য ধরনের। তাহার জন্য বাছিয়া লন শিশুর কণ্ঠ। এবাড়িতে আছে মিটু আর তুলতুল, বয়স আড়াই থেকে তিনের মধ্যে ; তুলতুলটি মেয়ে, সেই ছোট।

সত্যই তুলতুল ; এত নরম যে চলা-ফেরার মধ্যে কেন এলাইয়া পড়ে না, সেইটাই আশ্চর্য বলিয়া মনে হয়। যেখানেই হাত দাও—কাঁধে, হাতে, পিঠে, গালদু'টিতে, আঙুলগুলি যেন খানিকটা মাখনের তালে বসিয়া যায়। চোখ দুটি স্বপ্নালু, মাথায় কোঁকড়া-কোঁকড়া এক-মাথা কালো কুচকুচে চুল—রেশমের মতো হালকা আর মসৃণ। পাতলা ঠোঁট দুটি যখন নড়ে, মনে হয় ঐটুকুতেই যেন রক্ত ফাটিয়া পড়িবে। স্বভাবটিও বড্ড নরম, কিন্তু মিটুর সংসর্গে নরম থাকা দিন-দিনই নাকি কঠিন হইয়া উঠিতেছে।

মিটুটি অতিরিক্ত দুষ্ট, চঞ্চল আর ধূর্ত। কথাগুলায় জিবের একটুও

জড়তা নাই ; মনে হয় পাঁচছয় বছরের ছেলে কথা কহিতেছে। কথার বাঁধুনির বিষয় যদি ধরা হয় তো যে-কোন বয়সের লোকের মুখেই বেশ মানায়। কিছু বলিলে বুড়োদের মতো ভ্রূ দু'টি কুঞ্চিত করিয়া চোখে চোখ রাখিয়া শোনে, একটু ভাবে, তাহার পর উত্তর দেয়।

বারান্দার ওদিককার ঘরে প্রবল উৎসাহে মাতামাতি করিতেছে ; একটু কড়া গলায়ই ডাকিলাম, "মিটু, একবার এদিকে আসতে হবে।"

এখানে বলিয়া রাখা ভালো যে অপরিচিত না হইলেও অনেকটা নূতন আমি মিটুর পক্ষে। উহাদের লইয়া যাইবার জন্য উহাদের মামার বাড়ি আসিয়াছি। মিটু দাপাদাপি স্থগিত রাখিয়া দুই পা অগ্রসর হইয়া আবার থামিয়া গেল। মা আর ভাইদের কাছে শুনিয়াছে আমি নাকি একটু কড়া প্রকৃতির মানুষ ; ডান হাতের চারিটি আঙুল দাঁতে চাপিয়া আমার পানে চোখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, "কেন মেজ কাকা, একটা কথা বলবে ?"

অর্থাৎ সামান্য কোন একটা কথাই তো ?—মারধোর করিবার উদ্দেশ্য নয় ? তাহা হইলে সে দূর হইতে আপন পথ দেখে। দাদুরা আছে, দিদিমারা আছে, মামার বাড়িতে নিরাপদ স্থানের অভাব নাই।

ছেলেটি ইংরাজীতে যাহাকে বলে প্রডিজি তাই, অবশ্য দুষ্টামির দিক দিয়া ; ওর সাহচর্যে তুলতুল যদি কাঠিন্য লাভ করে তো তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

দুটির সঙ্গে ভালো করিয়া পরিচয় হইল সকালে জল-খাবারের সময়। কুটুমবাড়ির আয়োজন—ডিশে প্লেটে সাজানো ফল, মিষ্টান্ন, টোষ্ট, কেক্ ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম। মিটুর দিদিমা সামনে একটি কৌচে বসিয়া গল্প করিতেছেন। একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয় এই যে কিছু ফেলিয়া না রাখিয়া গল্পের ফাঁকে ফাঁকে একটি একটি করিয়া সমস্তগুলির সদ্ব্যবহার করি।

বেশ একটু অস্বস্তিজনক অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। গল্পের মধ্যেই অনুরোধ উপরোধও আসিয়া পড়িতে লাগিল; একটি রাখিতে হইল, একটি কাটাইলাম, তৃতীয়টি লইয়া টানাটানি চলিতেছে এমন সময় ওঁর একটা জরুরী তলব আসিল। সমস্তগুলি শেষ করিবার একটা পাইকারি হুকুম রাখিয়া উনি উঠিয়া গেলেন।

একে লড়াইয়ের বাজার, কিছু পাওয়া যায় না, সামান্য যা পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে ফেলিয়া রাখিলে তিনি শুনিবেন না। বলিয়া গেলেন কাহাকেও পাঠাইয়া দিতেছেন।

বলিলাম, "তাহলে এমন কাউকে পাঠিয়ে দেবেন মা, যিনি এই এতগুলো জিনিসকে কিছু পাওয়া গেল না ব'লে না ধরেন।"

"না বাবা, বাজে কথা শোনা হবে না" বলিয়া চলিয়া গেলেন।

উনি যাইবার একটু পরে পিছনে শিশুকণ্ঠে অল্প একটু গলা খাঁথারি দেওয়ার শব্দ হইল; ফিরিয়া দেখি পিছনের দোরের চৌকাঠে দাঁড়াইয়া মিটু। একবার দেখাটা হইয়া যাইতে চক্ষুলজ্জাটা ভাঙিয়া গেল বোধ হয়, আসিয়া সোফার পিছনটিতে দাঁড়াইল।

আর এক কাপ চা ঢালিতে ঢালিতে প্রশ্ন করিলাম, "কি মনে করে?"

খাবারগুলির দিকে চাহিয়া ছিল, একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল, বলিল "এমনি"।

বড়দের মতো এই কথাটি খুব রপ্ত করিয়া রাখিয়াছে মিটু। সর্বদাই কিছু না কিছু উদ্দেশ্য লইয়া থাকে বলিয়া ঐ কথাটি দিয়া অনাসক্তির ভাবটা ফুটাইয়া রাখিবার চেষ্টা করে; ওর সঙ্গে একটু বেপরোয়া ভাব মিশাইবার অভিপ্রায় হইলে বলে, "এমনি—ইচ্ছে।"

একটি কেক ভাঙিয়া মুখে দিলাম, নিজের মনেই বলিলাম, "বাঃ, চমৎকার কেকটি দিয়েছে তো, কী মিষ্টি!"

মিটু একবার আড়চোখে কেকটির পানে চাহিল, আর একটি দীর্ঘশ্বাস পড়িল। প্রথম গ্রাসটি শেষ করিয়া আবার তুলিয়াছি কেকটা, মিটু প্রশ্ন করিল "মেজ কাকা, বাড়িতে কে কে আছে? আছেন বলতে হয়, না?"

বলিলাম, "হ্যাঁ। তোমার দাদু আছেন, জেঠামশাইরা আছেন, জেঠাইমারা, কাকারা, খুড়ীমারা, দাদারা, দিদিরা।"

মিটু বলিল, "জানো মেজকাকা? তুলতুল বড্ড হ্যাংলা, আমি তাড়িয়ে দিয়েছি।"

বাড়ীতে পাঁচ-ছয়টি হ্যাংলা-পরিবৃত হইয়া আহার করা অভ্যাস, মিটুর দিদিমা বর্তমানে সেই অভাবটাই এতক্ষণ সব চেয়ে বেশি অনুভব করিতে-ছিলাম। যাই হোক একটিকে পাওয়া গেছে আপাতত; তাহারই লোভটুকু ভালো করিয়া উপভোগ করিবার ইচ্ছা দমন করিতে পারিলাম না। বলিলাম, "আহা, ও ছেলেমানুষ কিনা; ছেলেমানুষ একটু হ্যাংলা হয়। তুমি তো বড় হয়ে গেছ মিটু, না?"

কোন উত্তর পাইলাম না, মিটু শুধু চারিটি আঙুল মুখে পুরিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া স্থির দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া রহিল।

একখানি চায়ের রেকাবিতে একটু কেক, দুইখানা বিস্কুট, কিছু কমলা লেবুর কোয়া, একটি সন্দেশ, একটা রসগোল্লা আলাদা করিয়া রাখিলাম। মিটু স্থির, লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। বলিলাম, "যাও, ডেকে নিয়ে এস তুলতুলকে এবার। আহা, ছেলেমানুষ, একটু হ্যাংলা হবে না? ও তো আর মিটুর মতন হয় বড় নি, হবে না হ্যাংলা একটু? যাও ডেকে নিয়ে এস।"

মিটু ভ্রূ দুইটা চাপিয়াই পরম অভিনিবেশের সহিত আমার কথাগুলো শুনিতেছিল। বেশ দেখিতেছি, ওর মনের গভীরে একটি আলাদা চিন্তার ধারা বহিয়া চলিয়াছে। যাইবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না,—সোফা-

টার পিঠ ধরিয়া বার দুয়েক একটু দোল খাইল, বার দুয়েক তুলতুলের রেকাবিটার পানে চাহিল, তাহার পর বলিল, "আমিও তো বড় হইনি।"

আমি কপালে ভ্রূ তুলিয়া বলিলাম, "সে কি কথা—তুমি বড় হওনি! মস্ত বড় হয়েছ যে, তুলতুলের চেয়ে বড়, খোকার দাদা! খোকা যেই ভাত খেতে শিখবে, 'দাদা দাদা' বলে কোলে উঠবে তোমার।"

বেচারা একটু প্রবঞ্চিত হইল, বড় হওয়ার গুমরে আরও বার দুয়েক দোল খাইয়া বলিল, "খোকা ঝিনুকে দুধ খায়, ন্যাংটো; আমি তো প্যাণ্ট পরি, খোকা তো খোকা; আমি তো মিটু বাবু।"

বলিলাম, "তা বইকি। আর খোকা তো হ্যাংলা, মাটি খায়। যাও ডেকে আনো তুলতুলকে।"

মিটু পিছনের দুয়ারের দিকে চাহিল, ঘুরিয়া দেখি তাহার দিদিমার দীর্ঘ অনুপস্থিতির সুযোগে তুলতুল কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ডাকিলাম, "এই যে, এস তুলতুল, কখন থেকে তোমার জন্যে খাবার নিয়ে বসে আছি।"

তুলতুল একবার পিছন দিকে চাহিল, ঘুরিয়া খাবারের পানে চাহিল, তাহার পর ঠোঁট ফুলাইয়া ট, ড, ড—এই রকম গোছের কতকগুলা অক্ষর সংযোগে এক অদ্ভুত উচ্চারণে কি একটা বলিল। মিটুর যেমন পরিষ্কার, এর গুলা তেমনি অস্পষ্ট, একেবারেই জিবের আড় ভাঙে নাই। লোকে যে টপ্ করিয়া ধরিতে পারে না এটা নিশ্চয় মিটুর জানা, বুঝাইয়া দিল, "বলছে, ও হ্যাংলামি করবে না।"

তুলতুলের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "না, তুমি এস, হ্যাংলামি হবে না, তোমার জন্যে তো খাবার রয়েছে; আলাদা থাকলে হ্যাংলামি হয় না; এস তো।"

তুলতুল একবার পিছনে দেখিয়া লইয়া প্রবেশ করিল, তবে আমার কাছে না আসিয়া পাশটিতে গিয়া দাঁড়াইল। দুয়ারের দিকে আরও একবার চাহিয়া লইয়া খাবারের উপর ঢুলঢুলে লুব্ধ চোখ দুইটি রাখিয়া স্বকীয় উচ্চারণে আবার কি বলিল ; এবার একটু বেশি।

মিটু বুঝাইয়া দিল, খাবারের দিকে একবার চাহিয়া লইয়া একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিল, "বলছে, শুধু বড় জেটুর কাছে হ্যাংলামি করব। বড় জেটু বকেন না।"

হ্যাংলামি কথাটা তাহা হইলে তত আপত্তিজনক নয় তুলতুলের কাছে, যদিও মিটু অর্থটা অনেকখানি বোঝে। জিনিসটা যে দোষের সেদিকে না গিয়া বলিলাম, "আমিও বকব না, বড় জেটুর চেয়ে আমি বেশি ভালোবাসি হ্যাংলাদের ? বড্ড ভালোবাসি, এই দেখ না আলাদা করে খাবার রেখে দিয়েছি। কেউ যদি বকে তোমায়, তার সঙ্গে খুব ঝগড়া করব, মিটু যদি তাড়িয়ে দিতে যায়, ওকে মারব।"

তুলতুল একবার আড়চোখে মিটুর পানে চাহিয়া লইয়া পায়রার মতো গলা নাচাইয়া কি বলিল, মিটু একটু টানিয়া উত্তর দিল, "হোস নে, আমি তো বলিও না।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপারটা কি ?"

মিটু বলিল, "বলচে, মিটুর মাসী হব না ! আমি তো ডাকিও না মাসী বলে।"

বলিলাম, "আচ্ছা, মাসী-বোনপোর বোঝাপড়া পরে হবে। তুমি এস তো খেতে !"

নিজেই উঠিলাম, সঙ্গে করিয়া আনিয়া রেকাবির সামনে বসাইয়া বলিলাম, "যাও। তুলতুল বড্ড লক্ষ্মী। ও তো কারুর কাছে হ্যাংলামি করে না, শুধু বড় জেটুর কাছে আর আমার কাছে করে। ওবেলা

আবার খাবার খাব, তুলতুল এসে খাবে। কমলা লেবুটা কী চমৎকার মিষ্টি, না তুলতুল?"

তুলতুল মাথাটা দোলাইয়া কি বলিল; আমি টীকার জন্য মিটুর পানে চাহিতে মিটু ঠোঁট-দুইটা জড়ো করিয়া বলিল, "আর বলব না, যাও!"

আহার্যের প্রশংসায় আরও একটু রং চড়াইলাম, সাক্ষী পাইয়া সুবিধাও হইয়াছে। মিটু পিছন থেকে সামনে আসিয়া শোফাটায় হাতপা ছড়াইয়া বসিল। একবার শুইয়া পড়িল, একবার শোফার উপর ডিগবাজি খাইবার চেষ্টা করিয়া নির্লিপ্তভাবটা জাগাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিল, তাহার পর হঠাৎ একবার সোজা হইয়া বসিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল, "মেজ কাকা, তুমি হ্যাংলা মেয়েদের ভালোবাস?"

বলিলাম, "হ্যাঁ, খুব।"

"ছেলেদের?"—ভ্রূ নামাইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া আছে।

ভাইপোর ওকালতি বুদ্ধিতে পেটে হাসি সুড়-সুড় করিয়া উঠিতেছে। গম্ভীরভাবে অল্প একটু মাথা নাড়িয়া বলিলাম, "হুঁ, বাসি। তবে বড় ছেলেদের নয়।"

মিটু আবার পরাভবের ভাবটা সোফায় মাখাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু বেশ বুঝিতেছি, আর পারিতেছে না বেচারা। নিষ্ঠুর খেলায় আমারও মনটা ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছে, ভাবিতেছি ডাকিয়া লইব, এমন সময় মিটু ডিগবাজি দেওয়ার জন্য মাথাটা গুঁজিয়া উল্টা চোখে আমার পানে চাহিয়া বলিল, "মেজকাকা, কানে কানে একটা কথা শুনবে?"

উল্টা দৃষ্টিতে লজ্জাটা বোধ হয় একটু আড়ালে পড়িয়া যাইতেছে।

মেজকাকা, কানে কানে একটা কথা শুনবে ?

বলিলাম, "শুনব, কথাটা কি ?"

"কাউকে বলবে না ?—কারুক্কে—কারুক্কে নয়—তুলতুলকেও না ?"

তুলতুল বিস্কুট চিবাইতেছিল, বোধ হয় শুনিবার অধিকার

সাব্যস্ত করিবার জন্য মুখটা ভার করিয়া বলিল, "আমি টো টোর মাটী ওই।"

"ইস্ মাসী!" বলিয়া মিটু সোজা হইয়া বসিল, তাহার পর আমার মতামতের অপেক্ষা না করিয়াই উঠিয়া আসিয়া আমার কানে মুখ দিয়া বলিল, "আমি তো কচি ছেলে মেজকাকা, বড় নয়তো।"

'হ্যাংলা' কথাটা উহ্য রাখিল। ঐ টুকু মেজকাকা কি বুঝিয়া লইতে পারিবে না? এতটা বড় হইয়াছে কি করিতে? অর্থাৎ, মিটু হার মানিতেছে, তবে যতটা সম্ভব মর্যাদা বজায় রাখিয়া।

[২]

দ্বিতীয় পর্যায়ে একটু গোল বাধিল।

মিটুকে একটা রেকাবিতে করিয়া খাবারগুলা সাজাইয়া ডাকিতেই তুলতুল হাত গুটাইয়া মুখটি তোলো-হাঁড়ি করিয়া বসিল।

একটু ব্যস্ত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, "কি হ'ল?—তোমার আবার কি হ'ল, তুলতুল?"

সামান্য একটু মাথা নাড়ার সঙ্গে উত্তর হইল—"আমি ঠাবুই না, ডেকোটো!"

ওর আবার 'দেখোতো' কথাটা প্রয়োজনের গুরুত্বে ব্যবহার করা অভ্যাস।

প্রশ্ন করিলাম, "কেন খাবে না? বেশ তো দুজনে হ'লে...."

আবদারের কণ্ঠে উত্তর হইল, "আমি টো মাটী ওই।"

বলিলাম "তা হও বই কি, তাই তো বলছি—দিব্যি মাসী-বোনপোতে...."

তুলতুল অভিমানের স্বরে গর-গর করিয়া খানিকটা কি বলিয়া গেল, একবর্ণও বুঝিতে পারিলাম না।

অনেক তপস্যায় পাওয়া খাবার, অনেক পিছাইয়াও আছে, আবার বিপদ ঘনাইয়া আসিতেও দেরি না হইতে পারে, মিটু খুব তাড়াতাড়ি হাতমুখ চালাইতে শুরু করিয়া দিয়াছিল, ঘুরিয়া একবার তুলতুলের পানে চাহিয়া নাক সিঁটকাইয়া বলিল, "ই—স্!" তাহার পর আমার প্লেটের রাজভোগ দুইটার পানে একবার চাহিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল, "দিদিমনি আবার আসবেন, মেজকাকা?"

ভবিষ্যতের দিকেও নজর আছে। বলিলাম, "না; তুলতুল কি বললে রে মিটু?"

মিটু দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, আমি কখনও মাসী বলব না; বলবই না।"

তুলতুল মুখটা আরও অন্ধকার করিয়া বলিল, "আমি ঠাবুই না, ড়েকোটো।"

মিটু ঠোঁটটা একটু উলটাইয়া বলিল, "বয়ে গেল।"

একবার তুলতুলের রেকাবির পানে চাহিয়া লইয়া বলিল, "আমি খাব'খন, এ্যাঁ মেজকাকা?"

বলিলাম, "তা খাস্, মা-মাসীর পাতের পেসাদ খেতে হয়।"

মিটু ভ্রূ দুইটা খুব চাপিয়া সন্দিগ্ধভাবে আমার মুখের পানে চাহিয়া লইল একটু, তাহার পরে নিঃশব্দে নিজের রেকাবিতে মনঃসংযোগ করিল। কথার মধ্যে কিছু মারপ্যাঁচের গন্ধ পাইলে ও এইরকম করে, পরে ঐ যে নিঃশব্দে আহার বা দোলা বা ডিগবাজি খাওয়া, ঐ সময়টা ভাবিয়া লয়, ও একটা কাটান্ ঠিক করিয়া ফেলে। একবার মুখ তুলিয়া বলিল, "মাসীরা তো কাপড় পরে মেজকাকা, তা জান না বুঝি?"

আবার ইংগিতে বোকা বানায়। বলিলাম, "এখন ছোট তাই ইজের আর পেনি প'রে আছে। বড় হলে পরবে কাপড়।"

আবার একটু নিঃশব্দে আহার; তাহার পর একটা কমলা লেবুর কোয়া চিবাইতে চিবাইতে বলিল, "বড় হ'লে বলব মাসী।"

রাগিয়া বলিলাম, "বড় বেয়াড়া তো তুই! আচ্ছা, ও মাসী না বলে আমি গিন্নী ব'লে ডাকব তোমায় তুলতুল, তুমি খাও।"

তুলতুল গলাটা দুলাইয়া বলিল, "আমি টো ডিন্নী নয়, আমি টো মাটী ওই।"

আচ্ছা এক ফ্যাসাদে পড়া গেল তো! এমনি তো দুটি প্রজাপতির মতো বেশ উড়িয়া ফিরিয়া সমস্ত বাড়িটা এক করিয়া বেড়াইতেছে দুজনে, একরত্তি আলাদা নয়। আমার এখানে আসিয়াই এ কি এক আদাড়ে জেদ ধরিয়া বসিল! বলিলাম, "মাটীরা ডিন্নীও হয়, সে বরং আরও ভালো, খুব আদর করব, ক-ত্তো জিনিস দোব।"

নড়চড় নাই, মানময়ী গৃহিণীর মতোই মুখ ভার করিয়া, অল্প একটু ঘুরাইয়া, বসিয়া আছে। বলিলাম, "শুনচ, তুলতুল? খাও। অনেক খাবার দোব, অনেক!"

আদায়ের সুরেই ঘাড় বাঁকাইয়া একটু আড়ে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "টাপোড়ডেবে?"

বুঝিতে না পারিয়া মিটুর পানে চাহিতে মিটু প্রশ্নটারই দ্বিরুক্তি করিল, "কাপড় দেবে?"

এতক্ষণ কোনরকমে চাপিয়া ছিলাম, একেবারে ডুকরাইয়া হাসিয়া উঠিলাম। এ আবার মিটুর চেয়েও সেয়ানা! এক সঙ্গেই গৃহিণীত্ব আর মাসীত্বের ব্যবস্থা করিয়া লইতে যায় যে! গৃহিণী-রূপে কাপড় আদায়, তাহার পর সেটা পরিয়া মাসী হইয়া বসা।

বলিলাম, "যা সম্বন্ধ দাঁড়ালো, কাপড় তো দেওয়ারই কথা তুলতুল। কিন্তু বাজারে তো পাওয়া যাবে না, আর একটু বড় হও। নাও, এবার খাও দিকিন।"

মুখটা শুধু আর একটু ঘুরিয়া গেল।

বোধ হয়, আমার হঠাৎ হাসিয়া ওঠাতেই মিটুর দিদিমা দুয়ারের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাগের ভান করিয়া বলিলেন, "ওমা, একি কাণ্ড! একটু সরেছি আর জুটোতে এসে ভাগ বসাতে আরম্ভ করেছে? একে কিচ্ছু পাওয়া যায় না!"

মিটু হাত গুটাইয়া লইল, হঠাৎ এরকম হাতে-নাতে ধরা পড়িয়া যাওয়ায় বুদ্ধি খুলিতেছে না। এদিকে একে অভিমান ছিলই, তাহার উপর এই গঞ্জনার সূচনা, তুলতুলের ঠোঁট দুইটি একটু কাঁপিয়া উঠিল। আমি হাসিয়া বলিলাম, "আপনাকে একটু সরে যেতে হবে, মা; যা সমস্যা নিয়ে পড়েছি তাতে যদি দুটো খাবারের ওপর দিয়েই রেহাই পাই তো বুঝব...."

আগাইয়া আসিলেন, একটু হাসিয়াই বলিলেন, "ব্যাপারখানা কি? পাত থেকে খাবার তুলে দিতে হবে, আবার সমস্যাও? এসে জুটল কোন্ দি[illegible] দিয়ে? নাও, খেয়ে নাও, দখল যখন করেই বসেছ...."

বলিলাম, "ওকে মিটু মাসী না বললে খাবে না!"

"সেই মাসী-বোনপোর ব্যাপার? ও সমস্যা আজ পর্যন্ত কেউ মেটাতে পারলে না তো তুমি একদিনের জন্যে এসে কোথা থেকে পারবে, বাপু? কম সয়তান তোমাদের ঐ বাঁটকুলটি? এতটুকু দেখতে হ'লে কি হয়? কাপড় না পরলে কোনমতে মাসী বলবে না; সমস্ত বাড়ি এক দিকে, ও এক দিকে। এখন, অতটুকু মেয়ের কাপড় কোথায় পায় বল দিকিন লোকে?"

মিটুর পানে চাহিয়া বলিলেন, "বল্ না মাসী একবারটি নাহয় ; মেজকাকা বলছেন। না বলে, তুমি ওকে নিয়ে যেয়ো না, এইখানে ফেলে রেখে যেয়ো, জব্দ হবে।"

বলিলাম, "হ্যাঁ, তাই যাব, ওর বদলে বরং তুলতুলকে নিয়ে যাব। তুমি খাও তুলতুল, লক্ষ্মীটি! সেখানে মাসী বলবার কত লোক আছে—গোপাল, মণ্টু, ছবি, গৌরী, মৈয়া, কোঁদন—আরও কত্তো সব—তুমি উত্তর দিয়ে উঠতেই পারবে না! নাও খেয়ে নাও, থাকবে মিটে এখানে একলা পড়ে।"

রসগোল্লাটি তুলিয়া মুখের কাছে ধরিলাম। তুলতুল মুখটা ঘুরাইয়া বিড় বিড় করিয়া কি একটু বলিল। মিটুর দিদিমা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "শোন!—শুনলে তো?"

বলিলাম, "ধরতে পারলাম না তো।"

"বলছে মিটুও সেখানে যাবে, মাসী বলবে। ওকে যদি একপোটা ছেলেমেয়ে চারদিক থেকে মাসী বলে ডাকতে থাকে, তবু মিটু না ডাকলে সে সব কিছু নয় ওর কাছে। কাকে রেখে কাকে তুষবে বল? ও-ও কি কম দজ্জাল মেয়ে? মিটুকে ঘাড় ধরে মাসী বলাবে তবে ওর সোয়াস্তি!"

আর একটু চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হইল; কন্যার আজই যাত্রার দিন, তাঁহার দম লইবার অবসর নাই। আমার এমন কিছু তাড়া নাই, ওদের সমস্যা লইয়াই আরও কাটাইলাম খানিকটা ; এবং অবশেষে আধাআধি একটা সমাধানও হইল; বলিলাম, "বেশ, আজ বাজার থেকে তোমায় কাপড় এনে দোব তুলতুল, তুমি খাও। আজই এনে দোব কেমন ঝক্‌মকে শাড়ি। এইবার বল্ মাসী, মিটু।"

মিটু সন্দেশে একটা কামড় দিয়া একটু গলা দোলাইয়া ওর বুড়ুটে ভাষায় বলিল, "কাপড় পরুক না, তাড়াতাড়ি কিসের?"

আধাআধি সমাধান এইজন্য বলিতেছি যে তুলতুল শেষ পর্যন্ত খাবারগুলি খাইল। অবশ্য, শুধু ঝকমকে শাড়ির লোভ দেখাইয়া ফল হইল না, তাহার সঙ্গে একটু ঝাল-মসলা মিশাইতে হইল; মিটু ভয়ঙ্কর বদমাইস—মিটুকে সেখানে লইয়া গিয়া বেত মারিয়া মাসী বলাইতে হইবে—সেখানে তো দাদুও নাই, দিদিমাও নাই যে বাঁচাইবে—মিটু সবটা খাইয়া ফেলিল, তুলতুল তাড়াতাড়ি না খাইয়া ফেলিলে ওর ভাগটাও কাড়িয়া খাইবে—এখানে কিছু বলা যাইবে না কিনা, দাদু-দিদিমা দুজনেই রহিয়াছেন যে—

[৩]

আমাদের প্রতিদিনের জীবনে একটি অতি সূক্ষ্ম প্রবঞ্চনা থাকে শিশুদের লইয়া জীবনের যে অংশটি তাহাতে। এত সূক্ষ্ম যে আমরা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনি না, ওদের ভুলাইয়া-ভালাইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া, ভাঙিয়া, আমাদের যাত্রার পথ মসৃণ করিয়া লই। বোধ হয় ভাবি, এত ছোট সমাচারগুলো ভগবানের কাছে পৌঁছায় না। পৌঁছায়ই, কেননা এক-এক সময় এক-একটি এমন ধাক্কা আসিয়া বুকে লাগে যে সে আর ভোলা যায় না।

শিশু যে ভগবানের একেবারে বুকের কাছটিতে থাকে, এ কথা আমরা ভুলিয়া বসিয়া থাকি।

তুলতুলের শাড়ির কথা এমন কিছু বড় কথা নয় যে মনে করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। আহার শেষ করিয়া দুটিতে মাসী-বোনপোর

আড়াআড়ি ভুলিয়া, নাচিয়া-কুঁদিয়া আবার সমস্ত বাড়িটা পূর্ণ করিয়া তুলিল—কোথাও ভাঙা, কোথাও গড়া—ওদের নিজ প্রথায়—কোথাও বকুনি, কোথাও আদর ; যদি একটু নীরবতা তো কণ্ঠকাকলি পরমুহূর্তে দ্বিগুণ উচ্ছ্বাসে বিরাট দেউড়ির দেয়ালে দেয়ালে আঘাত হানিয়া ওঠে।

আমি একটু ঘোরাঘুরি করিলাম, খানিকটা গল্পে মাতিলাম, দরকারী আলোচনাও ছিল—আজই বৈকালে যাইতে হইবে, এতগুলি লোককে লইয়া গাড়িতে যাওয়া, যা অবস্থা আজকাল !

ওরই মধ্যে তুলতুল আসিয়া একবার হাঁটুটা জড়াইয়া গলা তুলিয়া আবদারের স্বরে বলিল, "আমাট্টাপোর আনটে অবে, আমি মাটী অবো।"

বলিলাম, "নিশ্চয়, আনব বইকি।"

আবার ঠোঁট কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "আমি ডিন্নী ওই।"

আমাদের নূতন-পাতা সম্বন্ধটা লইয়া বোধ হয় বাড়িতে একটা আলোচনা হইয়াছে, মিটুর মারফত খবরটা প্রচারিত হইয়াছে ; তুলতুল টের পাইয়াছে গিন্নীর দর অনেক—শাড়ী পায়, গয়না পায়, আরও কত কি পায় ; মনে করাইয়া দিল।

ঠিক করিয়াছিলাম বাজারে গিয়া গজ দুয়েক রঙিন রেশম বা মলমল-জাতীয় কাপড় কিনিয়া জরির পাড় বসাইয়া শাড়ি সমস্যা মিটাইব। উঠিতেও যাইতেছিলাম—বলিয়াছি ছেলেমানুষকে—ওটুকু সারিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়া বসি। গল্পটা একটু দিক-পরিবর্তন করিয়া নূতনভাবে জমিয়া উঠিল। গল্পের মজলিসে লোক বাড়িল, শাখা-প্রশাখায় গল্প নূতন নূতন পথে ছুটিল, একটি মেয়ের শিশুসুলভ আবদার দুইটি চঞ্চল ঠোঁটের স্মৃতি মাঝে মাঝে জাগাইতে জাগাইতে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হইয়া কখন মিলাইয়া গেল।

মনে পড়িল যখন মধ্যাহ্ন-আহারের ডাক পড়িল। অবশ্য, বড়

আমাট্টাপোর আনটে অবে, আমি মাটী অবে।

প্রয়োজনের কাছে ও সামান্য কথাটা আমলই পাইল না ; আগে এটা

তো সারিয়া লই, তাহার পর না হয় বাজারে চাকর-বাকর কাহাকেও পাঠাইয়া আনাইয়া লওয়া যাইবে।

ভাত খাওয়ার সময়ে কাছে আসিয়া দাঁড়ানোটা হ্যাংলামির পর্যায়ে পড়ে না ; তুলতুল বেশ সপ্রতিভ এবং খোলাখুলি ভাবেই সামনে আসিয়া দাঁড়াইল আমি একটু পুরাতনও তো হইয়াছি ; হ্যাংলামির ধার মরিয়া যায় ওতে। একবার মিটুও আসিল ; খানিকক্ষণ থাকিয়া কি যেন একটা খুব জরুরী কাজে বন্ করিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। টকার-ডকারের বাঁধ খুলিয়া দিয়া অনর্গল গল্প করিয়া চলিয়াছে তুলতুল ; মাঝে মাঝে শুনিতেছি, আবার মাঝে মাঝে নিজেদের গল্পে ডুবিয়া যাইতেছি। মিটুর দিদিমা রহিয়াছেন, দাতুরা আহার করিতেছেন। শেষ পাতে দই মিষ্টির সময় তুলতুলকে পাশে আসিয়া বসিতে বলিলাম। তুলতুল একবার জেঠাইমার পানে চাহিল ; তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, 'বোস, ঐ উদ্দেশ্যেই তো এসে দাঁড়ানো গুটি-গুটি ক'রে।'

তুলতুল তুই পা অগ্রসর হইয়া বসিতে গিয়া আবার দাঁড়াইয়া পড়িল, তাহার পর ঘুরিয়া উপরের সিঁড়ির দিকে ছুটিল। প্রশ্ন করিলাম, "কি হ'ল তুলতুল ?"

সকলেই তাহার এই হঠাৎ ভাবপরিবর্তনে একটু বিস্মিত হইয়া চাহিয়া আছেন। তুলতুল ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া একটু গিন্নীপনার ভাবে তর্কের সুরে বলিল, "ডাঁড়াও, মিটু ঠাবে না ? ডেকোটো !"

তাহার বলিবার ধরনে সকলকেই একটু হাসিয়া উঠিতে হইল ; মিটুর দিদিমা কতকটা তাহারই ভঙ্গী নকল করিয়া বলিলেন, "ডেকোটো ! বোনপো শুকোচ্ছে, আমার মুখে কখনও অন্ন জল উঠতে পারে ? কিরকম বেয়াক্কেলে কথা আবার !"

মিটু আসিয়া অবশ্য 'মাসী' বলিল না, তবে এবার আর উল্লেখযোগ্য

কোন হাঙ্গাম হইল না। মিটুর দাদু একবার প্রশ্ন করিলেন, "মিটু তাহলে বলছ মাসী?"

মিটু উত্তর করিল, "কাপড় পরুক না, তাড়াতাড়ি কিসের?"

তুলতুল বলিল—"টাপোপ্পোব্বো; ডেকোটো।"

এইতেই আপাতত কাজ চলিয়া গেল।

সমস্ত রাত গাড়ীতে অকথ্য কষ্ট গিয়াছে, তাহার উপর মিটু তুলতুল সত্ত্বেও কুটুমবাড়িরই আহার। একটু শয্যা আশ্রয় করিতে হইল; ওরা দুজন সঙ্গে রহিল। বলিলাম, "একটু গড়িয়ে নিই, মিটু; তারপর আমি উপরে গিয়ে বাক্স খুলে পয়সা দিচ্ছি, তুই পঞ্চুকে ডেকে দিবি, তুলতুলের কাপড় এনে দেবে।"

তুলতুল মুখটা ভার করিয়া গড় গড় করিয়া কি খানিকটা বলিয়া গেল; দু'চারটা কথা ধরিতে পারিতেছি, অতগুলা আয়ত্ত হয় না। মিটু বলিল, "বলছে, পঞ্চু আনলে আঁমি পরব না, পঞ্চু কালো, বিচ্ছিরি।"

হাসিয়া তুলতুলকে বলিলাম, "তা বেশ, আমি হাতে করে আনলেই যদি তোমার কাপড় রাঙা টুকটুকে থাকে, আমিই যাবো। সে তো ভাগ্যির কথা। একটু গড়িয়ে নিই, কি বল?"

কাপড়ের আলোচনা চলিল: রাঙা টুকটুকে শাড়ি আসবে তুলতুলের —ফিনফিনে জমি, মাঝে মাঝে চুমকি বসান, এতখানি চওড়া জরির পাড়, এই আঁচলা—এইরকম ক'রে প'রে, পিঠে এইরকম করে আঁচলা দুলিয়ে যেই দাঁড়াবে তুলতুল অমনি মিটু এসে বলবে, "ও তুলতুল মাসী! ও তুলতুল মাসী! ও তুলতুল মাসী!"

আনন্দে একবার ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিয়াই তুলতুল সঙ্গে সঙ্গে মুখটা ভার করিয়া কি বলিল। মিটু বুঝাইয়া দিল, "বলছে, শুধু মাসী বলব।"

মর্যাদাজ্ঞান দেখিয়া একটু বিস্মিতই হইতে হইল ; অর্থাৎ সঙ্গে নাম জুড়িয়া দিলে তো ওরই মধ্যে একটু ছোট করা হইল ; তুলতুল ও-খাদটুকু চায় না। বলিলাম, "হ্যাঁ, নাম ধরে আবার নাকি মাসী বলে ? মিটুর যেমন কাণ্ড ? তাহলে তো নাম ধরে দাতু বলবে, নাম ধরে দিদিমা বলবে, আমারও নাম ধরে মেজকাকা বলবে।—মিটু ছুটে, এসে বলবে ঃ ও মাসী ! ও মাসী ! তুমি যে কাপড় পরেছ গো ! ও মাসী ! ও মাসী ! ও মাসী !"

কী সাধ লইয়া যে ওরা জন্মায় কে জানে, কথাগুলা তুলতুলকে যেন সুড়সুড়ি দিয়া উঠিল। হঠাৎ আমার দক্ষিণ হস্তটা টানিয়া লইয়া নিজের বুকে চাপিয়া ধরিল এবং চোখমুখ কুঞ্চিত করিয়া একেবারে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। আমি থামিলে বলিল, "আবাল বল না, আবাল বল ! টি বোব্বে মিটু ?"

[৪]

শাড়ি আনা হয় নাই। খুবই ক্লান্ত ছিলাম, কখন গল্পের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছি টের পাই নাই। উঠিলাম একেবারে যাওয়ার আয়োজনের ব্যস্ততার মধ্যে। পাশে তুলতুল শুইয়া আছে একটি পুষ্পস্তবকের মতো। ওর মুখের উপর যখন নজর পড়িল, ঠোঁটের এক কোণে একটি হাসি ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতেছে ; বোধ হয় রঙিন শাড়ি আর "মাসী" ডাকের স্বপ্ন দেখিতেছিল।

মিটুর দাতু বলিলেন, "আমিই তোমাকে উঠোতে বারণ করে দিয়েছিলাম, কাল ঐ অবস্থা গেছে, আজ রাত্তিরেও ঘুম হবে না। নাও,

মুখ হাত ধুয়ে একটু চা টা খেয়ে নাও, স্টীমারের আর মোটে আধ-ঘণ্টাটাক আছে।”

নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইবার মিনিট দশেক যা সময় পাওয়া গেল তাহাতে ডাইনে-বাঁয়ে চাহিবার ফুরসত পাওয়া গেল না, শিশু-ভোলানো হালকা আলাপের মধ্যে একটি রাঙা শাড়িরও প্রলোভন ছিল, এ কথা আর কি করিয়া মনে থাকিবে? ক্ষতিই বা কি যদি না রহিল মনে? বড় বাড়িতে কন্যাবিদায়ের ব্যাপার—ওদিকেও বেশ একটা তাড়াহুড়া পড়িয়া গেছে, কে কাহার খোঁজ রাখে? উপর থেকে নামিয়া আসিয়া যখন বিদায় লওয়ার পালা, ছোটদের স্তরে নামিতে তুলতুলের কথা মনে পড়িল। তুলতুল ছিল না।

কেহ সন্ধান দিতে পারিল না। মনে ধক্ করিয়া একটা বড় আঘাত লাগিল; কিন্তু সে ক্ষণিক; তখনই অদূরে স্টীমার-ঘাটে স্টীমারের ভোঁ বাজিয়া উঠিল, ওপার হইতে উপস্থিতির সূচনা। যাত্রার তাড়ায় মোটরে গিয়া উঠিতে হইল।

গেটের দিকে মুখ করিয়া মোটর দাঁড়াইয়া আছে। হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও বিদায়ের শেষ লগ্নটুকু মেয়েরা একটু লয়ই টানিয়া বাড়া[illegible]; মিটুর মায়ের ওঠা তখনও হয় নাই। হঠাৎ আমার দৃষ্টি সা[illegible] এক জায়গায় নিবদ্ধ হইয়া গেল।

সুমুখে[illegible]য দোতলার ঘরটি, তাহার সামনে রেলিংঘেরা ছোট্ট একটি বারান্দা বা ব্যাল্‌কনিতে দাঁড়াইয়া একা তুলতুল। একটি বোধ হয় বারো হাতের শাড়ির বেষ্টনীতে ক্ষুদ্র শরীরটির বুক পর্যন্ত একেবারে অবলুপ্ত, তাহারই আঁচলের একটা কোণ মাথার উপর তোলা। ছোট্ট বুকের যত আশা, যত উৎকণ্ঠা তুলতুলের সেই স্বপ্নময় চোখ দুইটিকে যেন অস্বাভাবিক রকম তীক্ষ্ণ করিয়া তুলিয়াছে। মিটু আমার পাশে বসিয়া